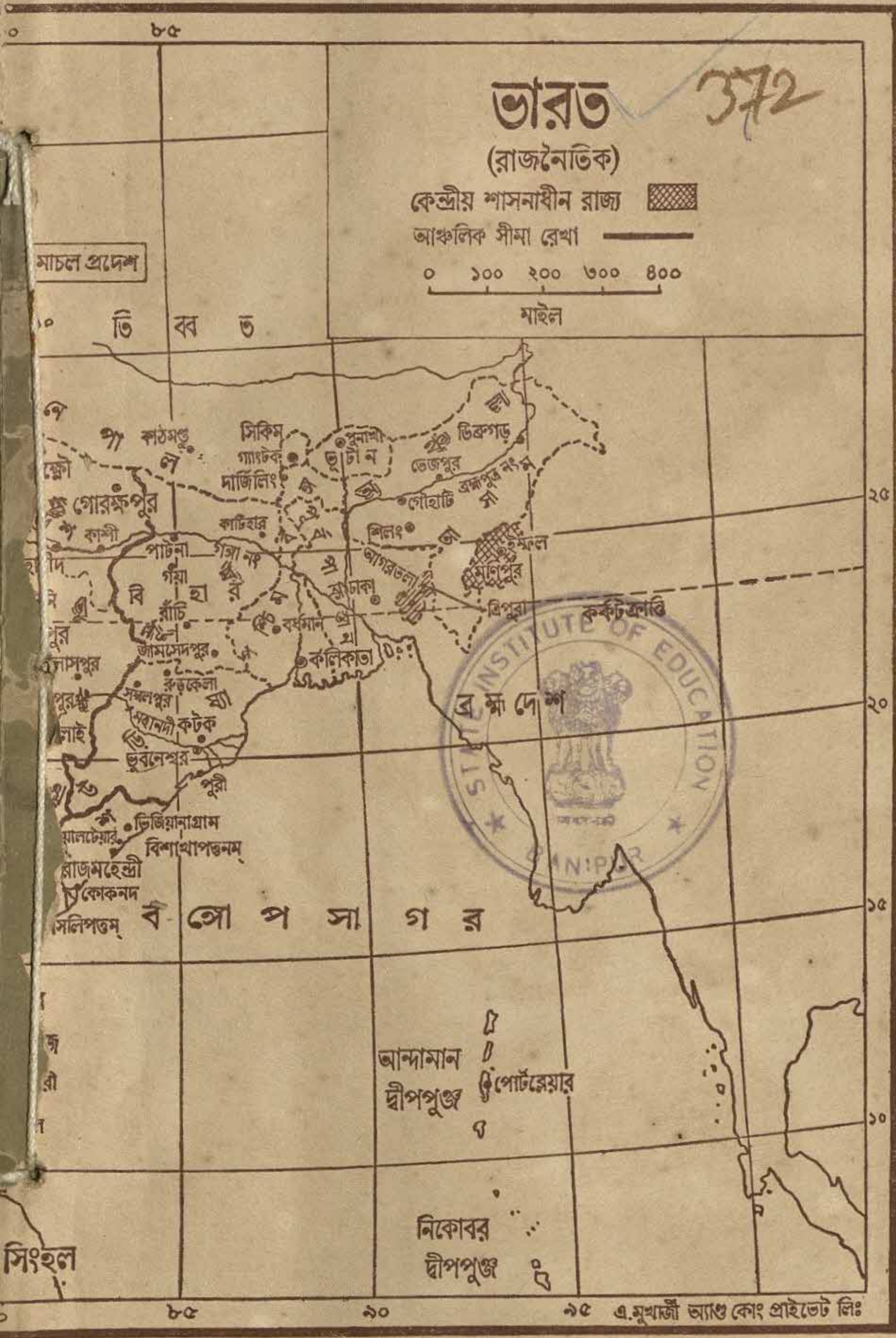

ভারত
(রাজনৈতিক)
কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্য
আঞ্চলিক সীমা রেখা
০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০
মাইল
মাচল প্রদেশ
তি ব্ব ত
কাঠমণ্ডু
সিকিম
গ্যাংটক
পুনাখা
ভূটান
ডিব্রুগড়
তেজপুর
দার্জিলিং
গোরক্ষপুর
কাশী
গৌহাটি
ব্রহ্মপুত্র নং
কাটিহার
শিলং
ইম্ফল
পাটনা
গয়া
আগরতলা
মণিপুর
ঢাকা
রাঁচি
বর্ধমান
ত্রিপুরা
কর্কটক্রান্তি
জামসেদপুর
কলিকাতা
রুড়কেলা
সম্বলপুর
ব্রহ্মদেশ
মহানদী
কটক
ভুবনেশ্বর
পুরী
ভিজিয়ানাগ্রাম
বিশাখাপত্তনম্
রাজমহেন্দ্রী
কোকনদ
সলিপত্তম্
বঙ্গোপসাগর
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
পোর্টব্লেয়ার
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
সিংহল
৮৫
৯০
৯৫
২৫
২০
১৫
১০
এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal, (vide Board's Notification No. 41/56, Dated 6. 12. 56. & later Notifications & Circulars up to date) as a text book on Geography for the School Final Examinations, 1959-62.

মধ্যশিক্ষা ভূগোল

• সংশোধিত সংস্করণ •

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতের নূতন পাঠ্য তালিকা অনুসারে
স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থীদের জন্য লিখিত

•

শ্রীপ্রমথনাথ হোড়, এম্. এস্-সি. (স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত)
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক
ও
কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং চন্দননগর
ডুপ্লে কলেজের ভূগোলের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, প্রাইভেট লিমিটেড,
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, প্রাইভেট লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

সংশোধিত সংস্করণ, পৌষ, ১৩৬৩

মূল্য : টা. ৩·৪৩ (তিন টাকা তেতাল্লিশ ন.প.) মাত্র (১৮.২.৬০)

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু. প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা—৬

ভূমিকা

বিগত অর্ধ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশে ভূ-বিজ্ঞানের (Geography) প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশেও ভূ-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও গবেষণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মত ভূ-বিজ্ঞানের জ্ঞানও আমরা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে লাভ করিতেছি। আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে বাংলা ভাষায় লিখিত ভূগোল বইয়ের সংখ্যা খুবই কম।

মাতৃভাষায় ভূ-বিজ্ঞানের পুস্তক লেখার কতকগুলি অসুবিধা আছে। পরিভাষার অভাবই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। বহু ভৌগোলিক শব্দ (term) আছে যাহার কোন বাংলা প্রতিশব্দ নাই। একই ভৌগোলিক শব্দের জন্য বাংলা ভাষায় লিখিত বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষার্থীদের যে অনেক অসুবিধা হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। আবার অনেক সময়ে একই প্রতিশব্দ দ্বারা বিভিন্ন ভৌগোলিক শব্দ বুঝান হইয়াছে। অধিকাংশ বাংলা পুস্তকে Weathering ও Erosion এই দুই বিষয়ের জন্যই 'ক্ষয়' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে Weathering ও Erosionএর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তাই এই দুই জিনিসই 'ক্ষয়' শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিলে শিক্ষার্থীরা কখনই ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারিবে না এবং একবার কোন ভ্রান্ত ধারণা তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেলে তাহা দূর করিতেও বহু সময় লাগিয়া যায়। এই ধরণের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই পুস্তকে এই সকল ত্রুটি দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

এই পুস্তক লিখিতে বসিয়া পরিভাষার অভাব আমি খুবই অনুভব করিয়াছি। এই অসুবিধা দূর করিবার এবং ছাত্রদের মনে বিভিন্ন ভৌগোলিক শব্দ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা জন্মাইবার জন্য আমাকে অনেক ক্ষেত্রে নূতন শব্দ গঠন করিয়া ব্যবহার করিতে হইয়াছে, আবার কোন কোন স্থলে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতেও বাধ্য হইয়াছি। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের আয়তন, লোকসংখ্যা, নদীর দৈর্ঘ্য, পর্বতের

বিস্তার প্রভৃতি ভৌগোলিক তথ্যের জন্যও অনেক অসুবিধা ভোগ করি... হইয়াছে। প্রামাণিক গ্রন্থগুলির মধ্যেও এসব বিষয়ে অনেক পার্থক্য আ... 'Webster's Geographical Dictionary' এবং 'Oxford Encyclopæ... প্রভৃতি যে প্রামাণ্য পুস্তক সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু উপরো... সম্বন্ধে এই দুই পুস্তকেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এই পুস্তকে ২১শে জু... ২১শে ডিসেম্বরকে অয়নান্ত দিবস এবং ২২শে মার্চ ও ২২শে সে...রকে বি... দিবস হিসাবে ধরিয়াছি। এই বিষয়ে Oxford Encyclopædia, Vol. III, The Universe (1949 Edition) পুস্তককে প্রামাণ্য (১৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) হিসাবে ধরা হইয়াছে। ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অঞ্চলের আয়তন, লোকসংখ্যা প্রভৃতির জন্য Statesman's Year Book—1955 বইখানিকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি।

ভারতের রাজ্য পুনর্গঠনের বিবরণ এই সংস্করণে দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে বিভিন্ন ভৌগোলিক বিবরণ ও রাজ্যগুলির সীমানার যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাও সংশোধন করা হইয়াছে। এছাড়া শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য নবগঠিত রাজ্যগুলির মানচিত্রও দেওয়া হইয়াছে।

এই পুস্তকখানি আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখার চেষ্টা করিয়াছি বটে, তবে কতখানি সফল হইয়াছি তাহা সহৃদয় শিক্ষকগণই বিচার করিবেন।

জিওলজিক্যাল সায়েন্স বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
পৌষ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

শ্রীপ্রমথনাথ হোড়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

(প্রথম ভাগ)

(দ্বিতীয় ভাগ)

চতুর্থ খণ্ড

সূচনা

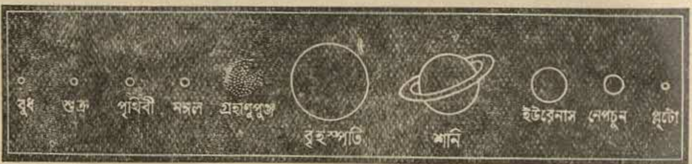
সৌরজগৎ ও পৃথিবী

ধরিত্রীমাতার ক্রোড়ে প্রথম যেদিন মানুষ জন্মগ্রহণ করিল, মনে হয় সেইদিন হইতেই সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে যে আকাশ-বক্ষের ঐ যে জ্যোতির্ময় গোলক, যাহার আমরা নাম দিয়াছি সূর্য, ঐ গোলকটি যেন প্রতিদিনই প্রভাতে পূর্বদিকে উদিত হইয়া সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতেছে। প্রতিদিন এই একইরূপ ঘটনা দেখিতে দেখিতে অতি প্রাচীন যুগের লোকদের মনে ক্রমে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে আমাদের এই পৃথিবী বুঝি আকাশরূপ মহাশূন্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, আর সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রগুলি যেন মহাশূন্যের বুকে পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া অবিরত ঘুরিতেছে। পরে, মানুষ সভ্যতার পথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল এবং অন্যান্য বিষয়ের সহিত জ্যোতির্বিজ্ঞানেরও সমধিক উন্নতি হইতে লাগিল, ততই মানুষের মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইতে থাকিল।

অবশেষে মানুষ এখন সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষিত সত্য ও তথ্য জানিতে পারিয়াছে। মানুষ এখন জানিয়াছে যে, সূর্য অতি উষ্ণ একটি বিশাল বাষ্পপিণ্ড মাত্র। উহা আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় তের লক্ষ গুণ বড়। আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষপথে থাকিয়া এই সূর্যকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রথমে বুধ (Mercury), এবং তাহার পর শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Uranus), নেপচুন (Neptune) এবং প্লুটো (Pluto)—এই নয়টি গ্রহ যথাক্রমে আপন আপন পথ ধরিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

কোন কোন গ্রহের আবার উপগ্রহও আছে। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। উপগ্রহগুলি আবার তাহাদের অধিপতি গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এই সূর্য ও উহার চারিদিকের নয়টি গ্রহ এবং অনেকগুলি উপগ্রহ লইয়া আমাদের সৌরজগৎ গঠিত। আমাদের এই পৃথিবীবক্ষ হইতে উপরের দিকে তাকাইয়া যখন আমরা সূর্যকে দেখি তখন কি কল্পনাও করিতে পারি—কি বিশাল আকার ঐ

অগ্নিগোলকটির ? বড় জোর,—অতি প্রকাণ্ড একটি থালার মত—ইহাই সাধারণ মানুষের মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ, উহা আমাদের এই পৃথিবী অপেক্ষা আকারে বহু লক্ষ গুণ বড়। তবে, পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া উহাকে এত ছোট দেখায়। সূর্য আমাদের এই পৃথিবী হইতে কত দূরে জান ? একশত, দুইশত কি এক হাজার, দুই হাজার মাইল নয়, সূর্য হইতে পৃথিবীর গড় দূরত্ব প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। সূর্যের অন্যতম গ্রহ প্লুটো আবার ইহার তুলনায় সূর্য হইতে আরও অনেক অনেক বেশী দূরে। প্লুটোর দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা



সৌরজগৎ

করাও কঠিন। সূর্য হইতে বাহির হইয়া একটি অতি দ্রুতগামী বিমান যদি সমান বেগে পৃথিবীর দিকে অবিরাম চলিতে থাকে তবে পৃথিবীতে পৌছিতে উহার ৫৬ বৎসর সময় লাগিবে। আর প্লুটোতে পৌছিতে কত সময় লাগিবে জান ?—প্রায় ৫ হাজার বৎসর।

পৃথিবী হইতে সূর্যকে কেন এত ছোট দেখায় তাহা তোমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ। সন্ধ্যাকালে আকাশের বুকে যে বিন্দু বিন্দু অসংখ্য নক্ষত্র দেখা যায়, ঐ একই কারণে উহাদিগকেও এত ক্ষুদ্র দেখায়। আসলে কিন্তু উহাদের অধিকাংশেরই আকার সূর্যের মতোই বিশাল; কোন কোনটি আবার সূর্যের চেয়েও বহুগুণ বড়। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ স্যার আর্থার এডিংটনের মতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে প্রায় ১১ কোটি কোটি কোটি নক্ষত্র আছে। এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ এই সৌরজগৎ; আর সেই সৌরজগতের এক অতি সামান্য অংশ আমাদের এই পৃথিবী—যাহার উপর আমরা বাস করি।

মধ্যশিক্ষা ভূগোল

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবীর আকার ও আয়তন

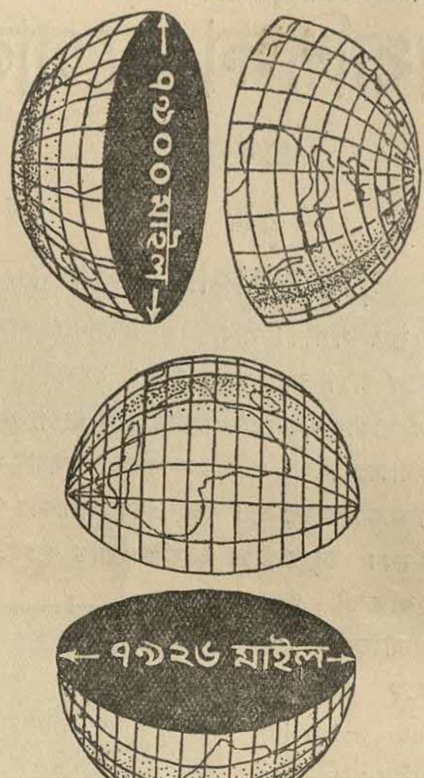
কোন একটি বৃহৎ পদার্থের সামান্য অংশ দেখিয়া আমাদের পক্ষে উহার আকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা খুবই কঠিন। তেমনি পৃথিবীর সামান্য একটু অংশ দেখিয়া উহার আকার বা আয়তন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করাও খুবই কঠিন। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের নিকট পৃথিবীকে সমতল বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী আদৌ সমতল নয়। উহা প্রায় গোলাকার (Spherical), তবে সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কতকটা চাপা। পার্শ্বের চিত্রটি লক্ষ্য করিলেই উহা বুঝিতে পারা যাইবে। এই ধরণের গোলককে **অভিগত গোলক** (Oblate Spheroid) বলা হয়। পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ বা মেরু-ব্যাস ৭,৮৯৯ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিম বা বিষুব-ব্যাস ৭,৯২৬ মাইল দীর্ঘ। মেরু-ব্যাসের দৈর্ঘ্য বিষুব-ব্যাস অপেক্ষা ২৭ মাইল কম।



১নং চিত্র

পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ পরিধি প্রায় ২৪,৮৬০ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিম পরিধি প্রায় ২৪,৯০২ মাইল। অর্থাৎ মোটামুটি হিসাবে বলা যাইতে পারে পৃথিবীর

পরিধি প্রায় ২৫,০০০ মাইল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীপৃষ্ঠের মোট আয়তন প্রায় ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গ মাইল। ইহার প্রায় শতকরা



২নং চিত্র

২৯.২ ভাগ স্থল এবং অবশিষ্ট ৭০.৮ ভাগ জল। তাই স্থলভাগের পরিমাণ পৃথিবীপৃষ্ঠের মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও কম।

পৃথিবী যে গোল তাহার কয়েকটি প্রমাণ

পূর্বেই বলিয়াছি পৃথিবীর আকার প্রায় গোলাকার, সমতল নহে। পৃথিবী যে গোলাকার আমরা তাহার কতকগুলি প্রমাণ পাই।

(১) সমুদ্র উপকূলের দিকে কোন জাহাজ ক্রমশঃ আসিতে থাকিলে সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া আমরা সর্বপ্রথমে জাহাজের ধোঁয়া, তারপর মাস্তুলের অগ্রভাগ, তারপর

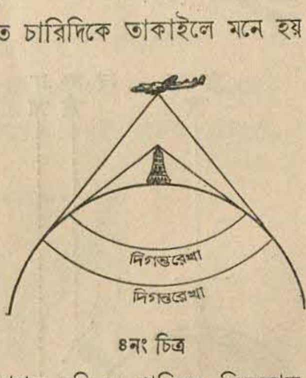


৩নং চিত্র

তাহার নীচের অংশ এবং সর্বশেষে সম্পূর্ণ জাহাজটি দেখিতে পাইব। পৃথিবীপৃষ্ঠ বক্র বলিয়াই এরূপ হওয়া সম্ভব। সমতল হইলে, যত দূরেই থাকুক না কেন, সমগ্র জাহাজটিই আমরা এক সঙ্গে দেখিতে পাইতাম।

(২) চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে। সেই ছায়া সকল অবস্থাতেই বৃত্তাকার দেখায়। কোন গোল জিনিসের ছায়াই সর্বপ্রকার অবস্থায় গোল দেখায়; কাজেই পৃথিবী যে গোলাকার একথা সহজেই চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া দেখিয়া বুঝা যাইতে পারে।

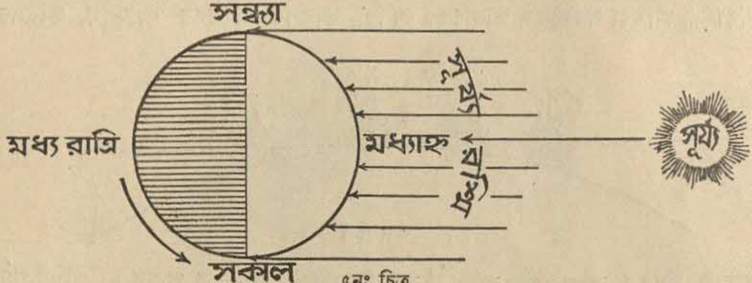
(৩) কোন উচ্চ স্থান, গম্বুজ বা পাহাড় হইতে চারিদিকে তাকাইলে মনে হয় আকাশ যেন বহুদূরে বৃত্তাকারে পৃথিবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই বৃত্তকে **দিক্‌চক্ররেখা** বা **দিগন্তরেখা** (Horizon) বলে। যতই উচ্চে উঠা যায় ঐ বৃত্তের পরিধিও তত বাড়িয়া যায়। পৃথিবী গোল বলিয়াই দিক্‌চক্ররেখা এরূপ বৃত্তাকার ধারণ করে।



৪নং চিত্র

(৪) জাহাজে বা বিমানে চড়িয়া পৃথিবীর কোন স্থান হইতে বরাবর ঠিক একই দিকে ক্রমাগত চলিতে থাকিলে কিছুকাল পরে পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আসিতে হয়। ড্রেক, কুক, ম্যাজিলান প্রভৃতি বিখ্যাত নাবিকগণ বিশেষ দিক্‌ পরিবর্তন না করিয়া একই দিকে জাহাজ চালাইতে চালাইতে ভূ-প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। পৃথিবী সমতল হইলে এরূপে ভূ-প্রদক্ষিণ করা সম্ভব হইত না।

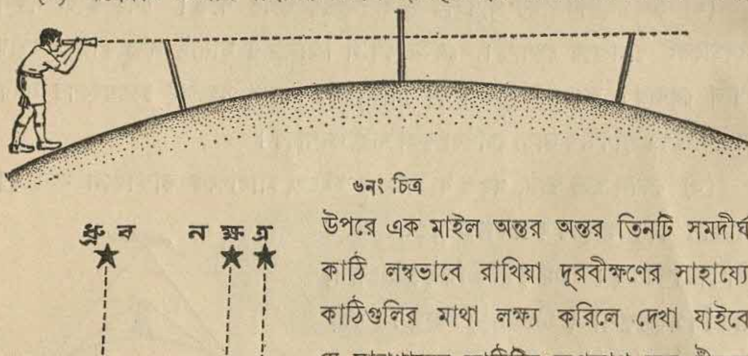
(৫) পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে সূর্যোদয় হয়। পৃথিবী গোল



৫নং চিত্র

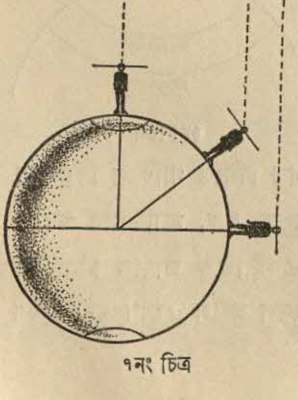
বলিয়াই এরূপ হয়। পৃথিবী সমতল ক্ষেত্র হইলে সর্বত্র একই সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যাইত।

(৬) কয়েকটি ভেলার সাহায্যে কোন সুবিস্তৃত হ্রদ বা বিলের নিশ্চল জলের



৬নং চিত্র

উপরে এক মাইল অন্তর অন্তর তিনটি সমদীর্ঘ কাঠি লম্বভাবে রাখিয়া দূরবীক্ষণের সাহায্যে কাঠিগুলির মাথা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে মাঝখানের কাঠিটির অগ্রভাগ অল্প উঁচুতে আছে। পৃথিবী সমতল হইলে কাঠি তিনটির অগ্রভাগ একই রেখায় থাকিত।



৭নং চিত্র

(৭) ধ্রুবতারা একটি স্থির নক্ষত্র। নিরক্ষবৃত্ত হইতে ঐ নক্ষত্রটিকে দিগন্তরেখায় দেখা যায়। যতই উত্তরে যাওয়া যায় ধ্রুব নক্ষত্রকে ততই বেশী উঁচুতে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর মেরুতে উহাকে একেবারে মাথার উপরে দেখা যায়। আবার নিরক্ষরেখার দক্ষিণ হইতে

ধ্রুব নক্ষত্রকে একেবারেই দেখা যায় না। পৃথিবী গোল না হইয়া সমতল হইলে পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই ধ্রুব নক্ষত্রকে দেখা যাইত এবং সকল স্থানেই ধ্রুব নক্ষত্রের উন্নতি সমান থাকিত।

(৮) দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, সূর্যের অন্যান্য গ্রহগুলি সকলই গোলাকার। পৃথিবীও সূর্যের একটি গ্রহ; অতএব ইহাও গোলাকার হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর গতি

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় যে পৃথিবী স্থির, সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র-সকল যেন উহাকে পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কোন দ্রুতগামী রেলগাড়ীতে চলার সময় আমাদের যেমন মনে হয় রেলগাড়ী স্থির এবং দুই পার্শ্বের গাছপালা, ঘরবাড়ী সব যেন দ্রুত পিছন দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে তেমনিভাবে পৃথিবীকেও আমাদের স্থির মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পৃথিবীই গতিশীল, সূর্য সর্বদা স্থির।

আমাদের এই পৃথিবীর দুইটি গতি—আবর্তন ও পরিক্রমণ

একটি লাটিম যেমন নিজের আলের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ স্থান পরিবর্তন করিতে পারে, আমাদের পৃথিবীও সেইরূপ নিজের অক্ষের উপর আবর্তিত হইতে



৮নং চিত্র

হইতে সূর্যের চারিদিকে ক্রমাগত ঘুরিতেছে। পৃথিবীর এই দুই প্রকার গতির প্রথমটিকে আমরা বলি **আবর্তন**, দ্বিতীয়টিকে বলি **পরিক্রমণ**।

পৃথিবীর আবর্তন (Rotation of the Earth)

পৃথিবী আপন অক্ষের (Axis) চারিদিকে অবিরত পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবীর অক্ষ বলিতে আমরা উহার উত্তর-দক্ষিণ ব্যাসকেই বুঝি। নিজ অক্ষের চারিদিকে একবার ঘুরিতে পৃথিবীর মোটামুটি ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে; ইহাকে **সৌর দিবস** (Solar Day) বলা হয়। পৃথিবীর এই আবর্তনের ফলে আমাদের দিনরাত্রি হয়, তাই এই গতিকে **আহ্নিক গতি** (Diurnal Motion) বলা হয়।

পৃথিবীর আবর্তন বা আহ্নিক গতির প্রমাণ

(১) দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতির্বিদরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহগণ নিজ নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হইতেছে। পৃথিবীও একটি সৌরগ্রহ; সুতরাং পৃথিবীও নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হইতেছে, এরূপ সিদ্ধান্ত সহজেই করা যাইতে পারে।

(২) কোন নরম জিনিস অনবরত পাক খাইলে ক্রমশঃ উহার উপর ও নীচের দুই প্রান্ত চাপা এবং মধ্যভাগ স্ফীত হইয়া যায়। পৃথিবীর মেরুদ্বয়ও কিঞ্চিৎ চাপা এবং নিরক্ষীয় প্রদেশ কিছুটা স্ফীত। ইহা দ্বারা মনে হয় পৃথিবী প্রথমে নরম ছিল এবং অবিরত আবর্তিত হইতে হইতে বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৩) আমরা দেখি যে সূর্য ও নক্ষত্রাদি প্রত্যহ পূর্বাকাশে উদিত হয় এবং পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, হয় পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তিত হইতেছে, না হয় পৃথিবী স্থির, সূর্য ও নক্ষত্রাদিই উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। নিম্নোক্ত দুইটি কারণে শেষোক্ত মতটি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।

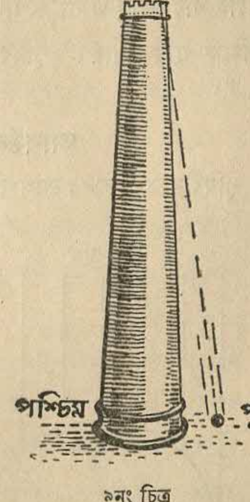
(ক) সূর্য পৃথিবী হইতে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত; নক্ষত্রগুলি আরও অনেক বেশী দূরে। সূর্য যদি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে তবে উহার গতিবেগ ঘণ্টায় আড়াই কোটি মাইল হইবে। নক্ষত্রগুলির গতিবেগ আরও বহু শত গুণ বেশী হইবে। এই গতিবেগ আলোক-তরঙ্গের গতিবেগের চেয়েও

বেশী। আলোক-তরঙ্গের চেয়ে অধিক গতি কোন পদার্থের হইতে পারে না। কাজেই সূর্য ও নক্ষত্রাদি পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

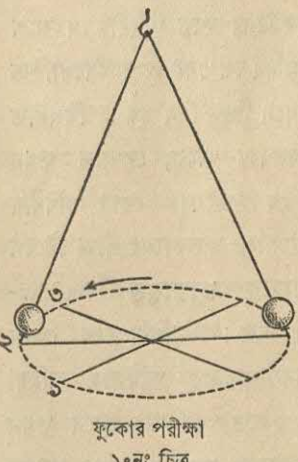
(খ) সূর্য পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়। মাধ্যাকর্ষণ সূত্র অনুযায়ী আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী অতি বৃহৎ সূর্যকে তাহার চারিদিকে কখনই ঘুরাইতে সক্ষম হইবে না। কাজেই, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে—এই সিদ্ধান্তই ভুল।

অপর পক্ষে পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হইতেছে এই সিদ্ধান্তই সঠিকভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৪) পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে নিশ্চল বাতাসে বহু উচ্চ স্থান হইতে কোন ভারী জিনিস ছাড়িয়া দিলে উহা ঠিক লম্বরেখাক্রমে মাটিতে না পড়িয়া একটু পূর্বদিকে সরিয়া পড়ে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তিত হইতেছে বলিয়া এইরূপ হয়। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে এই উচ্চ স্থানের গতিবেগ বেশী বলিয়াই জিনিসটি এই সঞ্চিত গতিবেগের জন্য একটু পূর্বদিকে সরিয়া পড়ে।



৯নং চিত্র



ফুকোর পরীক্ষা
১০নং চিত্র

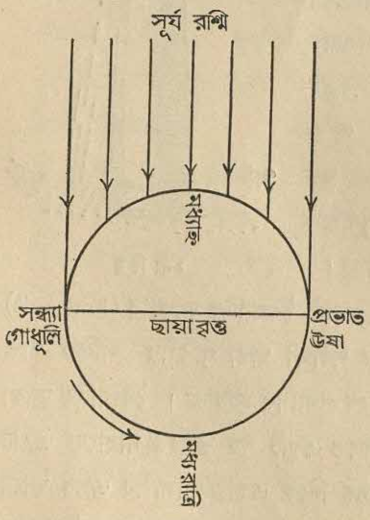
(৫) ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফুকো'র (Foucault) দোলকের পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর আহ্নিক গতি নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ফুকো প্যারী নগরীর এক সু-উচ্চ গম্বুজের চূড়া হইতে একটি সরু তারের সাহায্যে একটি দোলক ঝুলাইয়া দেন। দোলকের নীচের দিকে একটি আলপিন এরূপ ভাবে লাগানো ছিল যে, দোলকটি দুলাইয়া দিলে উহা নীচে মাটিতে ছড়ানো বালির

উপর দাগ কাটিতে পারে। এখন দোলকটি এমন ভাবে দুলাইয়া দেওয়া হইল যে দোলক-সংলগ্ন আলপিনটি বালির উপর উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি দাগ কাটিতে লাগিল। ফুকো লক্ষ্য করিলেন যে দাগগুলি ক্রমে একটু একটু করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে সরিতেছে। কিন্তু কেন এইরূপ হইতেছিল ? দোলক তো সকল সময় একই সমতলে দোলে। কাজেই ঐ দোলকটিও নিশ্চয়ই ঠিক একইভাবে দুলিতেছিল। কিন্তু পৃথিবীর নিজ আবর্তনের জন্যই আলপিনের দাগ নীচের মাটিতে একই রেখায় না পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন রেখায় পড়িতেছিল। ইহা হইতেই নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বে আবর্তিত হইতেছে।

(৬) পৃথিবী আপন অক্ষরেখার চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘুরিতেছে বলিয়াই বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বাঁকিয়া যায়। পৃথিবী স্থির থাকিলে ইহা কখনই হইত না।

আবর্তন বা আহ্নিক গতির ফল

পৃথিবীর আবর্তনের ফলে দিবারাত্র হয়। আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের সম্মুখীন হয় সেই অংশ আলোকিত হয়, সেখানে তখন দিন হয়। বিপরীত অংশ অন্ধকারে থাকে, সেখানে তখন রাত্রি। যে বৃত্তাকার রেখা পৃথিবীর গাত্রে আলো ও অন্ধকারের সীমা নির্দেশ করে তাহাকে **ছায়াবৃত্ত** (Shadow-Circle) বলে। পৃথিবীপৃষ্ঠের কোন স্থান যখন ছায়াবৃত্ত অতিক্রম করিয়া অন্ধকার হইতে আলোতে আসে তখন সেখানে প্রভাত হয়, এবং যখন আলো হইতে অন্ধকারে যায় তখন সেখানে সন্ধ্যা নামে। সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর ক্ষীণ সূর্যালোক বাতাসের



১১নং চিত্র

ধূলিকণায় প্রতিফলিত হইয়া যে ক্ষীণ ও বিক্ষিপ্ত আলোক (Diffused Ray) বিস্তার করে তাহাকে আমরা যথাক্রমে উষা ও গোধূলি বলি।

ইহা ছাড়া পৃথিবীর আবর্তনের জন্য বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বাঁকিয়া যায়। এই তত্ত্ব **ফেরেল সূত্র** (Ferrel's Law) নামে পরিচিত।

পৃথিবীর পরিক্রমণ (Earth's Revolution)

পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পথে সূর্যকে পরিক্রমণ করিতেছে। এই ভ্রমণ-পথকে আমরা **কক্ষ** (Orbit) বলি। ইহা **উপবৃত্তাকার** (Elliptical)। সূর্যকে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ড (মোটামুটি হিসাবে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা) সময় লাগে। ইহাই আমাদের সৌর বৎসর। পরিক্রমণে এক বৎসর সময় লাগে বলিয়া এই গতিকে বার্ষিক গতিও বলা হয়।

পৃথিবীর পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতির প্রমাণ

(১) দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহাদি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীও একটি গ্রহ। অতএব পৃথিবীও সূর্যকে পরিক্রমণ করে, এরূপ সিদ্ধান্ত সহজেই করা যাইতে পারে।

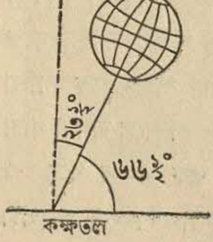
(২) প্রতিদিন আকাশে নক্ষত্রগুলিকে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে প্রথম দিন যেখানে নক্ষত্রগুলিকে আকাশের গায়ে দেখা গেল, পরদিন উহাদের তাহা অপেক্ষা কিছুটা পশ্চিম দিকে দেখা যায় ; তাহার পরদিন আরও একটু পশ্চিমে তাহাদিগকে লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে প্রতিদিন উহারা অল্প অল্প করিয়া পশ্চিমদিকে সরিয়া যায়, এবং ক্রমশঃ সরিতে সরিতে উহারা একেবারে দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া যায়, সন্ধ্যার পর হইতে উহাদিগকে আর দেখা যায় না। এক বৎসর পরে ঐ নক্ষত্রগুলিকে আবার ঠিক পূর্ব স্থানেই দেখা যাইবে। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী নক্ষত্রগুলির পক্ষে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবী আপন কক্ষপথে স্থান পরিবর্তন করে বলিয়াই এরূপ মনে হয়।

(৩) সূর্যকে বৎসরে মাত্র ২ দিন ঠিক পূর্ব দিকে উদিত হইতে এবং ঠিক পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতে দেখা যায়। অন্যান্য সময় একটু উত্তরে কিম্বা দক্ষিণে সরিয়া সূর্যোদয় হয়। পৃথিবী আপন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার কালে স্থান পরিবর্তন করে বলিয়াই সূর্যকে এইরূপ একটু উত্তরে বা দক্ষিণে সরিয়া উদিত হইতে দেখা যায়।

(৪) পৃথিবী একই স্থানে থাকিয়া আবর্তিত হইলে পৃথিবীর কোন কোন স্থানে চিরদিবস এবং কোন কোন স্থানে চিররাত্রি হইত, এবং ঋতু-পরিবর্তন ঘটিত না।

এখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ যে পৃথিবীই সূর্যকে পরিক্রমণ করিবার কালে আপন কক্ষপথে আবর্তিত হইতেছে। পৃথিবীর এই সূর্য-পরিক্রমণের পথটি উপবৃত্তাকার। আমাদের এই সূর্য পৃথিবীর এই উপবৃত্তাকার ভ্রমণ-পথের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত নয়। উহা উপবৃত্তের একটি নাভিতে (focus) অবস্থিত। তাই সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব সকল সময় এক থাকে না। পৃথিবী যখন সূর্যের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয় তখন তাহাদের মধ্যে ব্যবধান হয় ৯ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল এবং যখন সূর্য হইতে সর্বাধিক দূরবর্তী হয় তখন তাহাদের মধ্যে ব্যবধান হয় ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ মাইল। পৃথিবীর কেন্দ্র, সূর্যের কেন্দ্র এবং কক্ষতল একই সমতলে অবস্থিত।

পৃথিবীর অক্ষ (Axis) কক্ষ-সমতলের সহিত ৬৬½° কোণে হেলান আছে এবং এই হেলানভাবে পৃথিবী নিজ কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবীর অক্ষ বা মেরুরেখাকে উত্তর মেরুর দিকে শূন্যে বর্ধিত করিলে উহা ধ্রুবতারার নিকট দিয়া যাইবে অর্থাৎ মেরুরেখা সব সময়েই ধ্রুবতারার অভিমুখী থাকিবে।



১২নং চিত্র

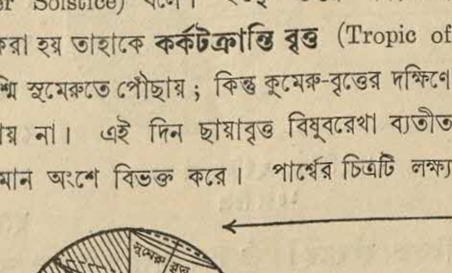
পৃথিবীর মেরুরেখা (Axis) যদি কক্ষতলের সহিত ৬৬½° কৌণিকভাবে হেলান না থাকিয়া কক্ষতলের সহিত লম্বভাবে অবস্থান করিত তবে ছায়াবৃত্ত প্রত্যেক **অক্ষ-রেখাকে** (Parallels of Latitude) সমান দুই অংশে ভাগ করিত। ফলে, পৃথিবীর সর্বত্র বৎসরের সকল দিনই দিবারাত্রির পরিমাণ সমান হইত; সূর্যকেও প্রত্যহই ঠিক পূর্ব দিকে উদিত হইতে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতে দেখা যাইত।

আবার যদি মেরুরেখা কক্ষতলের সহিত সমান্তরাল অবস্থায় এবং উত্তর অথবা দক্ষিণ মেরু সূর্যের সম্মুখীন থাকিত তবে পৃথিবীর এক গোলার্ধে চিরদিবস এবং অপর গোলার্ধে চিররাত্রি হইত।

পৃথিবীর পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতির ফল

মেরুরেখাকে কক্ষতলের সহিত হেলান অবস্থায় রাখিয়া পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমণ করে বলিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে (১) **দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি** এবং (২) **ঋতু-পরিবর্তন** ঘটিয়া থাকে।

(১) দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি—সূর্য-পরিক্রমণকালে ২১শে জুন তারিখে পৃথিবী এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌছায় যখন সূর্যরশ্মি বিষুবরেখা হইতে ২৩½° উত্তর অক্ষাংশে লম্বভাবে পতিত হয়। ইহার উত্তরে কখনও সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পতিত হয় না। ইহাই সূর্যের উত্তরমুখী আপাত-গতির শেষ সীমা। এই দিনকে **উত্তরায়ণান্ত দিবস** (Summer Solstice) বলে। ২৩½° উত্তর অক্ষাংশের উপর দিয়া যে সমাক্ষরেখা কল্পনা করা হয় তাহাকে **কর্কটক্রান্তি বৃত্ত** (Tropic of Cancer) বলে। এই দিন সূর্যরশ্মি সুমেরুতে পৌছায়; কিন্তু কুমেরু-বৃত্তের দক্ষিণে তখন সূর্যালোক মোটেই পৌছায় না। এই দিন ছায়াবৃত্ত বিষুবরেখা ব্যতীত অন্যান্য সমাক্ষরেখাকে দুইটি অসমান অংশে বিভক্ত করে। পার্শ্বের চিত্রটি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে যে ঐদিন বিষুবরেখার অর্ধেক অংশ আলোকিত এবং অপর অংশ অন্ধকারাবৃত আছে। ঐ দিন বিষুব অঞ্চলে দিন-রাত্রি সমান হয়। কিন্তু উত্তর গোলার্ধে সমাক্ষরেখা-গুলির বেশী অংশ আলোতে

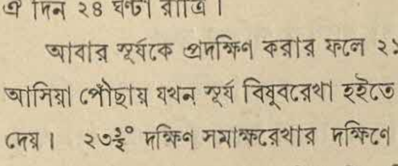


২১শে জুন সূর্যকিরণের অবস্থা
১৩নং চিত্র

এবং কম অংশ অন্ধকারে আছে; অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে তখন দিন বড় এবং রাত্রি ছোট। দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা। সেখানে সমাক্ষরেখাগুলির

বেশী অংশ অন্ধকারে এবং কম অংশ আলোতে আছে। সেখানে তখন দিন ছোট এবং রাত্রি বড়। ৬৬½° উত্তর সমাক্ষরেখায় ও তাহার উত্তরে সেইদিন সব সময় আলো থাকে, তাই সেখানে ২৪ ঘণ্টা দিন; আবার ৬৬½° দক্ষিণ সমাক্ষরেখায় ঐ দিন ২৪ ঘণ্টা রাত্রি।

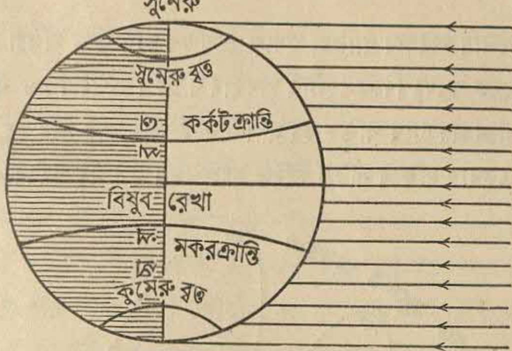
আবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার ফলে ২১শে ডিসেম্বর পৃথিবী এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌছায় যখন সূর্য বিষুবরেখা হইতে ২৩½° দক্ষিণ অক্ষাংশে লম্বভাবে কিরণ দেয়। ২৩½° দক্ষিণ সমাক্ষরেখার দক্ষিণে কখনই সূর্যালোক লম্বভাবে পতিত হয় না। ইহাই সূর্যের আপাত-দক্ষিণমুখী গতির শেষ সীমা। ২৩½° দক্ষিণ সমাক্ষরেখাকে **মকরক্রান্তি বৃত্ত** (Tropic of Capricorn) বলে। ঐ দিনকে সূর্যের **দক্ষিণায়নান্ত দিবস** (Winter Solstice) বলে। পার্শ্বের চিত্রটি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে ছায়াবৃত্ত ঐদিনও বিষুবরেখাকে সমান দুইটি অংশে বিভক্ত করিয়াছে। বিষুবরেখার অর্ধেক অংশ আলোতে এবং অর্ধেক অন্ধকারে আছে। ঐ দিন বিষুবরেখা অঞ্চলে দিন-রাত্রির পরিমাণ সমান হয়। অন্যান্য সমাক্ষরেখা ছায়াবৃত্ত দ্বারা দুই অসমান অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ দিন সূর্যরশ্মি কুমেরু অবধি পৌছায়, কিন্তু সুমেরু-বৃত্তের উত্তরে তখন সূর্যরশ্মি পৌছায় না। দক্ষিণ গোলার্ধে সমাক্ষরেখাগুলির বেশীর ভাগ আলোকিত, কম অংশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন; অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধে অধিক সময় আলো থাকে। সুতরাং দক্ষিণ গোলার্ধে তখন দিনের পরিমাণ বেশী এবং রাত্রির পরিমাণ কম হয়। উত্তর গোলার্ধে ঠিক উহার বিপরীত অবস্থা, অর্থাৎ সেখানে তখন দিন ছোট এবং রাত্রি বড়। ২১শে জুন সুমেরু এবং ২১শে ডিসেম্বর কুমেরু সূর্যের দিকে হেলিয়া থাকে। ২১শে ডিসেম্বর তারিখে কুমেরু-বৃত্তে ২৪ ঘণ্টাই দিন এবং সুমেরু-বৃত্তে ২৪ ঘণ্টাই রাত্রি।



২১শে ডিসেম্বর সূর্যকিরণের অবস্থা
১৪নং চিত্র

আবার ২২শে মার্চ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর সূর্য বিষুবরেখার উপরে ঠিক

লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই দুই দিন ছায়াবৃত্তসকল সমাক্ষরেখাকে সমান দুইটি অংশে বিভক্ত করে। ঐ দুই দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রির পরিমাণ সমান হয়।



২২শে মার্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর
সূর্যকিরণের অবস্থা

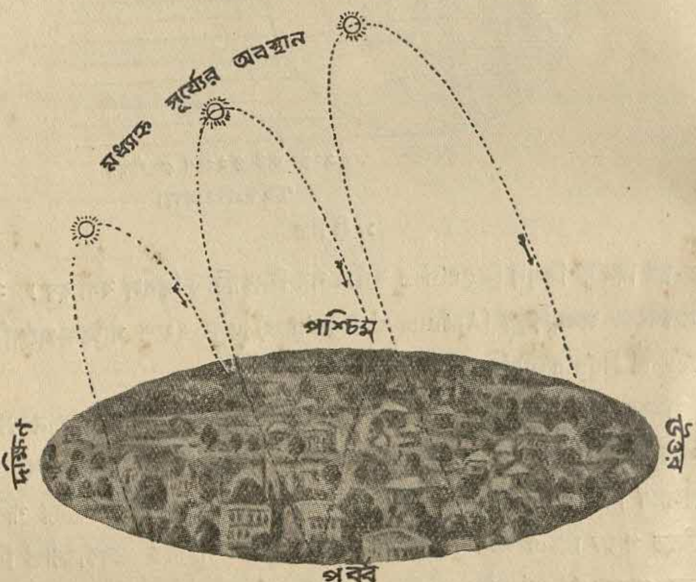
১৫নং চিত্র

এই দুই দিনকে **বিষুব** (Equinox অর্থাৎ সম-দিনরাত্রি) **দিবস** বলা হয়। ২২শে সেপ্টেম্বরকে **জলবিষুব** (Autumnal Equinox) এবং ২২শে মার্চকে **মহাবিষুব** (Vernal Equinox) **দিবস** বলা হয়।

বিষুবরেখা-অঞ্চলে বৎসরের সকল সময় দিনরাত্রির পরিমাণ সমান থাকে। ২২শে মার্চের পর হইতে সূর্য যখন বিষুবরেখার উত্তরে সরিতে থাকে তখন উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিনের পরিমাণ কমিতে থাকে। এইরূপে দিনের পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে উত্তরায়ণান্ত দিবসে উত্তর গোলার্ধের সর্বত্র দীর্ঘতম দিন এবং ক্ষুদ্রতম রাত্রি হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে ঐ তারিখে দীর্ঘতম রাত্রি এবং ক্ষুদ্রতম দিন হয়। ২২শে মার্চ হইতে ২২শে সেপ্টেম্বর —এই ছয় মাস সুমেরুতে নিরবচ্ছিন্ন দিন এবং কুমেরুতে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি থাকে। ২২শে সেপ্টেম্বরের পর হইতে সূর্য যখন বিষুবরেখার দক্ষিণে সরিতে থাকে তখন দক্ষিণ গোলার্ধে দিনের পরিমাণ বাড়িতে থাকে আর উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ কমিতে থাকে। এই ভাবে দক্ষিণায়নান্ত দিবসে দক্ষিণ গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন এবং ক্ষুদ্রতম রাত্রি এবং উত্তর গোলার্ধে ক্ষুদ্রতম দিন এবং দীর্ঘতম রাত্রি হয়।

২২শে সেপ্টেম্বর হইতে ২২শে মার্চ এই ছয় মাস কুমেরুতে নিরবচ্ছিন্ন দিন এবং সুমেরুতে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি হয়। এইভাবেই পৃথিবীতে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পৃথিবী হেলান অবস্থায় থাকিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া কখনও সুমেরু কখনও বা কুমেরু সূর্যের দিকে হেলান অবস্থায় থাকে। সূর্যরশ্মিও বৎসরের সকল সময় একই স্থানে লম্বভাবে পতিত হয় না। তাই আমাদের মনে হয়, সূর্য একবার উত্তরে এবং একবার দক্ষিণে সরিয়া উদিত হইতেছে। ইহাই সূর্যের আপাত-গতি।



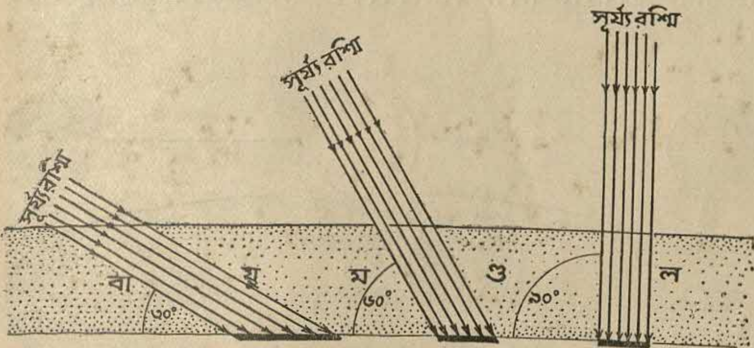
১৬নং চিত্র

২১শে ডিসেম্বর সূর্য উহার দক্ষিণ-গতির শেষ সীমায় পৌছায়। ২১শে ডিসেম্বর হইতে ২১শে জুন পর্যন্ত সূর্যকে ক্রমাগত উত্তর দিকে সরিয়া যাইতে দেখা যায়। ইহাই সূর্যের **উত্তরায়ণ**। আবার ২১শে জুন হইতে ২১শে ডিসেম্বর সূর্যকে ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিয়া যাইতে দেখা যায়। ইহা সূর্যের **দক্ষিণায়ন**। সূর্যের এই সম্পূর্ণ আপাত-গতি-পথকে **রবিমার্গ** (ecliptic) বলে।

(২) ঋতু-পরিবর্তন—পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্যতাপের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব হয়। সূর্যতাপের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রধানতঃ নিম্নোক্ত কারণে হইয়া থাকে।

(ক) সূর্য হইতে আমরা তাপ পাই। সূর্যরশ্মি বায়ুস্তর ভেদ করিয়া পৃথিবীতে পৌছায়। বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আসার সময় বায়ুস্থিত ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্প তাপের কিছু অংশ শোষণ করিয়া লয়। অতএব সূর্যরশ্মিকে অধিক বায়ুস্তর ভেদ করিতে হইলে উহার তাপশক্তি অনেকটা হ্রাস পায়।

(খ) দ্বিতীয়তঃ সূর্যরশ্মি লম্বভাবে না পড়িয়া তির্যকভাবে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইলে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ রশ্মি বেশী পরিমাণ স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এজন্য তির্যকরশ্মির উত্তাপ-শক্তি অনেকটা কমিয়া যায়। এই তির্যকরশ্মিকে অধিক বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয় বলিয়া যে স্থানে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে সেই স্থান অধিক



১৭নং চিত্র

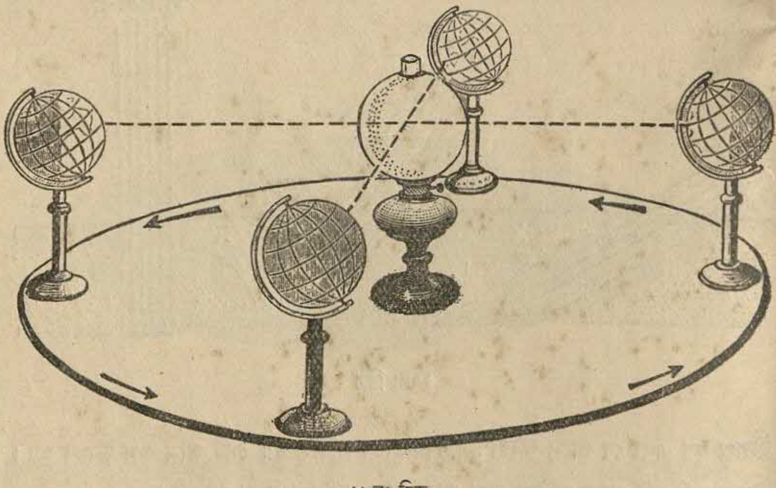
উত্তপ্ত হয় এবং যে স্থানে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পতিত হয় সেই স্থান কম উত্তপ্ত হয়। উপরের চিত্রটি লক্ষ্য করিলে ইহা ভাল ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

সকালে ও বিকালে সূর্যকিরণ পৃথিবীপৃষ্ঠে তির্যকভাবে পড়ে বলিয়া তখন তাপ কম থাকে। আবার মধ্যাহ্নে সূর্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয়, তাই তখন আমরা বেশী উত্তাপ পাইয়া থাকি।

(গ) দিনের বেলা ভূ-পৃষ্ঠ সূর্য হইতে তাপ গ্রহণ করে এবং রাত্রিতে ঐ তাপ বিকিরণ করিতে থাকে। কোন স্থানে যদি দিনের পরিমাণ বেশী হয় তাহা হইলে ঐ স্থানের ভূ-পৃষ্ঠ দিবাভাগে অধিক তাপ গ্রহণ করে, কিন্তু স্বল্পপরিসর রাত্রিতে সবটুকু তাপ বিকিরণ করিতে পারে না। তাই কিছুটা তাপ থাকিয়া যায়। এইরূপে পৃথিবীর কোন অংশে দিনমান বড় হইলে সেই অংশে সেই সময় ক্রমশঃ তাপ সঞ্চিত হইতে হইতে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

অপর পক্ষে, কোন স্থানে রাত্রির পরিমাণ অধিক হইলে দিবাভাগে সঞ্চিত অল্প তাপ তাড়াতাড়ি বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। তারপর ঐ স্থানের ভূ-পৃষ্ঠাংশ নিজস্ব সঞ্চিত তাপ বিকিরণ করিয়া ক্রমশঃ শীতল হইয়া পড়ে।

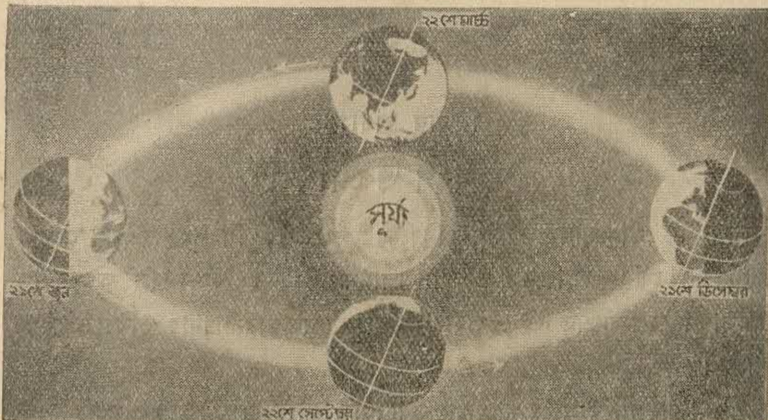
দিন ও রাত্রির পরিমাণের পার্থক্য যত কম হয় তাপের বৈষম্যও তত কম হয়। ২১শে জুন উত্তর গোলার্ধের দীর্ঘতম দিন। ঐ দিনই উত্তর গোলার্ধে দিনরাত্রির পরিমাণের পার্থক্য সবচেয়ে বেশী। ২১শে জুনের দেড়মাস পূর্ব হইতে



১৮নং চিত্র

দেড়মাস পর পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ রাত্রির পরিমাণের চেয়ে বেশী থাকে। তাই সেখানে তখন তাপের আধিক্য ঘটে। এইজন্য এই তিন মাস অর্থাৎ মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত **উত্তর গোলার্ধে**

গ্রীষ্মকাল। আবার ২১শে ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ সবচেয়ে কম হয়; কিন্তু এর দেড়মাস পূর্ব হইতে দেড়মাস পর পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ বেশ কম থাকে। এজন্য এই তিন মাস অর্থাৎ নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে তাপের হ্রাস হয়। তাই তখন **উত্তর গোলার্ধে শীতকাল**। এই দুই ঋতুর মধ্যবর্তীকালে উত্তাপের একটা নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা থাকে। তখন নাতিশীতোষ্ণ ঋতুর আবির্ভাব হয়। তাই আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তিন মাস **উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল**। আবার শীতের পর ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত **উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল**।



ঋতু-পরিবর্তন

১৯নং চিত্র

অনুরূপ কারণে তোমরা দেখিতে পাইবে যে উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্ম, **দক্ষিণ গোলার্ধে** তখন **শীতকাল** এবং উত্তর গোলার্ধে যখন শীত, **দক্ষিণ গোলার্ধে** তখন **গ্রীষ্মকাল**। আবার উত্তর গোলার্ধে যখন শরৎ, **দক্ষিণ গোলার্ধে** তখন **বসন্তকাল** এবং উত্তর গোলার্ধে যখন বসন্ত, **দক্ষিণ গোলার্ধে** তখন **শরৎকাল**।

এইরূপে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও বসন্ত এই চারি ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে।

[পৃথিবীতে প্রধানতঃ এই চারিটি ঋতু হয়, তবে জলবায়ুর বিশেষত্বের জন্য স্থানবিশেষে ঋতুর সংখ্যা কম বা বেশী হইতে পারে। যেমন, আমাদের বাংলা দেশে ছয়টি ঋতু। মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এখানে বর্ষা একটা ঋতুর স্থান অধিকার করিয়াছে। আবার শরতের শেষে যখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রায় বন্ধ হইয়া আসে এবং বর্ষার জল শুকাইতে থাকে তখন হেমন্তকাল। আমাদের দেশে তাই বারোমাসে ছয় ঋতু : গ্রীষ্ম (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ), বর্ষা (আষাঢ়, শ্রাবণ), শরৎ (ভাদ্র, আশ্বিন), হেমন্ত (কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ), শীত (পৌষ, মাঘ), ও বসন্ত (ফাল্গুন, চৈত্র)।

আবার নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৎসরের সব সময়ই ১২ ঘণ্টা দিন এবং ১২ ঘণ্টা রাত্রি থাকে। তাই সেখানে বৎসরে বলিতে গেলে একটাই ঋতু হয়। ঐ অঞ্চলকে চিরগ্রীষ্মের দেশ বলা যাইতে পারে।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা

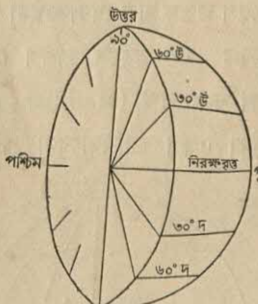
ভূ-পৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি পরস্পরচ্ছেদী রেখার কল্পনা করা হয়। ইহাদের কতকগুলি দ্রাঘিমারেখা এবং কতকগুলি অক্ষরেখা। অবস্থান নির্দেশ ব্যতীত এই রেখাদ্বারা অন্যান্য নানাপ্রকার গণনার সুবিধাও হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, ভূ-পৃষ্ঠের গায়ে দাগ-কাটা সত্যিকারের কোন রেখা নাই। এই রেখাগুলি সবই কাল্পনিক। পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত যে সরলরেখা কল্পনা করা হয়, তাহাকে পৃথিবীর **অক্ষ** (Axis), **মেরুরেখা** (Polar Axis) বা পৃথিবীর মেরুদণ্ড বলা হয়। এই মেরুরেখার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দুর নাম যথাক্রমে **উত্তর মেরু** বা **সুমেরু** (North Pole) এবং **দক্ষিণ মেরু** বা **কুমেরু** (South Pole)। মেরুরেখা কাল্পনিক, কিন্তু মেরুবিন্দুদ্বয় ভূ-পৃষ্ঠে দুইটি সুনির্দিষ্ট বিন্দু। সুমেরু এবং কুমেরু হইতে সমান দূরে একটি বৃত্তাকার রেখা কল্পনা করা হয়। ইহা পৃথিবীকে

পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাকে **নিরক্ষবৃত্ত** বা **বিষুবরেখা** (Equator) বলা হয়। নিরক্ষবৃত্ত পৃথিবীকে দুইটি সমান অংশে বিভক্ত করিয়াছে। উহার উত্তর ভাগকে **উত্তর গোলার্ধ** (Northern Hemisphere) ও দক্ষিণ ভাগকে **দক্ষিণ গোলার্ধ** (Southern Hemisphere) বলা হয়।

অক্ষাংশ ও সমাক্ষরেখা—পৃথিবী গোলাকার বলিয়া ভূ-পৃষ্ঠে দুইটি স্থানের ব্যবধান নির্দেশের জন্য সাধারণতঃ কৌণিক পরিমাপের (Angular Measurement) সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। ভূ-পৃষ্ঠে দুইটি স্থান ভূ-কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে, উহাই ঐ দুই স্থানের কৌণিক দূরত্ব। **বিষুবরেখা হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) বলা হয়।**

পৃথিবী একটি গোলক ; সুতরাং উহার পরিধির কৌণিক পরিমাপ ৩৬০°। নিরক্ষবৃত্ত হইতে মেরু পর্যন্ত স্থানের ব্যবধান পরিধির এক-চতুর্থাংশ, অর্থাৎ ৯০°। নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ ০° ধরা হয়। সেই হিসাবে সুমেরু এবং কুমেরুর অক্ষাংশ যথাক্রমে ৯০° উত্তর এবং ৯০° দক্ষিণ। প্রতি ডিগ্রীকে ৬০′ মিনিট এবং প্রতি মিনিটকে ৬০″ সেকেণ্ডে ভাগ করা হয়। এরূপ প্রত্যেক ভাগের উপর দিয়া নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল অনেকগুলি বৃত্ত কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাদিগকে **সমাক্ষ-রেখা** বা **অক্ষরেখা** (Parallels of Latitude) বলে। সমাক্ষরেখাগুলি নিরক্ষবৃত্তের



২০নং চিত্র

সমান্তরাল বলিয়া একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত সকল স্থানের অক্ষাংশ এক। নিরক্ষবৃত্তের নিকটবর্তী স্থানগুলিকে নিম্ন অক্ষাংশে (Low Latitude) এবং ৫০° সমাক্ষরেখা হইতে মেরু পর্যন্ত স্থানগুলিকে উচ্চ অক্ষাংশে (High Latitude) অবস্থিত বলা হয়। নিরক্ষবৃত্তের উত্তরের ও দক্ষিণের সমাক্ষরেখাগুলি যথাক্রমে উত্তর অক্ষরেখা এবং দক্ষিণ অক্ষরেখা নামে অভিহিত হয়।

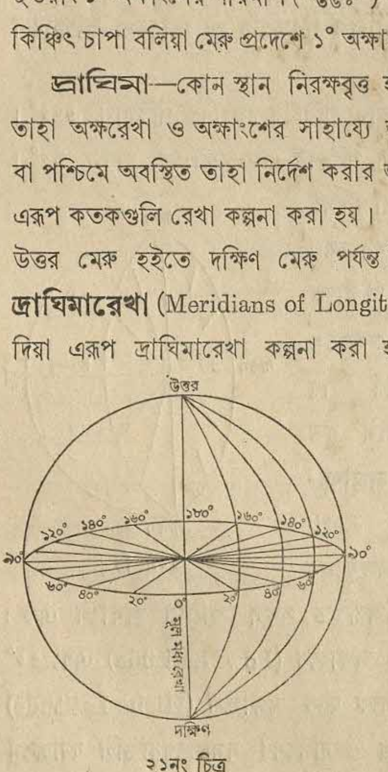
কলিকাতার অক্ষাংশ ২২°৩৪′ উত্তর। ইহা হইতে বোঝা যায় যে কলিকাতা

উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। ভূ-কেন্দ্র হইতে কলিকাতা এবং নিরক্ষবৃত্ত পর্যন্ত সরলরেখা টানিলে ভূ-কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন হইবে তাহার পরিমাণ ২২°৩৪′।

নিরক্ষবৃত্ত হইতে ২৩½° উত্তর ও ২৩½° দক্ষিণ অক্ষরেখাদ্বয় যথাক্রমে **কর্কটক্রান্তি বৃত্ত** (Tropic of Cancer) ও **মকরক্রান্তি বৃত্ত** (Tropic of Capricorn) নামে অভিহিত হয়। ৬৬½° উত্তর সমাক্ষরেখাকে বলা হয় **সুমেরু বৃত্ত** এবং ৬৬½° দক্ষিণ সমাক্ষরেখা **কুমেরু বৃত্ত** নামে পরিচিত।

পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫,০০০ মাইল এবং উহার কৌণিক পরিমাপ ৩৬০°। সুতরাং ১° অক্ষাংশের পরিমাপ (২৫০০০/৩৬০) মাইল = প্রায় ৬৯ মাইল। পৃথিবীর মেরুদ্বয় কিঞ্চিৎ চাপা বলিয়া মেরু প্রদেশে ১° অক্ষাংশের পরিমাপ ৬৯ মাইলের কিছু বেশী।

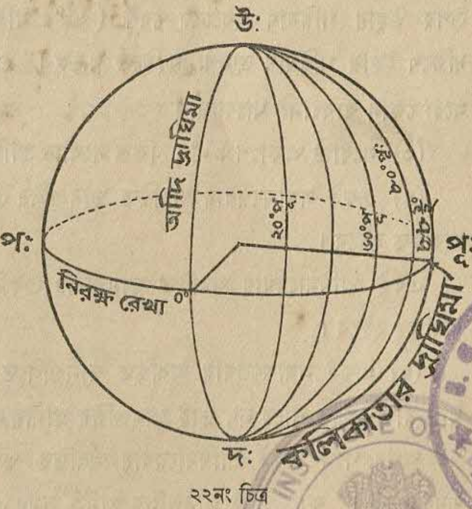
দ্রাঘিমা—কোন স্থান নিরক্ষবৃত্ত হইতে কত উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত তাহা অক্ষরেখা ও অক্ষাংশের সাহায্যে জানা যায়। কিন্তু কোন স্থান কত পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত তাহা নির্দেশ করার জন্য অক্ষরেখাগুলিকে লম্বভাবে ছেদ করে এরূপ কতকগুলি রেখা কল্পনা করা হয়। এই কল্পিত রেখাগুলি অর্ধবৃত্তাকার এবং উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের নাম **মধ্যরেখা** বা **দ্রাঘিমারেখা** (Meridians of Longitude)। ভূ-পৃষ্ঠের প্রত্যেক স্থানের উপর দিয়া এরূপ দ্রাঘিমারেখা কল্পনা করা হইয়াছে। গণনার সুবিধার জন্য ইহাদের মধ্যে একটি রেখার অবস্থিতি সুনির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। লণ্ডনের নিকটবর্তী গ্রীনিচের মধ্য দিয়া যে দ্রাঘিমারেখা কল্পনা করা হইয়াছে, উহাকেই **আদি-দ্রাঘিমারেখা** বা **মূল মধ্যরেখা** (Prime Meridian) বলিয়া ধরা হয়। **মূল মধ্যরেখা হইতে পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের দ্রাঘিমা (Longitude) বলে।** ভূ-পরিধির কৌণিক পরিমাপ ৩৬০°। সুতরাং এক ডিগ্রী অন্তর এক একটি দ্রাঘিমারেখা কল্পনা করা হইলে পৃথিবীতে



২১নং চিত্র

৩৬০টি দ্রাঘিমারেখা থাকিবে। মূল মধ্যরেখাকে ০° ধরিয়া উহার পূর্ব দিকে ১° অন্তর ১টি করিয়া ১৮০টি পূর্ব দ্রাঘিমারেখা এবং একইভাবে পশ্চিম দিকেও ১৮০টি পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা কল্পনা করা হইয়াছে। **১৮০° পূর্ব এবং ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা একই**। গ্রীনিচের পূর্ব দিক হইতে গণনা করিলে উহা ১৮০° পূর্ব এবং পশ্চিম দিক হইতে গণনা করিলে উহা ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা বলিয়া মনে হয়। অক্ষাংশের মত দ্রাঘিমার বেলাতেও প্রতি ডিগ্রীকে ৬০′ মিনিট এবং প্রতি মিনিটকে ৬০″ সেকেণ্ডে বিভক্ত করা হয়। গ্রীনিচের পূর্বদিকের স্থানগুলির দ্রাঘিমাকে **পূর্ব দ্রাঘিমা** (East Longitude) এবং পশ্চিম দিকের স্থানগুলির দ্রাঘিমাকে **পশ্চিম দ্রাঘিমা** (West Longitude) বলা হয়।

কলিকাতার দ্রাঘিমা ৮৮°২৪′ পূঃ বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে কলিকাতা গ্রীনিচের পূর্বে অবস্থিত, এবং নিরক্ষবৃত্তের সমতলে কলিকাতার দ্রাঘিমারেখা এবং গ্রীনিচের দ্রাঘিমারেখাকে ভূ-কেন্দ্রের সহিত যোগ করিলে ঐ রেখাদ্বয় ভূ-কেন্দ্রে ৮৮°২৪′ কোণ উৎপন্ন করিবে। দুইটি দ্রাঘিমারেখার মধ্যের ব্যবধান সকল স্থানে সমান নয়। নিরক্ষবৃত্তের উপর এই ব্যবধান সবচেয়ে বেশী। উত্তর ও দক্ষিণে এই ব্যবধান ক্রমশঃ কমিতে থাকে। মেরুতে



২২নং চিত্র

কোন ব্যবধানই থাকে না। নিরক্ষবৃত্তের উপর ১° দ্রাঘিমার রৈখিক দূরত্ব প্রায় ৬৯ মাইল ; কর্কট ও মকর ক্রান্তিতে (২৩½° উঃ ও ২৩½° দঃ অক্ষরেখায়) প্রায় ৬৫ মাইল এবং সুমেরু ও কুমেরু বৃত্তে (৬৬½° উঃ ও ৬৬½° দঃ অক্ষরেখায়) প্রায় ৮ মাইল এবং মেরুবিন্দুতে উহারা একেবারে মিলিয়া যায়।

সমাক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার পার্থক্য

(১) সমাক্ষরেখাগুলির প্রত্যেকটি পূর্ণবৃত্ত। ইহাদের মধ্যে নিরক্ষবৃত্ত বা বিষুব-রেখা বৃহত্তম। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে সমাক্ষবৃত্তগুলি ক্রমশঃ ছোট হইতে হইতে মেরুতে একেবারে একটি বিন্দুতে পরিণত হয়। সমাক্ষবৃত্তগুলি পরস্পর সমান্তরাল।

দ্রাঘিমারেখাগুলি এক একটি অর্ধবৃত্ত। ইহারা পরস্পর সমান কিন্তু সমান্তরাল নয়। নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে দ্রাঘিমারেখাগুলির মধ্যের দূরত্ব ক্রমশঃ কমিতে থাকে, শেষে মেরুবিন্দুতে দ্রাঘিমারেখাগুলি একেবারে মিলিয়া যায়।

(২) ১° ডিগ্রী অক্ষাংশের রৈখিক পরিমাণ পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় সমান (নিরক্ষ অঞ্চলে ৬৯ মাইল এবং মেরু প্রদেশ কিছু চাপা বলিয়া সেখানে ৬৯ মাইলের কিছু বেশী)।

কিন্তু ১° ডিগ্রী দ্রাঘিমার রৈখিক পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। নিরক্ষবৃত্তের উপর উহার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী (৬৯·৫ মাইল); নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে ইহার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। মেরুবিন্দুতে দুইটি দ্রাঘিমারেখার মধ্যে কোন ব্যবধানই থাকে না।

(৩) সর্বোচ্চ অক্ষাংশ ৯০°; কিন্তু সর্বোচ্চ দ্রাঘিমাংশ ১৮০°।

(৪) একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত স্থানগুলির একটি অপরটির পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত হইবে।

একই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত স্থানগুলির একটি অপরটির উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত হইবে।

(৫) একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত স্থানগুলিতে একই সময়ে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন বা সূর্যাস্ত হইতে পারে না, তাই স্থানগুলির স্থানীয় সময়ও বিভিন্ন হইবে।

অপর পক্ষে একই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত স্থানগুলির সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় একই। কাজেই ঐ স্থানগুলির স্থানীয় সময় এক হইবে।

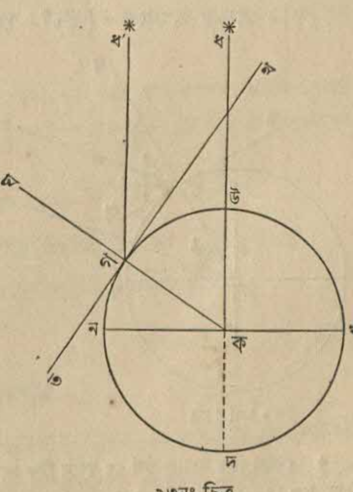
অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার প্রয়োজনীয়তা

অক্ষাংশের সাহায্যে কোন্ স্থান পৃথিবীপৃষ্ঠে নিরক্ষবৃত্ত হইতে কত উত্তরে বা দক্ষিণে এবং দ্রাঘিমার সাহায্যে কোন্ স্থান মূল মধ্যরেখা হইতে কত পূর্বে বা

পশ্চিমে অবস্থিত তাহা নির্ণয় করা যায়। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার সাহায্যে পৃথিবী-পৃষ্ঠে কিংবা মানচিত্রে কোন স্থানের সঠিক অবস্থান আমরা নির্ণয় করিতে পারি।

অক্ষাংশ নির্ণয়

(ক) **ধ্রুবতারার সাহায্যে**—ধ্রুবতারা একটি স্থির নক্ষত্র। উত্তর গোলার্ধের সকল স্থান হইতে ধ্রুবতারাকে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল স্থানে ইহাকে সমান উচ্চে দেখা যায় না। নিরক্ষবৃত্তে ধ্রুবতারাকে ঠিক দিগন্ত-রেখায় দেখা যায়, অর্থাৎ সেখানে ধ্রুবতারার উন্নতি ০°। আবার উত্তর মেরুতে ধ্রুবতারাকে ঠিক মাথার উপরে দেখা যায়, ধ্রুবতারার উন্নতি সেখানে ৯০°। নিরক্ষবৃত্ত হইতে সুমেরুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে প্রতি ডিগ্রী অক্ষাংশে ধ্রুবতারার উন্নতি ১° করিয়া বাড়িতে থাকে। **তাই উত্তর গোলার্ধের কোন স্থানের অক্ষাংশ সেই স্থানের ধ্রুবতারার উন্নতির সমান।** তাই ধ্রুবতারার উন্নতি বাহির করিতে পারিলেই ঐ স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যাইবে। **উত্তর গোলার্ধের কোন স্থানের ধ্রুবতারার উন্নতি সেই স্থানের অক্ষাংশের সমান।** এই তথ্য জ্যামিতির সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যায়।



২৩নং চিত্র

মনে কর পার্শ্বের চিত্রে অঙ্কিত বৃত্তটি পৃথিবী। ক উহার কেন্দ্র। **নখ** নিরক্ষবৃত্ত। **উদ** পৃথিবীর মেরুরেখা। **গ** পৃথিবীপৃষ্ঠে একটি স্থান। **তথ গ** স্থানের দিগন্তরেখা। **ধ** ধ্রুবতারা। যেহেতু ধ্রুবতারা পৃথিবী হইতে বহুদূরে রহিয়াছে, সেইজন্য **গ** হইতে ধ্রুবতারাকে উধ্ব সরলরেখার সমান্তরাল **গধ'** রেখায় দেখা যাইবে। **গ** স্থানের অক্ষাংশ=**নকগ** কোণ। **গ** স্থানের ধ্রুবতারার উন্নতি=**ধ'গথ** কোণ। **তথ** গ বিন্দুতে পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছে, অর্থাৎ **তগথ গ** স্থানের দিগন্তরেখা। তাই **ঘগথ** কোণ একটি সমকোণ। যেহেতু **গধ'** এবং **কধ** সমান্তরাল, সেইজন্য ∠**ঘগধ'**=∠**গকধ**। আবার ∠**ঘগথ**=১ সমকোণ=∠**নকধ**। সুতরাং ∠**ঘগথ**−∠**ঘগধ'**=∠**নকধ**−∠**গকধ** [∵ ∠**ঘগধ'**=∠**গকধ**]। সুতরাং ∠**ধ'গথ**=∠**নকগ**। কিন্তু ∠**নকগ** হইল

গ স্থানের অক্ষাংশ। সুতরাং গ স্থানে ধ্রুবতারার উন্নতি=গ স্থানের অক্ষাংশ। সুতরাং **কোন স্থানের ধ্রুবতারার উন্নতি=ঐ স্থানের অক্ষাংশ।**

উত্তর গোলার্ধের কোন স্থানে ধ্রুবতারার উন্নতি বাহির করিতে পারিলেই ঐ স্থানের অক্ষাংশ পাওয়া যাইবে।

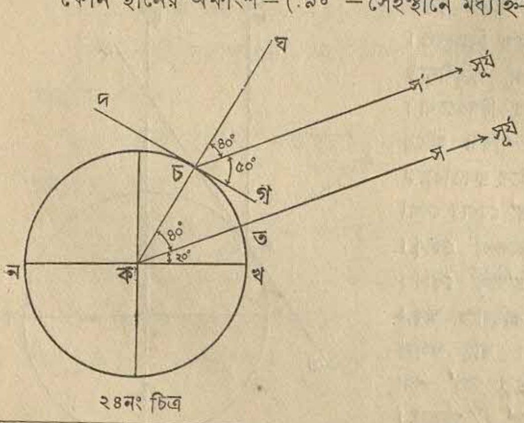
ধ্রুবতারার উন্নতি নির্ণয়—দিগন্তরেখা হইতে কোন নক্ষত্রকে আকাশে যত উপরে দেখা যায় তাহার কৌণিক পরিমাপকে ঐ নক্ষত্রের উন্নতি বলে।

থিওডোলাইট, সেক্সট্যান্ট প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে নির্ভুল ও সূক্ষ্মভাবে ধ্রুবতারার উন্নতি বাহির করা যায়।

ধ্রুবতারার উন্নতির সাহায্যে কেবলমাত্র উত্তর গোলার্ধেই অক্ষাংশ নির্ণয় করা সম্ভব। দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণমেরু-নির্দেশক অন্য নক্ষত্র আছে। উহার সাহায্যেও দক্ষিণ গোলার্ধের যে কোনও স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়।

(খ) **মধ্যাহ্ন-সূর্যের উন্নতির সাহায্যে**—মধ্যাহ্ন-সূর্যের উন্নতির সাহায্যেও কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে সহজেই কোন স্থানের অক্ষাংশ বাহির করা যায়।

কোন স্থানের অক্ষাংশ = (৯০° – সেইস্থানে মধ্যাহ্ন-সূর্যের উন্নতি) ± বিষুব লম্ব*



২৪নং চিত্র

সূর্যের যখন উত্তরায়ণ তখন উত্তর গোলার্ধের কোন স্থানের অক্ষাংশ কিভাবে নির্ণয় করা যায় তাহার একটি জ্যামিতিক উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

উদাহরণ—মনে কর নিম্নের চিত্রে চ উত্তর গোলার্ধের কোন স্থান। চ-স্থানের অক্ষাংশ বাহির করিতে হইবে। ক

* কোন দিন মধ্যাহ্ন-সূর্য যে স্থানে ঠিক মাথার উপর থাকে সেই স্থানের অক্ষাংশই সেই দিনের বিষুব লম্ব (declination of the Sun)। নৌ-সারণীতে (Nautical Almanac) প্রতিদিনের বিষুব লম্বের পরিমাপ লেখা থাকে।

পৃথিবীর কেন্দ্র, নখ নিরক্ষবৃত্ত। দ চ-স্থানের দিগন্তরেখা। যেদিন চ-স্থানের অক্ষাংশ বাহির করা হইতেছে সেইদিন ত-স্থানের দ্বিপ্রহরে সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে এবং **কতস** রেখায় দেখা যায়। সুতরাং **তকখ** ঐ দিনের বিষুব লম্ব। **চ** হইতে ঐ দিন সূর্যকে **কস** রেখার সমান্তরাল **চস'** রেখায় দেখা যায়। চিত্র হইতে সহজেই বুঝা যায় যে ∠**চকখ** চ-স্থানের অক্ষাংশ। **গচস'** কোণ সেইদিন চ-স্থানে মধ্যাহ্ন-সূর্যের উন্নতি। চ-স্থানের অক্ষাংশ=∠**চকত**+∠**তকখ** =∠**চকত**+বিষুব লম্ব। আবার যেহেতু **কস** ও **চস'** সমান্তরাল, যেহেতু ∠**চকত**=**ঘচস'** =৯০°−∠**স'চস**। ∴ ∠**চকত**=৯০°−মধ্যাহ্ন-সূর্যের উন্নতি। সুতরাং চ-স্থানের অক্ষাংশ =৯০°−মধ্যাহ্ন-সূর্যের উন্নতি+বিষুব লম্ব। চিত্র হইতে চ-স্থানের অক্ষাংশ=৯০°−৫০°+ ২০°=৬০°।

সূর্যের দক্ষিণায়নের সময় যদি উত্তর গোলার্ধের কোন স্থানের অক্ষাংশ বাহির করিতে হয় তবে তোমরা অনুরূপ ভাবে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন করিলে দেখিতে পাইবে যে তখন ৯০° ও মধ্যাহ্ন-সূর্যের উন্নতির অন্তর-ফল হইতে বিষুব-লম্ব বিয়োগ করিতে হইতেছে।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ৯০° হইতে মধ্যাহ্ন-সূর্যের উন্নতি বিয়োগ করিয়া এই বিয়োগ-ফল ও বিষুব-লম্বের অন্তর বাহির করিলেই অক্ষাংশ পাওয়া যায়।

তাই কোন্ কোন্ অবস্থায় বিষুব-লম্ব যোগ, বিয়োগ অথবা উহার অন্তর করিয়া অক্ষাংশ বাহির করিতে হয় তাহা নিম্নে বলা হইল।

(১) সূর্য যখন যে গোলার্ধে অবস্থান করে তখন সেই গোলার্ধের কোন স্থানের অক্ষাংশ বাহির করিতে হইলে বিষুব-লম্ব যোগ করিতে হয়।

(২) সূর্য যে গোলার্ধে অবস্থান করে তাহার বিপরীত গোলার্ধের কোন স্থানের অক্ষাংশ বাহির করিতে হইলে বিষুব-লম্ব বিয়োগ করিতে হয়।

(৩) সূর্য যে স্থানের মাথার উপরে আছে সেই স্থান অক্ষাংশ নির্ণয়ের স্থান অপেক্ষা উত্তরে (উত্তর গোলার্ধে) বা দক্ষিণে (দক্ষিণ গোলার্ধে) থাকিলে (৯০°−মধ্যাহ্ন-সূর্যের উন্নতি) ও বিষুবলম্বের অন্তরই নির্ণেয় অক্ষাংশ হইবে।

তাই অক্ষাংশ নির্ণয়ের সূত্রকে আমরা এইরূপ লিখিতে পারি—

নির্ণেয় অক্ষাংশ=(৯০°−মধ্যাহ্ন-সূর্যের উন্নতি) ± বা ~ বিষুবলম্ব।

সেক্সট্যান্ট প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই মধ্যাহ্ন-সূর্যের উন্নতি বাহির করা যায়।

দ্রাঘিমা নির্ণয়

পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার নিজ মেরুরেখার উপর আবর্তন করে, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী ৩৬০° আবর্তন করে। অতএব পৃথিবী ১ ঘণ্টায় ১৫° (৩৬০°÷২৪) এবং ৪ মিনিটে ১° পরিমাণ স্থান ঘোরে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে

পূর্ব দিকে ঘুরিতেছে। কাজেই পূর্ব দিকের স্থানগুলিতে আগে এবং পশ্চিম দিকের স্থানগুলিতে পরে সূর্যোদয় হয়। সুতরাং যখন কলিকাতায় সূর্যোদয় হয় তাহার ৪ মিনিট পরে ১° পশ্চিমের স্থানে সূর্যোদয় হয়। সূর্য যখন কোন স্থানের মধ্যরেখায় আসে তখন সেখানের ঘড়িতে বেলা ১২টা ধরিয়া যে সময় পাওয়া যায় উহাই সেই স্থানের স্থানীয় সময়। তাই প্রতি ১° ডিগ্রী দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট।

গ্রীনিচের দ্রাঘিমা ০°। কোন স্থানের সময় গ্রীনিচের সময় অপেক্ষা বেশী হইলে উহা গ্রীনিচের পূর্ব দিকে অর্থাৎ পূর্ব দ্রাঘিমায় এবং কম হইলে স্থানটি গ্রীনিচের পশ্চিমে অর্থাৎ পশ্চিম দ্রাঘিমায় অবস্থিত বুঝিতে হইবে। তারপর উপরোক্তভাবে সময়ের পার্থক্য হইতে দ্রাঘিমার পার্থক্য বাহির করা যায়। ক্রনোমিটার (Chronometer) নামে একপ্রকার ঘড়ি আছে; উহা সব সময়ে গ্রীনিচের সময় নির্দেশ করে। ক্রনোমিটারের দ্বারা সহজেই কোন স্থানের সময়ের সহিত গ্রীনিচের সময়ের পার্থক্য এবং সেই স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায়।

দ্রাঘিমা ও সময়-সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

১। দুইটি স্থানের দ্রাঘিমান্তর ২৫° হইলে সময়ের পার্থক্য কত?

প্রতি ডিগ্রীতে সময়ের পার্থক্য ৪ মিঃ, সুতরাং ২৫°তে সময়ের পার্থক্য ২৫ × ৪ মিঃ = ১০০ মিঃ, অর্থাৎ ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

২। দুইটি স্থানের সময়ের পার্থক্য ৩ ঘণ্টা ১২ মিনিট হইলে উহাদের দ্রাঘিমার দূরত্ব কত?

সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট হইলে দ্রাঘিমার পার্থক্য ১° হয়। সুতরাং সময়ের পার্থক্য ৩ ঘণ্টা ১২ মিনিট অর্থাৎ ১৯২ মিনিট হইলে দ্রাঘিমার পার্থক্য $\frac{১ \times ১৯২}{৪}$ ডিগ্রী অর্থাৎ ৪৮° ডিগ্রী হইবে।

দুইটি স্থানের দ্রাঘিমা হইতে উহাদের দ্রাঘিমান্তর নিম্নোক্তরূপে বাহির করিতে পারা যায়।

দুইটি স্থানই যদি গ্রীনিচের পূর্বে অথবা দুইটিই যদি পশ্চিমে হয় তবে উহাদের দ্রাঘিমার বিয়োগফল, এবং একটি পূর্বে এবং অপরটি

পশ্চিমে হইলে তাহাদের দ্রাঘিমার যোগফল যত ডিগ্রী হইবে তাহাই ঐ দুই স্থানের দ্রাঘিমান্তর হইবে।

(ক) দ্রাঘিমার পার্থক্য হইতে সময় নির্ণয়

৩। কলিকাতা ও মাদ্রাজের দ্রাঘিমাংশ যথাক্রমে ৮৮° ২৪′ পূঃ ও ৮০° ১৫′ পূঃ। যখন কলিকাতার সময় বেলা ১২টা তখন মাদ্রাজের সময় কত?

(কঃ বিঃ ১৯১০)

স্থান দুইটির দ্রাঘিমার ব্যবধান (=৮৮° ২৪′−৮০° ১৫′)=৮° ৯′ মিঃ; ১° দ্রাঘিমান্তরের জন্য সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট হয়, সুতরাং ৮° দ্রাঘিমান্তরের জন্য সময়ের পার্থক্য=৮×৪=৩২ মিঃ হইবে। আবার ১ মিঃ দ্রাঘিমান্তরের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ সেকেণ্ড। ∴ ৯ মিঃ দ্রাঘিমান্তরের জন্য সময়ের পার্থক্য =৪×৯ সেকেণ্ড=৩৬ সেকেণ্ড হইবে। অতএব মোট সময়ের পার্থক্য ৩২ মিঃ ৩৬ সেঃ। মাদ্রাজ কলিকাতার পশ্চিমে তাই সেখানকার সময় কম হইবে। ∴ কলিকাতায় যখন বেলা ১২টা, তখন মাদ্রাজের সময় ১২টা−৩৬ মিঃ ৩৬ সেঃ =১১টা ২৭ মিঃ ২৪ সেঃ পূর্বাহ্ণ অর্থাৎ 11 hrs. 27 min. 24 sec. A. M. *

৪। দুইটি স্থানের দ্রাঘিমাংশ যথাক্রমে ৩০° পঃ এবং ৫০° পূঃ। উহাদের স্থানীয় সময়ের পার্থক্য কত?

স্থান দুইটির একটি গ্রীনিচের পূর্বে এবং অপরটি পশ্চিমে অবস্থিত। অতএব দ্রাঘিমার ব্যবধান ৩০°+৫০°=৮০°; ১° ডিগ্রীতে সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট; অতএব ৮০°তে সময়ের পার্থক্য ৮০ × ৪ মিঃ=৩২০ মিঃ=৫ ঘণ্টা ২০ মিঃ।

(খ) সময়ের পার্থক্য হইতে দ্রাঘিমা নির্ণয়

৫। গ্রীনিচে যখন মধ্যরাত্রি তখন কোনও স্থানে সকাল ৮টা। ঐ স্থানের দ্রাঘিমা কত?

(কঃ বিঃ ১৯১২)

* রাত্রি ১২টার পর হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত বুঝাইতে A. M. (Ante-Meridian) এবং বেলা ১২টার পর হইতে রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত বুঝাইতে P. M. (Post-Meridian) ব্যবহৃত হয়।

উভয় স্থানের সময়ের পার্থক্য ৮ ঘণ্টা, সুতরাং দ্রাঘিমার ব্যবধান = ৮ × ১৫° = ১২০°। স্থানটির সময় গ্রীনিচের অগ্রগামী, অতএব উহা গ্রীনিচের পূর্বে অবস্থিত। অতএব স্থানটির দ্রাঘিমা ১২০° পূঃ।

৬। গ্রীনিচে যখন বেলা ১২টা, প্যারিসে তখন অপরাহ্ণ ১২টা ৯ মিঃ ২০ সেঃ। প্যারিসের দ্রাঘিমা কত ?

দুই স্থানের সময়ের পার্থক্য ১২টা ৯ মিঃ ২০ সেঃ − ১২টা = ৯ মিঃ ২০ সেঃ = ৯$\frac{১}{৩}$ মিঃ = $\frac{২৮}{৩}$ মিঃ। প্রতি ৪ মিনিটে ১° ডিগ্রী হিসাবে দ্রাঘিমার পার্থক্য = $\frac{২৮}{৩ \times ৪}$ ডিগ্রী = ২$\frac{১}{৩}$° = ২° ২০′। প্যারিসের সময় অগ্রবর্তী, অতএব প্যারিসের দ্রাঘিমা ২°২০′ পূঃ।

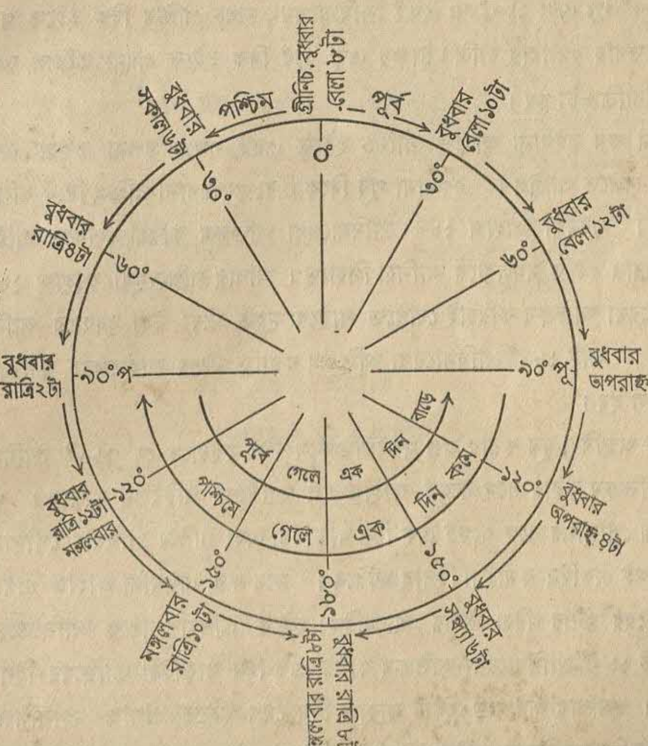
(গ) বিবিধ

৭। গ্রীনিচ হইতে অপরাহ্ণ ১টার সময় মাদ্রাজে (৮০° পূঃ) একটি টেলিগ্রাম করা হয়। যদি এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে টেলিগ্রামের ১৫ মিঃ সময় লাগে তবে কোন্ সময়ে উহা মাদ্রাজে পৌঁছিবে ?

গ্রীনিচ ও মাদ্রাজের দ্রাঘিমার পার্থক্য ৮০° − ০° = ৮০°। অতএব সময়ের পার্থক্য ৮০ × ৪ মিঃ = ৫ ঘণ্টা ২০ মিঃ। মাদ্রাজ গ্রীনিচের পূর্বে। অতএব মাদ্রাজের সময় গ্রীনিচের সময়ের অগ্রবর্তী। সুতরাং গ্রীনিচে যখন ১টা, মাদ্রাজের সময় তখন ১টা + ৫ ঘণ্টা ২০ মিঃ = বিকাল ৬টা ২০ মিঃ। টেলিগ্রাম আসিতে ১৫ মিঃ সময় লাগে। অতএব টেলিগ্রাম যখন মাদ্রাজে পৌঁছিবে তখন মাদ্রাজের সময় ৬টা ২০ মিঃ + ১৫ মিঃ = ৬টা ৩৫ মিঃ।

৮। ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ডের এম্. সি. সি. দল অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলিতে গিয়াছিল। প্রথম খেলা সিড্নী শহরে (১৫১° ১২′ পূঃ) ৪ঠা ডিসেম্বর আরম্ভ হয়। খেলা শেষ হইল বিকাল ৬টায়; কিন্তু সেইদিনই বেলা ২টার সময় কলিকাতার (৮৮° ৩০′ পূঃ) বিভিন্ন সংবাদপত্র আফিসে খেলার শেষ অবধি সমস্ত সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। খেলা শেষ হইল বিকাল ৬টায় অথচ খেলা শেষের সংবাদ বেলা ২টায় পাওয়া গেল। ব্যাপারটা কিরূপে ঘটিল ?

সিড্‌নী ও কলিকাতার দ্রাঘিমার ব্যবধান ১৫১° ১২′ − ৮৮° ৩০′ = ৬২° ৪২′। সুতরাং উভয় স্থানের সময়ের পার্থক্য ৬২ × ৪ মিঃ + ৪২ × ৪ সেঃ = ৪ ঘঃ ৮ মিঃ + ২ মিঃ ৪৮ সেঃ = ৪ ঘঃ ১০ মিঃ ৪৮ সেঃ। কলিকাতা সিড্‌নীর পশ্চিমে বলিয়া কলিকাতার সময় সিড্‌নীর সময়ের পশ্চাদ্বর্তী হইবে। সুতরাং সিড্‌নীতে যখন অপরাহ্ণ ৬টা, কলিকাতায় তখন ৬টা − ৪ ঘঃ ১০ মিঃ ৪৮ সেঃ; অর্থাৎ ১টা ৪৯ মিঃ ১২ সেঃ। সুতরাং সংবাদপত্র আফিসে অপরাহ্ণ ২টার সময় সংবাদ পাওয়া অসম্ভব নয়।



২৫নং চিত্র

আন্তর্জাতিক তারিখরেখা—পূর্ব দ্রাঘিমার সময় গ্রীনিচের সময়ের

অগ্রবর্তী এবং পশ্চিম দ্রাঘিমার সময় গ্রীনিচের সময়ের পশ্চাদ্বর্তী। প্রতি ১৫°তে ১ ঘণ্টা করিয়া সময়ের পার্থক্য হয়। সুতরাং গ্রীনিচে যখন বুধবার বেলা ৮টা, ৩০° পূর্ব দ্রাঘিমায় তখন বেলা ১০টা, এবং ৬০° পূর্ব দ্রাঘিমায় বুধবার মধ্যাহ্ন। এই হিসাবে দেখা যাইবে ১৮০° পূঃ দ্রাঘিমায় তখন বুধবার রাত্রি ৮টা। আবার ৩০° পশ্চিম দ্রাঘিমায় তখন সকাল ৬টা এবং ৬০° পঃ দ্রাঘিমায় তখন বুধবার ভোর ৪টা। এই হিসাবে ১৮০° পঃ দ্রাঘিমায় তখন দেখা যাইবে মঙ্গলবার রাত্রি ৮টা।

১৮০° পূঃ এবং ১৮০° পঃ একই দ্রাঘিমারেখা, অথচ পশ্চিম দিক হইতে গণনা করিলে তথায় মঙ্গলবার রাত্রি ৮টা হয় এবং পূর্ব দিক হইতে গণনা করিলে তথায় বুধবার রাত্রি ৮টা হয়।

মনে কর দুইখানা জাহাজ গ্রীনিচ হইতে একই সময়ে রওনা হইয়া একই গতিতে চলিতে লাগিল। একখানা পূর্ব দিকে এবং অপরখানা পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিল। পূর্বমুখী জাহাজ ১৮০° দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাইবে উহা বুধবার হইতে মঙ্গলবারে আসিয়া গিয়াছে। আবার পশ্চিমমুখী জাহাজ ১৮০° দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করিয়াই দেখিতে পাইবে মুহূর্ত মধ্যে উহা বুধবারে আসিয়া গিয়াছে। তাই ১৮০° দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করাতে উভয় জাহাজেরই তারিখের গোলমাল হয়।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে ১৮০° দ্রাঘিমা-রেখা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজগুলি তারিখের পরিবর্তন করিবে। পূর্ব দ্রাঘিমায় পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই এক দিন বাড়াইয়া এবং পশ্চিম দ্রাঘিমায় পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই একদিন কমাইয়া হিসাব করিবে। মনে কর, একখানা জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া উত্তর আমেরিকা হইতে এশিয়ার দিকে আসিতেছে। জাহাজটি ১৮০° দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করিয়া এক দিন বাড়াইয়া তারিখের হিসাব করিবে। আবার যদি অন্য একটি জাহাজ চীন দেশ হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের দিকে যাইতে থাকে তবে উহা ১৮০° দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে একদিন কমাইয়া তারিখের হিসাব করিবে।

১৮০° দ্রাঘিমারেখার কতক অংশ এশিয়ার উত্তর-পূর্বে এবং দক্ষিণে স্থলভাগের উপর দিয়া গিয়াছে। স্থলভাগে একটি ১৮০° দ্রাঘিমারেখার দুই পাশে যদি দুইটি তারিখ হয় তবে অসুবিধার অবধি থাকে না। এইজন্য তারিখ পরিবর্তনের রেখার সহিত ১৮০° দ্রাঘিমারেখার সর্বত্র মিল নাই। উহা কোথাও পূর্ব দিকে কোথাও পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। উহা সর্বত্রই সমুদ্রের উপর দিয়া গিয়াছে। যে কাল্পনিক রেখা অতিক্রম করার সময় তারিখ পরিবর্তনের বিধি আছে উহাকে **আন্তর্জাতিক তারিখরেখা** (International Date Line) বলে।



আন্তর্জাতিক তারিখরেখা
২৬নং চিত্র

তৃতীয় অধ্যায়

ভূ-ত্বক ও শিলা

ভূ-ত্বক (Crust of the Earth)

আদিম অবস্থায় পৃথিবী ছিল একটি অতি উষ্ণ বাষ্পপিণ্ড। ক্রমশঃ উহা শীতল হইতে থাকে ; ফলে গ্যাসীয় পদার্থগুলি ঠাণ্ডা হইয়া তরল হয়। তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবী যখন আরও শীতল হইল তখন ঐ তরল পদার্থের কতক অংশ কঠিন হইয়া পৃথিবীর উপরিভাগে একটি শক্ত আবরণের সৃষ্টি করিল। ইহাই ভূ-ত্বক। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এখনও উষ্ণ অবস্থায় আছে। দুধের উপরে সর জমিলে উহার উপরিভাগ যেরূপ অসমান হয় ভূ-ত্বকের উপরিভাগও সেইরূপ বন্ধুর ও অসমতল। ইহাকে **অশ্মমণ্ডল** (Lithosphere) নামে অভিহিত করা হয়। ইহার গভীরতা প্রায় ৫০ মাইল মাত্র।

পৃথিবীর গুরুভার পদার্থগুলি ভূ-কেন্দ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে জমিয়া গিয়া **কেন্দ্রমণ্ডলের** (Centrosphere) সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার গভীরতা ২,১০০ মাইলেরও অধিক। এই কেন্দ্রমণ্ডল লৌহ, নিকেল প্রভৃতি গুরুভার পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। উহা এখনও অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। অশ্মমণ্ডলের নীচে **গুরুমণ্ডল** (Barysphere)। ইহার গভীরতা প্রায় ১,৮০০ মাইল। ভারী শিলার দ্বারা ইহা গঠিত। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) অশ্মমণ্ডলের আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহা অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং না-কঠিন না-তরল অবস্থায় আছে। এই মণ্ডলের কোন স্থানের উপরের চাপ কমিয়া গেলে শিলাগুলি তখনই তরল অবস্থায় পরিণত হয়। ভূ-পৃষ্ঠে সঞ্চিত জলরাশির নাম **বারিমণ্ডল** (Hydrophere)। ইহা ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র ব্যাপ্ত নহে, গভীরতাও সর্বত্র সমান নহে। পৃথিবীর গ্যাসীয় আবরণের নাম **বায়ুমণ্ডল** (Atmosphere)। ইহা ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উপরের দিকে প্রায় ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।



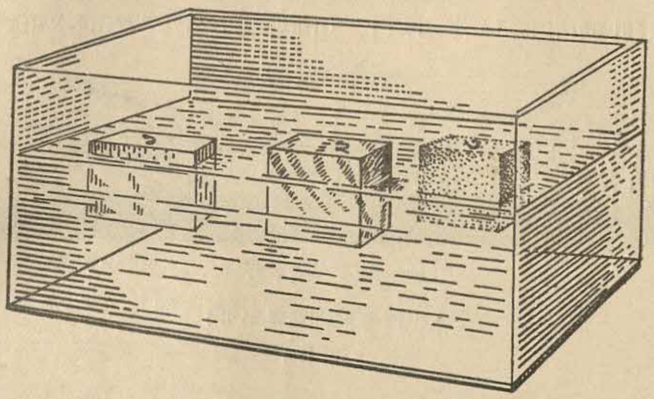
পৃথিবীর গঠন
২৭নং চিত্র

অশ্মমণ্ডল সাধারণতঃ সিলিকা ও অ্যালুমিনিয়ম মিশ্রিত (Sial) লঘু শিলাদ্বারা গঠিত। গুরুমণ্ডল সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়াম মিশ্রিত (Sima) গুরুভার শিলাদ্বারা গঠিত। উপরোক্ত লঘু শিলাস্তর এবং গুরুভার শিলাস্তরের উপরদিকের কিছুটা অংশ লইয়াই প্রকৃতপক্ষে ভূ-ত্বক গঠিত।

ভূ-ত্বক প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর শিলাদ্বারা গঠিত। প্রথমটি লঘু গ্র্যানাইট জাতীয়; উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ২·৭। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ভারী ব্যাসাল্ট জাতীয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ৩·০। ইহাদের নীচে আরও ভারী (আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫·৭) শিলাস্তর আছে। ঐ লঘু শিলাগুলি মহাদেশের এবং ভারী শিলাগুলি সমুদ্রতলের সৃষ্টি করিয়াছে।

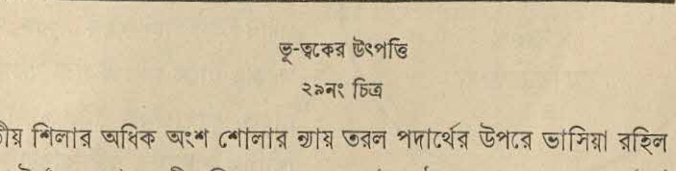
জলের উপরে একই আকার ও আয়তনের বরফ, কাঠ এবং শোলার টুকরা ভাসাইয়া দিলে দেখা যাইবে যে শোলার টুকরাটি সবচেয়ে উঁচু হইয়া আছে। কাঠের টুকরাটি তার চেয়ে নীচু এবং বরফের টুকরাটি সবচেয়ে নীচু হইয়া আছে। ইহার কারণ শোলা সবচেয়ে হালকা এবং বরফ সবচেয়ে ভারী। এই তিনটি

টুকরাকে গায়ে গায়ে লাগাইয়া দিলে দেখা যাইবে যে শোলা উচ্চস্থানের এবং বরফ নিম্নস্থানের সৃষ্টি করিয়াছে।



জলের উপরে বরফ, কাঠ ও শোলা ভাসিতেছে
১ বরফ, ২ কাঠ, ৩ শোলা
২৮নং চিত্র

পৃথিবী যখন আদি অবস্থায় শীতল হইতেছিল তখন কোন কোন পদার্থ কঠিন হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ভারী পদার্থগুলি ভূ-কেন্দ্রের দিকে নামিয়া যায়। লঘু পদার্থগুলি তরল পৃথিবীর উপরিভাগে ভাসিয়া রহিল। গ্র্যানাইট (Granite)



ভূ-ত্বকের উৎপত্তি
২৯নং চিত্র

জাতীয় শিলার অধিক অংশ শোলার ন্যায় তরল পদার্থের উপরে ভাসিয়া রহিল আর ব্যাসাল্ট (Basalt) জাতীয় শিলার অল্প অংশ (কাঠের মত) তরল পদার্থের উপরে রহিল। এই শিলাগুলি ক্রমশঃ গায়ে গায়ে লাগিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে একটি কঠিন আবরণের সৃষ্টি করিল। গ্র্যানাইট উচ্চস্থান ও ব্যাসাল্ট নিম্নস্থানের সৃষ্টি

করিল। তারপর পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ গ্যাসগুলি শীতল হইয়া বৃষ্টির আকারে ভূ-পৃষ্ঠে নামিয়া আসিতে লাগিল। এই জল উচ্চস্থান বাহিয়া আসিয়া নিম্নস্থানে জমা হইয়া মহাসাগরের সৃষ্টি করিল। ব্যাসাল্ট স্তরের সবটুকু জলের তলায় চলিয়া

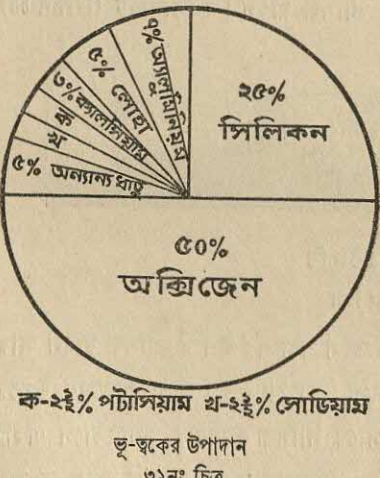


মহাদেশ ও মহাসাগরের উৎপত্তি

৩০নং চিত্র

গেল। গ্র্যানাইট স্তরেরও কিছুটা জলের তলায় গেল। আর অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থান স্থলভাগের সৃষ্টি করিয়াছে। ভূ-ত্বকের এই স্থলভাগ ক্রমাগত ক্ষয়িত হইয়া ও নানা প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া কোথাও পর্বত, কোথাও মালভূমি, কোথাও বা সমতলভূমির সৃষ্টি করিয়াছে।

ভূ-ত্বক বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। ইহার অর্ধেক অক্সিজেন, এক-চতুর্থাংশ সিলিকন (Silicon—সিলিকন ও অক্সিজেন মিলিয়া বালির সৃষ্টি করিয়াছে) এবং অবশিষ্ট অ্যালুমিনিয়ম, লোহা, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থ। ইহারা পৃথক পৃথক ভাবে ভূ-ত্বকে থাকে না। ইহারা পরস্পরের সহিত রাসায়নিক মিশ্রণে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করিয়া নানা-প্রকার শিলার রূপ নিয়া ভূ-ত্বকের সৃষ্টি করিয়াছে।



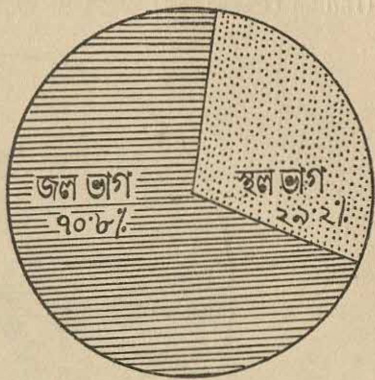
ক-২½% পটাসিয়াম খ-২½% সোডিয়াম

ভূ-ত্বকের উপাদান

৩১নং চিত্র

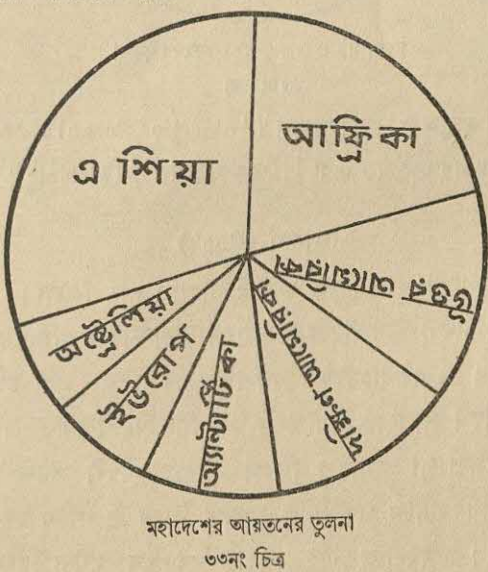
জল ও স্থল

ভূ-পৃষ্ঠের শতকরা ৭০·৮ ভাগ জল ও অবশিষ্ট ২৯·২ ভাগ স্থল। স্থলভাগ সাতটি প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশ **মহাদেশ** (Continent) নামে অভিহিত হয়। সাতটি মহাদেশের নাম যথাক্রমে—(১) **এশিয়া**, (২) **ইউরোপ**, (৩) **আফ্রিকা**, (৪) **উত্তর আমেরিকা**, (৫) **দক্ষিণ আমেরিকা**, (৬) **ওশিয়ানিয়া** এবং (৭) **কুমেরু দেশ** বা **আন্টার্কটিকা**। ইহাদের মধ্যে এশিয়া সবচেয়ে বড় এবং ওশিয়ানিয়া (অষ্ট্রেলিয়া ও নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ) সবচেয়ে ছোট।



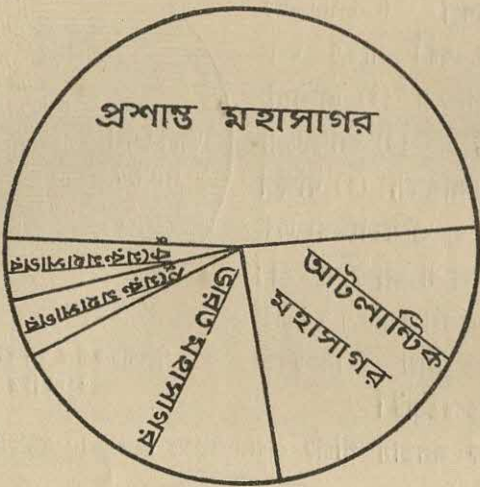
পৃথিবীর জল ও স্থল ভাগের তুলনা
৩২নং চিত্র

অপর পক্ষে জলভাগ পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশই এক



মহাদেশের আয়তনের তুলনা
৩৩নং চিত্র

একটি **মহাসাগর** (Ocean) ; যথা—(১) **প্রশান্ত মহাসাগর** (Pacific Ocean), (২) **আটলান্টিক মহাসাগর** (Atlantic Ocean), (৩) **ভারত মহাসাগর** (Indian Ocean), (৪) **উত্তর** বা **সুমেরু মহাসাগর** (Arctic Ocean) এবং



মহাসাগর ও তাহাদের আয়তনের তুলনা
৩৪নং চিত্র

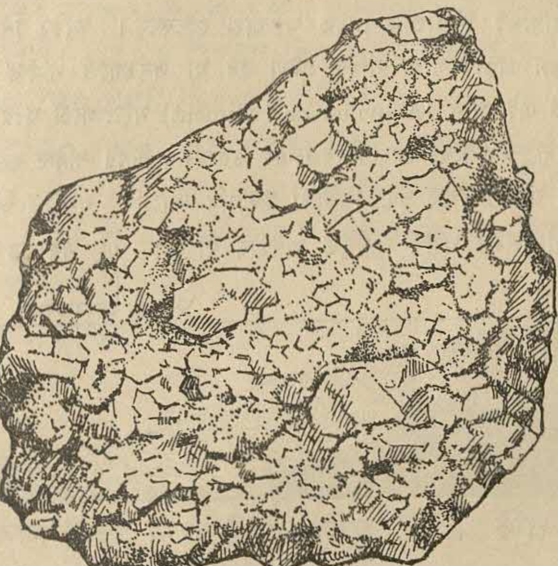
(৫) **দক্ষিণ** বা **কুমেরু মহাসাগর** (Antarctic Ocean)। ইহাদের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর সবচেয়ে বড় এবং দক্ষিণ মহাসাগর সবচেয়ে ছোট।

শিলা (Rock)

ভূ-ত্বক যে উপাদান দ্বারা গঠিত তাহার সাধারণ নাম **শিলা**। শিলা বলিতে নরম ও কঠিন সকল উপাদানকেই বুঝায়। তা'ছাড়া নুড়ি, বালি, কাঁকর প্রভৃতি শিলাখণ্ড ও শিলাচূর্ণকেও সাধারণভাবে শিলা বলা যাইতে পারে। শিলা প্রধানতঃ তিন প্রকারের—প্রাথমিক, পাললিক ও পরিবর্তিত শিলা।

(১) **প্রাথমিক বা আগ্নেয় শিলা**—উত্তপ্ত পৃথিবী শীতল হওয়ার সময় উত্তপ্ত এবং তরল আদিম পদার্থগুলি ক্রমশঃ শীতল ও কঠিন হইয়া এই শিলা গঠন করিয়াছে। পৃথিবীতে এই শিলাই সর্বপ্রথম গঠিত হইয়াছে বলিয়া

ইহাকে **প্রাথমিক শিলা** (Primary Rock) বলা হয়। উত্তপ্ত তরল ধাতব পদার্থ হইতে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ইহাকে **আগ্নেয় শিলাও** (Igneous Rock) বলে। এই জাতীয় শিলাতে কোন স্তর নাই বলিয়া ইহাকে **অস্তরীভূত শিলাও** (Unstratified Rock) বলা যাইতে পারে। ভূগর্ভস্থ উত্তপ্ত তরল শিলা-পদার্থ কখনও কখনও আগ্নেয়গিরির ফাটল দিয়া বা ভূ-ত্বকের কোন দুর্বল অংশের ফাটল দিয়া উপরে উঠিয়া আসে এবং কঠিন হইয়া আগ্নেয় শিলার



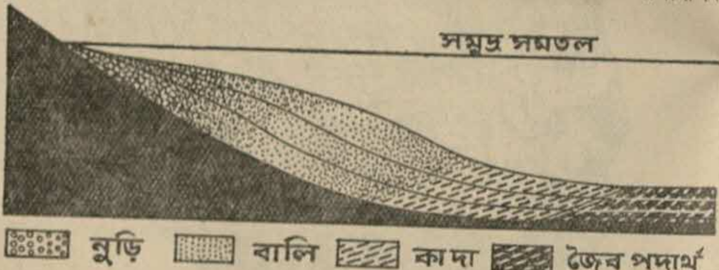
আগ্নেয় শিলা (গ্র্যানাইট)
৩৫নং চিত্র

সৃষ্টি করে। যে সকল তরল পদার্থ ভূ-পৃষ্ঠের উপরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে উহারা অতি দ্রুত শীতল হইতে থাকে। তাই উহারা দানা বাঁধিবার সময় পায় না। এই সকল আগ্নেয় শিলায় (যেমন, ব্যাসাল্ট) দানা (Crystal) থাকে না এবং শিলা-কণিকাগুলি খুব সূক্ষ্ম হয়।

যে সকল শিলা-পদার্থ ভূ-পৃষ্ঠের উপরে না আসিয়া নীচেই সঞ্চিত হয় উহারা খুব ধীরে ধীরে শীতল হয়। এই সকল শিলা (যেমন, গ্র্যানাইট) দানা (crystal)

বাঁধিতে পারে এবং ইহাদের শিলা-কণিকাগুলিও পূর্বোক্ত শিলার তুলনায় মোটা হয়। যে সকল আগ্নেয় শিলা কঠিন হওয়ার সময় দানা বাঁধিয়া থাকে তাহাদিগকে **কেলাসিত শিলা**ও (Crystalline Rock) বলা হয়। ব্যাসাল্ট (Basalt), গ্র্যানাইট (Granite), ডলেরাইট (Dolerite), পেগ্‌মেটাইট (Pegmatite) প্রভৃতি আগ্নেয় শিলা।

(২) **পাললিক শিলা**—রৌদ্র, বৃষ্টি, বাতাস, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়ায় প্রাথমিক শিলাগুলি নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। ক্ষয়িত শিলাকণাগুলি বাতাস, নদী প্রভৃতি দ্বারা বাহিত হইয়া হ্রদ বা সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হইতেছে। নদী-বাহিত এই পলি (Alluvium or sediment) সমুদ্র-গর্ভে স্তরে স্তরে জমা হয়। সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষও এই স্তরগুলির উপর সঞ্চিত হইতে থাকে। এই সকল জীবের দেহে চূণ, সিলিকা ইত্যাদি আছে। সমুদ্রের জলেও নানা জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই সকলের রাসায়নিক



পাললিক শিলা
৩৬নং চিত্র

ক্রিয়ায়, উপরিস্থ জলরাশি ও পলিস্তরের চাপে এবং ভূ-গর্ভস্থ উত্তাপের ফলে নিম্নের স্তরগুলি ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া কঠিন শিলার সৃষ্টি করে। পলল হইতে সৃষ্ট বলিয়া এই জাতীয় শিলাকে **পাললিক শিলা** (Sedimentary Rock) বলে। ভূ-আলোড়নের ফলে এই শিলাস্তর সমুদ্রের উপরে উঠিয়া আসে। অনেক সময় উচ্চ ভূমির ও পর্বতমালার (যেমন হিমালয়, আল্পস্ প্রভৃতি) সৃষ্টি করে। স্তরে স্তরে গঠিত বলিয়া এই শিলাকে **স্তরীভূত শিলা**ও (Stratified Rock) বলে।

এই সকল শিলার স্তরগুলি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। পাললিক শিলাস্তরে নানা-প্রকার জলজ প্রাণীর কঙ্কাল প্রস্তরীভূত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ প্রস্তরীভূত জীবদেহকে **জীবাশ্ম** (Fossil) বলে। বেলে পাথর (Sand-stone), চূণা পাথর (Lime-stone), কাদা পাথর (Shale or Mud-stone), খড়িমাটি (Chalk) প্রভৃতি প্রধান পাললিক শিলা। প্রাণিদেহ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ অনেক সময় ভূ-প্রোথিত হইয়া তাপ ও চাপের ফলে কঠিন শিলায় পরিণত হয়। এক প্রকার চূণা পাথর (সমুদ্রের শামুক, শঙ্খ প্রভৃতির দেহাবশেষ হইতে সৃষ্ট) এবং কয়লা এই শ্রেণীর শিলা। ইহারাও পাললিক শিলা; তবে জীবদেহ হইতে সৃষ্ট বলিয়া ইহাদিগকে **জৈব শিলা** (Organic Rock) বলা হয়।

উত্তর চীনে হাজার হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত **লোয়েস্‌** (Loess) নামক এক প্রকার পাললিক শিলা আছে। উহা সমুদ্রগর্ভে সৃষ্ট হয় নাই। মধ্য এশিয়ার মরুভূমির বায়ু-তাড়িত ধূলি ও বালুকণা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া স্তরে স্তরে জমিয়া লোয়েসের সৃষ্টি করিয়াছে।

(৩) **পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত শিলা**—অত্যধিক চাপ, তাপ এবং ভূ-আন্দোলনের ফলে প্রাথমিক ও পাললিক শিলা পরিবর্তিত হইয়া ভিন্ন প্রকৃতির শিলায় পরিণত হয়। এই রকম শিলাকে **পরিবর্তিত** বা **রূপান্তরিত শিলা** (Metamorphic Rock) বলে। এই ভাবে নরম বেলে পাথর (Sand-stone) রূপান্তরিত হইয়া কঠিন কোয়ার্জাইট-এ (Quartzite) পরিণত হয়। নিম্নে রূপান্তরিত শিলার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

পাললিক	রূপান্তরিত	প্রাথমিক	রূপান্তরিত
কাদাপাথর (Mud-stone)	শ্লেট (Slate)	গ্র্যানাইট (Granite)	নীস্‌ (Gneiss)
বেলেপাথর (Sand-stone)	কোয়ার্জাইট (Quartzite)		
চূণাপাথর (Lime-stone)	মার্বেল (Marble)		
কয়লা (Coal)	গ্র্যাফাইট (Graphite)		

মৃত্তিকা (Soil)—শিলা হইতেই মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়। উত্তাপ, বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর গলিত দেহ এবং বায়ুস্থিত কার্বন-ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন প্রভৃতির ক্রিয়ায় ক্রমশঃ শিলার উপরিভাগের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। ইহার ফলে কালক্রমে ভূ-ত্বকের উপর এক প্রকার সূক্ষ্ম এবং শিথিল

স্তরের সৃষ্টি হয়। উহাই মৃত্তিকা। এই শিলাস্তর উপর হইতে নীচে অপরিবর্তিত শিলা অবধি বিস্তৃত থাকে।

ভূ-ত্বকের ধীর পরিবর্তন

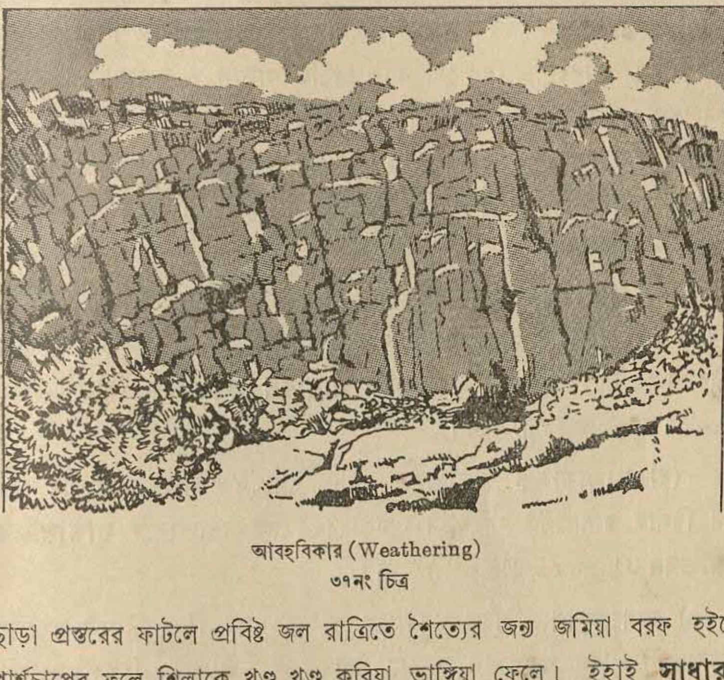
সূর্যতাপ, বায়ু, বৃষ্টি, নদী, সাগর-তরঙ্গ, হিমবাহ, তুষার ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তি অবিরত ভূ-ত্বকের ক্ষয় সাধন করিতেছে। এই ক্ষয় এত ধীরে ধীরে সংঘটিত হয় যে হঠাৎ ইহা চোখে পড়ে না। কয়েক বৎসর ধরিয়া লক্ষ্য করিলে এই ক্ষয় সহজেই বোঝা যায়।

কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূ-ত্বকের উপরিভাগের শিলাগুলি চূর্ণিত হইয়া শিথিল হইয়া পড়ে। এই শিথিল শিলা-কণিকা তখন নীচের শিলাকে ঢাকিয়া রাখে। এই ভাবে আবৃত থাকার ফলে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি নীচের শিলার বিশেষ পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। কিন্তু এই শিলা-কণিকা একই স্থানে থাকে না। কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ইহা স্থানান্তরে নীত হয়; তখন নীচের শিলা উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। আবার প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া চলে; চূর্ণিত বালুকণা আবার অন্যত্র নীত হয়। আবার ভূ-ত্বক উন্মুক্ত হয় এবং আবার ক্ষয়কার্য চলে। ভূ-ত্বকের এই পরিবর্তন বা নগ্ন হওয়াকে **নগ্নীভবন** (Denudation) বলে। এই নগ্নীভবনের কার্য নিম্নলিখিত তিন প্রকারে ঘটিয়া থাকে।

(১) **আবহবিকার** (Weathering)—দিন এবং রাত্রিতে আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য ভূ-ত্বকের যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে **আবহবিকার** বলে। যখন শিলা শুধু খণ্ড-বিখণ্ডিত ও চূর্ণিত হয় অথচ ইহার ফলে শিলার কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না তখন ইহাকে **সাধারণ আবহবিকার** (Mechanical Weathering) বলে। আবার যদি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় অথবা চূর্ণিত শিলার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, তবে তাহাকে **রাসায়নিক আবহবিকার** (Chemical Weathering) বলে।

(ক) **সাধারণ আবহবিকার**—যে সকল অঞ্চলে দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার প্রসর (Diurnal Range of Temperature) অধিক, সেই সকল স্থানে দিবাভাগের প্রচণ্ড উত্তাপে শিলা অত্যধিক প্রসারিত হয়। আবার রাত্রিতে শৈত্যের জন্য শিলা অত্যধিক সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু শিলার সকল উপাদান সমান-

ভাবে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয় না। এইভাবে ক্রমাগত সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে শিলা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় (Block Disintegration) এবং কখনও বা শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বালুকণায় পরিণত হয় (Granular Disintegration)। ইহা



আবহবিকার (Weathering)
৩৭নং চিত্র

ছাড়া প্রস্তরের ফাটলে প্রবিষ্ট জল রাত্রিতে শৈত্যের জন্য জমিয়া বরফ হইলে পার্শ্বচাপের ফলে শিলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহাই **সাধারণ আবহবিকার**।

(খ) **রাসায়নিক আবহবিকার**—বৃষ্টির জল ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হওয়ার সময় বায়ু হইতে কার্বন-ডায়ক্সাইড গ্রহণ করে। এইরূপ বৃষ্টির জলে চূণ সহজেই দ্রব হয়। তাই চূণাপাথর জাতীয় শিলার চূর্ণকে দ্রব করিয়া এই বৃষ্টির জল শিলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অনেক সময় গলাইয়া ফেলে। এইরূপ বৃষ্টির জল অনেক সময় গ্র্যানাইট জাতীয় শিলার কোন এক বিশিষ্ট উপাদানের (Felsper) রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাকে গলাইয়া ফেলে। আর্দ্র বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত শিলার যৌগিক মিশ্রণের ফলেও শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। লোহাতে এইভাবেই

মরিচা ধরে। এইপ্রকার পরিবর্তনের নাম **রাসায়নিক আবহবিকার**। সাধারণ আবহবিকার এবং রাসায়নিক আবহবিকারের কার্য সাধারণতঃ একই সঙ্গে চলিতে থাকে।

(২) **ক্ষয়ীভবন**—বৃষ্টির জল, নদীর স্রোত প্রভৃতির আঘাতে শিলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। পাথরকুচি, শিলাচূর্ণ, বালি প্রভৃতি বাতাস ও জলস্রোতের ধাক্কায় নূতন শিলার গায়ে আঘাত করে এবং উহার ক্ষয়সাধন করে। তা'ছাড়া নদীর জলে অনেক পদার্থ দ্রব অবস্থায় থাকে। তখন নদী রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার ক্ষয়সাধন করে। এইরূপ ক্ষয়কার্যকে **ক্ষয়ীভবন** (Erosion) বলে। ক্ষয়ীভবন দুই প্রকার। যথা—

(ক) **সাধারণ ক্ষয়ীভবন বা ঘর্ষণ**—পাথরকুচি, বালুকণা প্রভৃতির আঘাতে এবং হিমবাহ প্রভৃতির ঘর্ষণে যখন শিলার ক্ষয় হয় অথচ রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না, তখন সেই ক্ষয়ীভবনকে **সাধারণ ক্ষয়ীভবন** (Mechanical Erosion বা Corrasion) বলে।

(খ) **রাসায়নিক ক্ষয়ীভবন**—বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে যখন শিলার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তখন সেই ক্ষয়ীভবনকে **রাসায়নিক ক্ষয়ীভবন** (Chemical Erosion) বলে।

(৩) **অবক্ষেপণ**—বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা শিলা নিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। ক্ষয়িত পদার্থগুলি আবার বায়ুপ্রবাহ, নদীস্রোত, হিমবাহ প্রভৃতি কতকগুলি শক্তির প্রভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া সঞ্চিত হইতেছে। ইহাকে **অবক্ষেপণ** (Deposition) বলে।

প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ভূ-ত্বকের এক স্থান ক্ষয় করিতেছে এবং অন্য স্থানে ক্ষয়িত পদার্থগুলি সঞ্চিত করিয়া নূতন ভূ-ভাগের সৃষ্টি করিতেছে। এই ভাবে নিয়তই ভূ-ত্বকের পরিবর্তন ঘটিতেছে।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির কার্য

সূর্যতাপের কার্য—দিনের বেলায় সূর্যতাপের জন্য উত্তাপে শিলা প্রসারিত হয়, রাত্রিতে সূর্যতাপের বিকিরণের ফলে শিলা সঙ্কুচিত হয়। একই শিলার

বিভিন্ন ধাতব উপাদান অবশ্য সমপরিমাণে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয় না। এইভাবে ক্রমাগত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হওয়ার ফলে শিলা ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হয় অথবা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বালুকণায় পরিণত হয়। যে সকল অঞ্চলে দৈনিক উত্তাপের প্রসর অত্যধিক সেই সকল অঞ্চলে (যেমন উষ্ণ মরু-অঞ্চলে) অতি সহজেই এইভাবে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া থাকে।

বায়ুর কার্য—ক্ষয়ীভবন ও অবক্ষেপণ এই দুই ভাবেই বায়ু ভূ-ত্বকের পরিবর্তন



বায়ুর ক্ষয়কার্য
৩৮নং চিত্র

সাধন করে। বায়ুস্থিত বালুকণার ক্রমাগত ঘর্ষণে শিলার ক্ষয় হয়। ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুতে বালুকণা বেশী থাকে বলিয়া এই বায়ুর ক্ষয়-ক্ষমতা অধিক।

উপরের বায়ুতে বালুকণা কম থাকে, তাই উহার ক্ষয়-শক্তি কম। এইজন্য পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মরু অঞ্চলে (যেখানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে



বায়ুর ক্ষয়কার্য
৩৯নং চিত্র

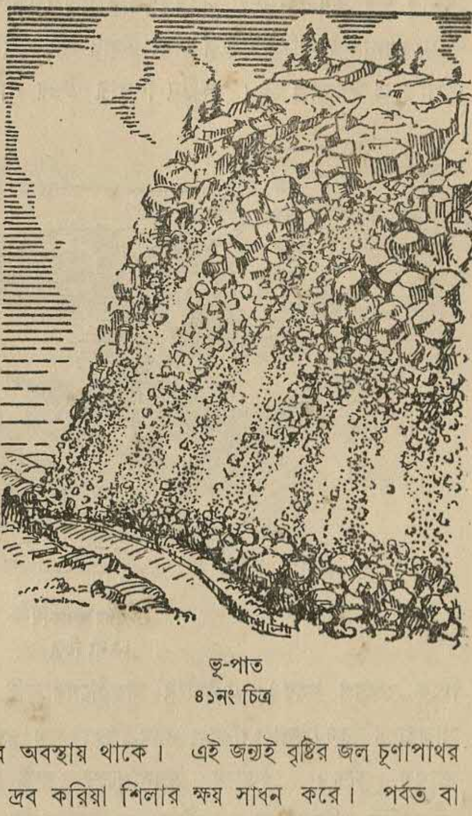
বায়ুই প্রধান) বায়ু দ্বারা ক্ষয়িত হইয়া বিশাল বিশাল শিলাখণ্ড উপরিভাগে মোটা, নিম্নভাগে সরু হইয়া ব্যাঙের ছাতার মত আকার ধারণ করে। আবার



বালিয়াড়ি
৪০নং চিত্র

বায়ু-তাড়িত হইয়া বালুকারাশি মরুভূমি বা সমুদ্রতীরের স্থানে স্থানে বালির স্তূপ বা বালিয়াড়ির (Sand-dunes) সৃষ্টি করে। বায়ু বালুকণাকে বহু দূরেও উড়াইয়া

লইয়া যাইতে পারে। ইহার ফলে অনেক সময় উর্বর সমতলভূমিও বালিয়াড়ির তলে চাপা পড়িয়া যায়। মধ্য এশিয়া হইতে বালুকণা বায়ু-তাড়িত হইয়া উত্তর চীনে লোয়েস (Loess) মৃত্তিকার সৃষ্টি করিয়াছে। তা'ছাড়া বায়ুস্থিত অক্সিজেন আর্দ্র অবস্থায় অনেক শিলার রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। লোহাতেও এই জন্যই মরিচা ধরিয়া থাকে।

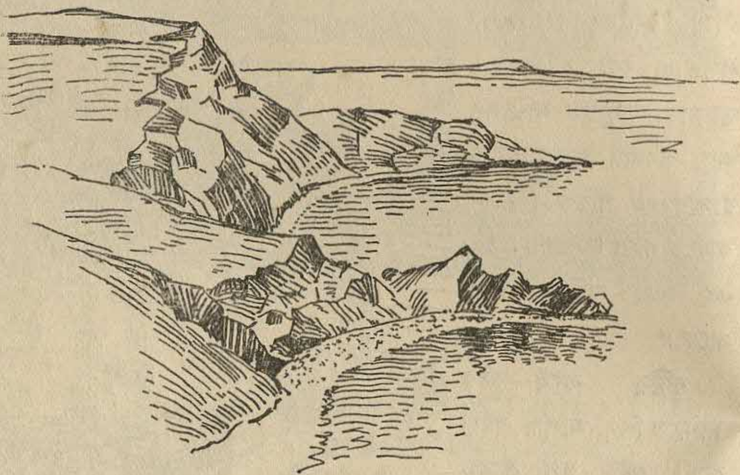


ভূ-পাত
৪১নং চিত্র

বৃষ্টির কার্য—বৃষ্টির আঘাতে শিলা আল্‌গা হইয়া যায়। বৃষ্টির জল প্রবেশ্য শিলাস্তরে প্রবেশ করিয়া উহাকে নরম ও আল্‌গা করিয়া দেয়। বৃষ্টির জলে বায়ুস্থিত কারবন-ডায়ক্সাইড দ্রব অবস্থায় থাকে। এই জন্যই বৃষ্টির জল চূণাপাথর জাতীয় শিলার চূণের ভাগকে দ্রব করিয়া শিলার ক্ষয় সাধন করে। পর্বত বা পাহাড়ে অনেক সময় বৃষ্টির জল প্রবেশ করিয়া নীচের শিলাস্তরকে পিচ্ছিল এবং আল্‌গা করিয়া দেয়। এই পিচ্ছিল স্তরের উপরের শিলাস্তর পাহাড়ের কোন ঢালু অংশে হেলানভাবে থাকিলে উহা আপনার ভারে নীচে নামিয়া আসে। এইরূপ ধ্বস নামাকে **ভূ-পাত** (Landslip) বলে। শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং যাওয়ার পথে এই জন্যই বর্ষাকালে অনেক ধ্বস নামিয়া থাকে।

সমুদ্রের কার্য—সমুদ্রতরঙ্গের আঘাতে উপকূলভাগ অবিরত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সমুদ্রজল কোন কোন শিলাকে দ্রব করিয়া উহার ক্ষয়সাধন করে।

সমুদ্রজলের রাসায়নিক শক্তিও ক্ষয়কার্যে কিছুটা সহায়তা করে। উপকূলের কঠিন শিলার ক্ষয় কম হয় এবং নরম শিলার ক্ষয় বেশী হয়। উপকূলের কোন অংশ কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত হইলে এবং উহার উভয় পার্শ্বে নরম শিলা থাকিলে নরম শিলা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কঠিন শিলার উভয় পার্শ্ব দিয়া সমুদ্র তখন উপকূলের



সমুদ্রের ক্ষয়কার্য
৪২নং চিত্র

দিকে প্রবেশ করে। এইভাবে অন্তরীপের সৃষ্টি হয়। আবার কঠিন শিলার মাঝখানে নরম শিলা থাকিলে নরম শিলা ক্ষয় করিয়া সমুদ্র স্থলভাগের ভিতরে প্রবেশ করে। এইভাবে উপসাগরের সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়া সমুদ্রস্রোত নদীবাহিত পলিকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গিয়া উপকূলের সন্নিকটে নূতন ভূ-ভাগ গঠনেও সাহায্য করে।

তুষারের কার্য—জল জমিয়া বরফ হইলে আয়তনে বাড়িয়া যায়। ভূ-ত্বকের ফাটল দিয়া জল প্রবেশ করে। শীতপ্রধান অঞ্চলে ঐ জল রাত্রে জমিয়া বরফ হয় এবং আয়তনে বাড়ে। তখন উহার চাপে শিলাস্তর ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে।

হিমশৈলের কার্য—মেরু অঞ্চল হইতে অনেক সময় বিরাট বিরাট বরফের চাঁই সমুদ্রের উপর দিয়া ভাসিয়া উষ্ণ অঞ্চলের দিকে যাইতে থাকে, তখন ইহাকে

হিমশৈল (Iceberg) বলে। সমুদ্রের উষ্ণ অংশে পৌঁছিলে হিমশৈল গলিতে আরম্ভ করে। তখন হিমশৈলবাহিত শিলাচূর্ণ সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়া চড়ার সৃষ্টি করে ; উত্তর আমেরিকার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের অদূরে **গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক** নামক মগ্ন চড়ার সৃষ্টি এইভাবে হইয়াছে।

নদীর কার্য

বৃষ্টি, প্রস্রবণ এবং হিমবাহের বরফ-গলা জল জমির ঢাল অনুযায়ী পর্বত হইতে নিম্নদিকে বহিয়া যায়। এই সকল জলধারা মিলিত হইয়া নদীর সৃষ্টি করে।

যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি ভূ-ত্বকের ধীর পরিবর্তন সাধন করে তাহাদের মধ্যে নদীই প্রধান। নদী এক কূল ভাঙ্গে অন্য কূল গড়ে। নদীর এই ভাঙ্গা-গড়ার কাজ নিরন্তর চলিতেছে। নদী ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় সাধন করে। ক্ষয়িত পদার্থগুলিকে বহন করিয়া লইয়া গিয়া অন্য স্থানে ফেলে এবং নূতন ভূ-ভাগ সৃষ্টির কার্যে সাহায্য করে। নদীর কাজ প্রধানতঃ তিন প্রকার—(১) **ক্ষয়** (Erosion), (২) **বহন** (Transportation) ও (৩) **অবক্ষেপণ** (Deposition)।

নদীর ক্ষয়কার্য—পার্বত্য অঞ্চলে নদীস্রোতের আঘাতে পর্বতগাত্রের শিলা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। নদীবাহিত নুড়ি, পাথরকুচি, বালুকণা প্রভৃতির আঘাত ও ঘর্ষণেও দুই তীর এবং নদীতলের শিলাস্তরের ক্ষয় ঘটে। এই ক্ষয়কে নদীর **সাধারণ ক্ষয়** (Mechanical Erosion) বলা হয়। নদীর জলে কোন কোন শিলা দ্রব হইয়া যায়। নদীর জলে কার্বনিক অ্যাসিড দ্রব অবস্থায় থাকিলে উহা সহজেই চূণাপাথর জাতীয় শিলা দ্রব করিতে পারে। নদী এইভাবে শিলার যে ক্ষয় সাধন করে তাহাকে নদীর **রাসায়নিক ক্ষয়** (Chemical Erosion) বলা হয়।

নদীর ক্ষয়কার্য তাহার স্রোতোবেগ এবং জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে জমির ঢালের উপরই নদীর বেগ নির্ভর করে। তাই নদীতলের ঢাল বেশী হইলে নদীর ক্ষয়কার্যও বৃদ্ধি পায়। কঠিন শিলা অপেক্ষা কোমল শিলাকে নদী অধিক ক্ষয় করিতে পারে। এই জন্যই নদী যখন প্রাথমিক অথবা রূপান্তরিত শিলার উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তখন উহার জল পরিষ্কার থাকে। কিন্তু যখন

উহা কাদাপাথর (Shale) বা অন্য কোন নরম শিলার উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তখন ক্ষয়কার্য বৃদ্ধি পায় এবং নদীর জল ঘোলাটে দেখায়।

নদীর দুই তীরের ক্ষয়কার্যকে **পার্শ্বক্ষয়** (Lateral Erosion) এবং নদীতলের (River-bed) ক্ষয়কে **নিম্নক্ষয়** (Vertical Erosion) বলা যাইতে পারে। পর্বত-গাত্র বাহিয়া নদী যখন নীচে নামিতে থাকে তখন উহাতে (নদীর পার্বত্য গতিতে) স্রোত প্রবল থাকে এবং নিম্নক্ষয় অধিক হয়। আবার সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হইবার সময় নদীর স্রোত যখন মন্দীভূত হইয়া আসে তখন পার্শ্বক্ষয় অধিক পরিমাণে হয়।

পরিবহন—নদী তাহার গতিপথে যাহা ক্ষয় করে নদীস্রোত তাহা বহিয়া লইয়া যায়। নদীর প্রবল স্রোত বৃহৎ শিলাখণ্ডকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারে। পার্বত্য অঞ্চলে বড় বড় পাথরের নুড়ি প্রভৃতি ভারী পদার্থ নদীতলের উপর দিয়া



নদীর নুড়ি

৪৩নং চিত্র

গড়াইয়া গড়াইয়া চলে। এইজন্য নদীর নুড়ি মসৃণ ও গোল হয়। অতি সূক্ষ্ম ও লঘু বালুকণাগুলি নদীজলে ভাসিয়া ভাসিয়া চলে। তা'ছাড়া দ্রব অবস্থায়ও অনেক পদার্থ নদীস্রোত দ্বারা অন্যত্র নীত হয়। স্রোতের বেগ কিঞ্চিৎ কমিয়া গেলে নদী বড় বড় নুড়িগুলিকে বহন করিতে পারে না, ঐগুলি তখন নদীতলে সঞ্চিত হইতে থাকে। তবে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট নুড়ি, পাথর ও শিলাচূর্ণকে নদী বহুদূর পর্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। কাদা, মাটি ইত্যাদি লঘু পদার্থকে নদী তাহার মোহানা পর্যন্ত পরিবহন করে।

অবক্ষেপণ—নদীর গতি যখন কমিয়া আসে তখন উহা আর বড় বড় নুড়ি বহন করিতে পারে না। এইগুলি তখন নদীতলে সঞ্চিত হইতে থাকে। নিম্ন গতিতে মোহানার নিকটে নদীর স্রোত যখন একেবারে কমিয়া যায় তখন নদীতলে পলল (Silt) সঞ্চিত হইতে থাকে এবং নদী তখন বালুচর বা ব-দ্বীপের সৃষ্টি করে।

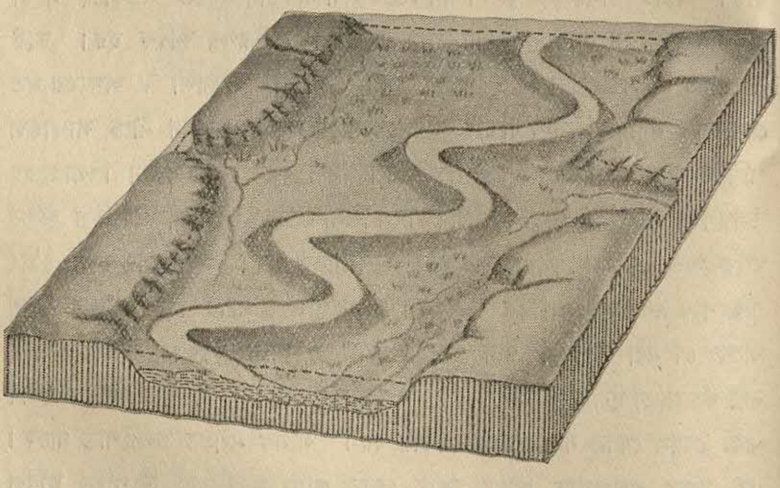
উৎস হইতে মোহানা পর্যন্ত নদী-প্রবাহের বিভিন্ন অংশে নদীর কার্য বিভিন্ন হয়। ক্রমাগত ক্ষয়কার্যের দ্বারা স্থলভাগের উচ্চতা হ্রাস করিয়া তাহাকে সমুদ্রের সমতলে লইয়া আসাই নদীর কার্যের প্রধান লক্ষ্য। নদী-প্রবাহকে তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ—প্রাথমিক গতি, মধ্যগতি ও নিম্নগতি।

নদীর প্রাথমিক গতি বা পার্বত্য প্রবাহ—উৎস হইতে পার্বত্য পথ বাহিয়া নদী সমতলে নামিয়া আসে। উৎস হইতে সমতলে নামিয়া আসা পর্যন্ত নদীর প্রবাহকে উহার প্রাথমিক বা পার্বত্য প্রবাহ বলা হয়। গঙ্গোত্রী হিমবাহ হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গানদীর প্রাথমিক গতি বলা যাইতে পারে। এই প্রবাহে নদীর ধ্বংস-কার্যই প্রধান থাকে। পার্বত্য-প্রবাহে জমির ঢাল অধিক থাকে। তাই নদী খরস্রোতা হয়। সেইজন্য সামান্য বাধাবিঘ্ন নদীর গতিপথের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। নদী-স্রোতের প্রচণ্ড আঘাতে শিলা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। বন্যার* সময় বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ডকে নদী একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায়। প্রাথমিক গতিতে নদীর পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয় অধিক হয়। তাই নদী-খাত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও গভীর হয়। নদী-খাত ইংরেজী V অক্ষরের মত দেখায়। নদীর ঢাল খুব খাড়াই হইয়া গেলে নদীর জল সবেগে নীচে লাফাইয়া পড়িতে থাকে। ইহাকে জলপ্রপাত বলে। নদী যখন কোন কঠিন শিলাস্তরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া কোমল শিলাস্তরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে তখন কোমল শিলা ক্ষয়িত হইয়া অপসারিত হয়। নদীতলের ঢাল হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। এই গতিতে নদীর নিম্নক্ষয় এত প্রবল থাকে যে নদী গভীর গিরিখাতের (River-Gorge) সৃষ্টি করে। পার্বত্য প্রবাহে নদী খরস্রোতা হয়, তাই নদীর এই অংশ নাব্য নহে। নদী-খাত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং কোন কোন সময় অত্যন্ত গভীর হয়। অনেক নদীতে জলপ্রপাত থাকে। এই সকল জলপ্রপাত হইতে কোন কোন স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া কলকারখানা চালানো হয়।

নদীর মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহ—মধ্য গতিতে নদী সমতলভূমির

* অল্প সময় বৃষ্টি হইলেই পার্বত্য নদীতে জলের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং নদী দিয়া প্রবল বেগে জল নামিয়া আসিতে থাকে। ইহাকেই পার্বত্য নদীর বন্যা বলা হয়।

উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। হরিদ্বার হইতে রাজমহল পর্যন্ত গঙ্গানদীর মধ্যপ্রবাহ বলা যাইতে পারে। এই প্রবাহে ভূমির ঢাল অল্প থাকে, তাই নদীর বেগ কম হয়। তখন নদী বড় বড় পাথর, নুড়ি ইত্যাদি বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। এইগুলি তখন নদীতলে ও দুই পার্শ্বে সঞ্চিত হইতে থাকে। নদী কেবল বালুকণা, কাদা প্রভৃতি বহন করিয়া নিম্নদিকে লইয়া যাইতে থাকে। এই অংশে নদীর ক্ষয় এবং গঠন দুই কাজই চলিতে থাকে। উপনদীগুলি তখন নদীর সহিত মিলিত হয়। নদীর অববাহিকা বড় হয় এবং নদীজলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু স্রোতের বেগ কম থাকে বলিয়া পার্বত্যপ্রবাহের মত ক্ষিপ্রগতিতে নদী ক্ষয়সাধন করিতে পারে না। পার্শ্বক্ষয় এবং নিম্নক্ষয় দুইই চলিতে থাকে। নদী যত নিম্নদিকে যাইতে থাকে উহার পার্শ্বক্ষয় তত বাড়িতে থাকে এবং নিম্নক্ষয় তত কমিতে থাকে। ইহার ফলে নদী-খাত তখন প্রশস্ত হয়। মধ্যগতিতে কোন স্থানে



প্লাবন-ভূমি
৪৪নং চিত্র

যদি জমির ঢাল খুব কম থাকে তবে নদীর গতিবেগ কমিয়া যায়। নদী তখন সব পলল (Silt—কাদা, মাটি, বালি প্রভৃতি) বহন করিতে পারে না। কতক পলল নদীতলে জমিতে থাকে। এইভাবে নদীতে বালুচরের সৃষ্টি হয়। মধ্যপ্রবাহে নদীর বেগ

কম, তাই প্রবাহ-পথে সামান্য বাধা পাইলে নদী উহা এড়াইবার জন্য বাঁকিয়া যায়। এইজন্য মধ্যপ্রবাহে নদীর গতি সোজা না হইয়া আঁকাবাঁকা হয়। বন্যার সময় নদীর জল বৃদ্ধি পায়, গতিবেগও তীব্র হয়; তাই ক্ষয়কার্য বৃদ্ধি পায় এবং উহা প্রচুর পলল বহন করিয়া লইয়া যায়। বন্যার জল বেশী বৃদ্ধি পাইলে নদী-খাত জল আটকাইয়া রাখিতে পারে না। জল তখন দুই কূল ছাপাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বন্যার জল কিছুদিন পরে চলিয়া যায় কিন্তু পলিমাটি পড়িয়া থাকে। এইভাবে পলিমাটি জমিয়া নদীর দুই পার্শ্বে নূতন সমভূমির সৃষ্টি করে। ইহাকে নদীর **প্লাবন-ভূমি** (Flood Plain) বলে। পলিমাটি দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া ইহাকে **পলি-ভূমি**ও (Alluvial Plain) বলা হয়। এই ভূমি খুব উর্বর হয়।

মধ্যগতিতে নদী নৌ-চলাচলের উপযোগী থাকে। নদীর প্লাবন-ভূমি অত্যন্ত উর্বর হয়। নদী হইতে জলসেচের সুবিধা থাকে; তাই উভয় তীরেই কৃষিকার্য চলে। অল্পায়াসে ফসল পাওয়া যায়, তাই নদী-উপত্যকায় লোকবসতি ঘন হইতে থাকে এবং নদীতীরে সমৃদ্ধ শহর ও নগর গড়িয়া উঠে। নদীতীরেই অতীতকালে বিভিন্ন মানবসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল; তাই উহাদিগকে নদী-মাতৃক সভ্যতাও বলা হয়—যেমন নীলনদের সভ্যতা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর সভ্যতা ও সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার সভ্যতা।

নদীর নিম্নগতি বা ব-দ্বীপ প্রবাহ—নদী-প্রবাহের নিম্ন অংশে যেখানে স্রোতের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসে, সেখান হইতে মোহানা পর্যন্ত নদীর নিম্নগতি



স্বাভাবিক বাঁধ

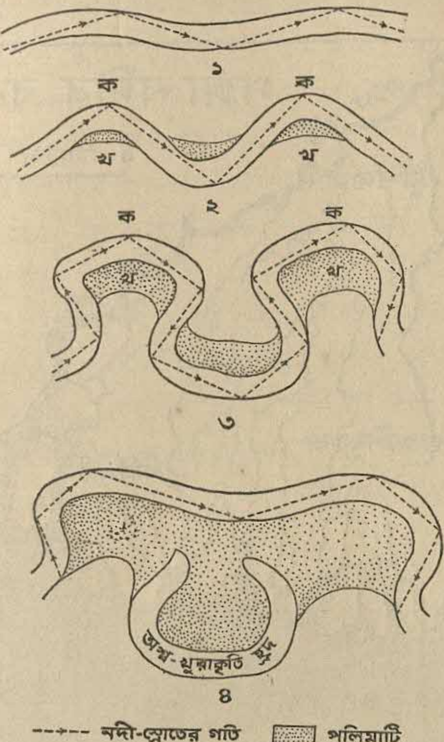
৪৫নং চিত্র

বা ব-দ্বীপ প্রবাহ। রাজমহল হইতে সাগর-সঙ্গম পর্যন্ত গঙ্গানদীর এই প্রবাহ। এই প্রবাহে নদীর গঠনকার্যই প্রধান। নদীর বেগ যখন একেবারে কমিয়া যায়,

নদী তখন অতি সূক্ষ্ম পলিকণা বহন করিয়া মোহানার দিকে লইয়া যায়। অবশিষ্ট পলল নদীতে জমা হইতে থাকে। নদীর নিম্নক্ষয় সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়, কিছুটা পার্শ্বক্ষয় চলিতে থাকে। মধ্যগতিতে নদী অল্প-পরিসর প্লাবনভূমির সৃষ্টি করে। কিন্তু এই প্রবাহে নদী বহুবিস্তৃত পলিভূমি গঠন করে। পার্শ্বক্ষয়ের ফলে নদী-খাত প্রশস্ত হয়। বন্যার জলে আনীত পলল নদীতলে, নদীতীরে এবং দুই পার্শ্বের জমিতে সঞ্চিত হইতে থাকে। দুই তীরে অধিক পরিমাণ পলি জমিতে থাকে। এইজন্য নদীতল ও দুই তীর পার্শ্ববর্তী ভূভাগ হইতে উচ্চ হইয়া উঠে। নদীর দুই পার্শ্বে তখন বাঁধের ন্যায় উচ্চ ভূভাগের সৃষ্টি হয়। নদীর নিম্নগতিতে প্রায়ই এইরূপ স্বাভাবিক বাঁধ দেখা যায়। মিসিসিপি, হোয়াংহো, ইয়াংসী প্রভৃতি নদীর নিম্নপ্রবাহে এইরূপ বাঁধ আছে। দক্ষিণ বঙ্গের মাতলা, বিদ্যাধরী প্রভৃতি নদীতে এই ধরণের বাঁধের সৃষ্টি হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় অনেক সময় নদী এই নিজ-সৃষ্ট বাঁধের নরম অংশ ভাঙ্গিয়া সর্বনাশা বন্যার সৃষ্টি করে। কোন কোন সময় আবার নূতন নদী-খাত সৃষ্টি করিয়া সেইদিকে প্রবাহিত হয়। সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র এইরূপ গতি-পরিবর্তন করিয়াছে। চীন দেশের হোয়াংহো নদী বহুবার এইভাবে গতি-পরিবর্তন করিয়াছে।

পার্শ্বক্ষয়ের আধিক্যহেতু নদী নিম্নগতিতে সর্পিল ভঙ্গিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। বাঁকের মুখে নদীর যে তীর স্রোতের বিপরীত দিকে থাকে সেই তীরে স্রোতের বেগ বেশী হয়। জলের আঘাতে এবং স্রোতের জন্য এই তীর বেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিপরীত অংশে স্রোত অপেক্ষাকৃত কম থাকে বলিয়া সেখানে চড়া পড়িতে থাকে। এইভাবে এক তীর ভাঙ্গিতে থাকিলে এবং অপর তীরে চড়া পড়িতে থাকিলে বাঁকগুলি ক্রমশঃ আরও সর্পিল হয় ; দুই বাঁকের মধ্যবর্তী ভূভাগও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। অবশেষে বন্যার সময় নদী এই সঙ্কীর্ণ ভূভাগ ভাঙ্গিয়া সোজা পথে বহিতে থাকে। নদীতীরে পলি জমিতে থাকে, ফলে পুরানো নদী-খাতটি নূতন নদী-খাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হ্রদের মত পার্শ্বে পড়িয়া থাকে। ইহাকে **অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ** (Ox-Bow Lake or Horse-Shoe Lake) বলে। ৪৬নং চিত্রটি লক্ষ্য করিলে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের কিভাবে সৃষ্টি হয় তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। পশ্চিমবঙ্গের ব-দ্বীপ অংশে এইরূপ অনেক অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ আছে। নদী এইভাবে

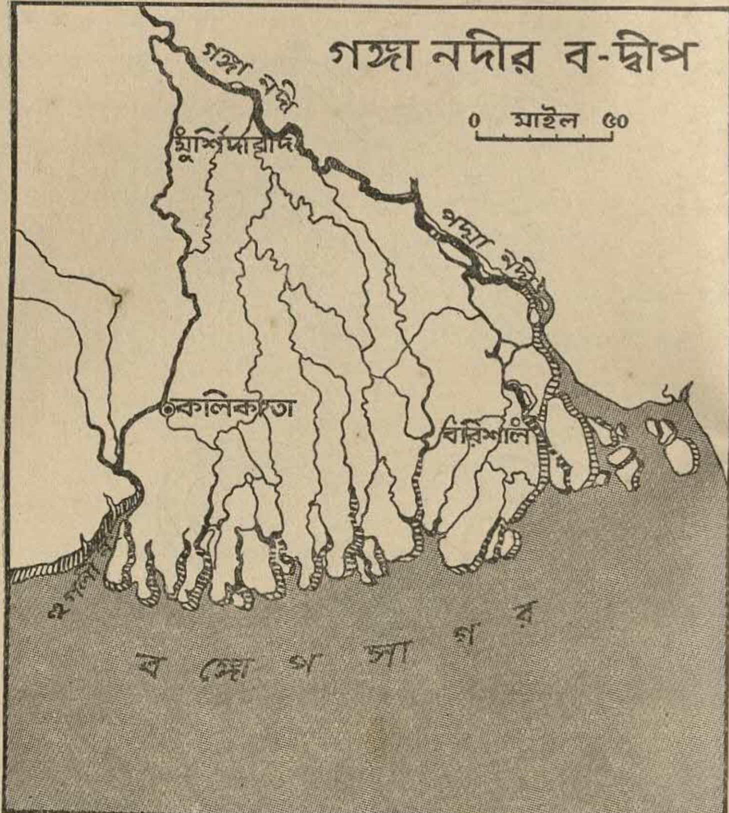
একদিক হইতে অন্যদিকে সরিতে থাকে এবং পলিমাটি দ্বারা বিস্তীর্ণ পলিভূমি (Alluvial Plain) সৃষ্টি করে।



অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের উৎপত্তি
৪৬নং চিত্র

মোহানার নিকটে নদীর স্রোত থাকে না বলিলেই চলে। মোহানার নিকটে সমুদ্রস্রোত প্রবল না হইলে নদীমুখে তখন তলানি পড়িতে থাকে। নদীতলে ক্রমশঃ উচ্চভূমির সৃষ্টি হয়। নদী বাধা পায়, তাই নদীস্রোত মগ্ন উচ্চভূমির দুই পাশ দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। এই মগ্নভূমি ক্রমশঃ জলের উপরে জাগিয়া উঠে। মূল নদীপ্রবাহ উহার দুই পাশ দিয়া প্রবাহিত হয়, মূল নদী হইতে বহু শাখানদী ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হয়। এই ভূমির একদিকে সমুদ্র অন্য

দুইদিকে নদীপ্রবাহ। তাই উহা মাত্রাহীন 'ব'-এর মত ত্রিকোণাকার ধারণ করে। এজন্য ইহাকে ব-দ্বীপ বলে। ইহা দেখিতে গ্রীক **ডেল্টা** (△) অক্ষরের



৪৭নং চিত্র

মত, তাই ইংরাজীতে ইহাকে Delta বলে ; গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং নীল নদের ব-দ্বীপ সুবিখ্যাত। সকল নদীর মোহানাতে ব-দ্বীপ দেখা যায় না। কারণ সকল নদীতে ব-দ্বীপ গঠনের অনুকূল অবস্থা থাকে না। নদী যদি প্রবল বেগে সমুদ্রে পতিত হয়, অথবা মোহানায় যদি জোয়ার-ভাঁটার বেগ অধিক হয়, কিম্বা সমুদ্র-স্রোত প্রবল

হয়, নদীর সমভূমিপ্রবাহের দৈর্ঘ্য যদি কম হয় এবং নদীধারায় যদি পলির অপ্রাচুর্য থাকে তবে নদীমুখে ব-দ্বীপ গঠিত হইতে পারে না।

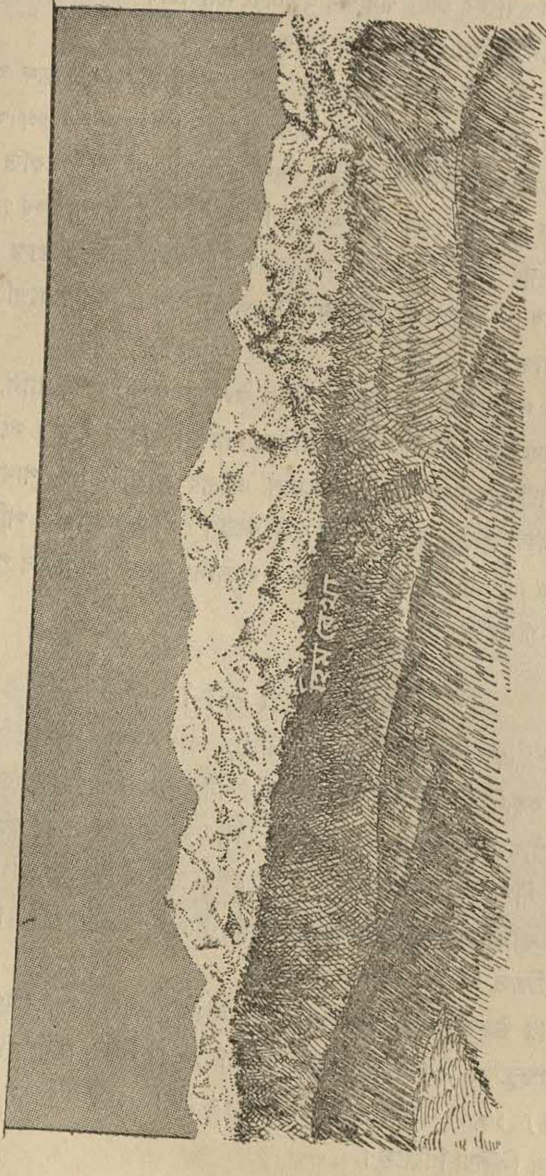
নদী-প্রবাহের উপরোক্ত তিনটি অংশেই নদীর ক্ষয়কার্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তিও আপন আপন ক্ষয়কার্য করিতে থাকে। যে সব অঞ্চল অত্যন্ত শুষ্ক সেই সকল অঞ্চলে নদীর ক্ষয়কার্যের স্বরূপ এবং নদী-খাতের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এই সকল শুষ্ক অঞ্চলে নিম্নক্ষয় অধিক হয়, পার্শ্বক্ষয় মোটেই হয় না। নদীর দুই তীর খাড়াভাবে নামিয়া যায়। নদী ক্রমশঃ অত্যন্ত গভীর খাতের সৃষ্টি করে। ইহাকে **ক্যানিয়ন** (Canyon) বলে। কলোরেডো নদীর ক্যানিয়ন সুবিখ্যাত।

বৃষ্টির সময় পাহাড়ের গা বাহিয়া অসংখ্য জলধারা কাদা, মাটি, বালি, পাথর বহন করিয়া প্রবলবেগে নীচের দিকে নামিতে থাকে। নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে জলের বেগ কমিয়া যায়, পাহাড়ের পাদদেশে ঐ সব কাদা, বালি, পাথর জমা হইয়া ক্রমশঃ একটি শঙ্কুর মত উচ্চভূমি গঠন করে। ইহাকে **শাঙ্কব পলিভূমি** (Alluvial Fan or Alluvial Cone) বলে। দার্জিলিং অঞ্চলে পাহাড়ের পাদদেশে এইরূপ অনেক পলিভূমি দেখা যায়।

হিমবাহের কার্য

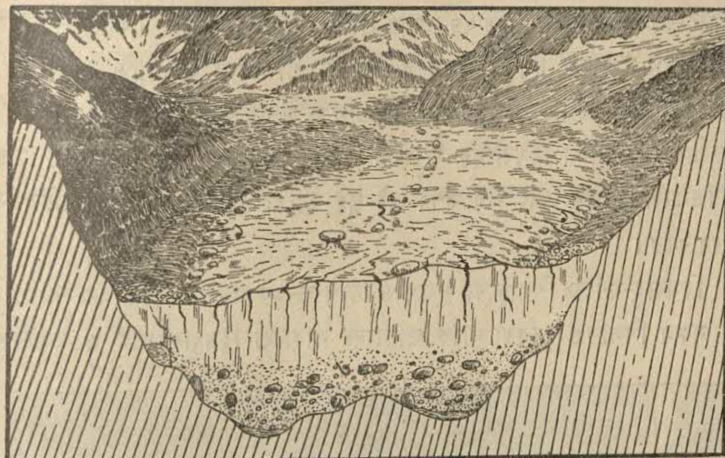
মেরুপ্রদেশে এবং উচ্চ পর্বতে শীত বেশী, তাই উচ্চ পর্বতশিখরে এবং মেরুপ্রদেশে বরফ জমিয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চল শীতকালে বরফে ঢাকা থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া যায়। আবার কোথাও সারা বৎসর বরফ থাকে। যে সীমারেখার ঊর্ধ্বে বৎসরের কোন সময়ই বরফ গলে না, সারা বৎসরই বরফ জমিয়া থাকে, তাহাকে **হিমরেখা** (Snow-line) বলে। হিমরেখার নীচে বরফ গলিতে আরম্ভ করে।

হিমরেখার উচ্চতা অক্ষাংশ, বায়ুর গতি, আর্দ্রতা এবং তাপের উপর নির্ভর করে। নিরক্ষবৃত্তের নিকটে হিমরেখার উচ্চতা ১৮,০০০ ফুট, হিমালয়ে (ভারত-বর্ষের দিকে) ১৬,০০০ ফুট, আল্‌প্‌সে ৯,০০০ ফুট। মেরু অঞ্চলে হিমরেখা সমুদ্র-সমতলে মিশিয়া গিয়াছে।



চিত্র নং ১৪
হিমরেখা

হিমরেখার উপরে স্তূপাকারে বরফ জমিতে থাকে। উপরের বরফের চাপে নীচের বরফ পাথরের মত কঠিন হইয়া যায়। এই সকল বরফস্তূপ তখন আপন ভারে উপরের চাপে এবং মাধ্যাকর্ষণে পর্বতগাত্র বাহিয়া অতি ধীরে নামিতে থাকে। তাহাকে **হিমবাহ** (Glacier) বলে। হিমরেখার নীচে নামিলে বরফ গলিতে আরম্ভ করে। তখন উহা হইতে নদীর উৎপত্তি হয়।



হিমবাহ
১—পার্শ্বগ্রাবরেখা ২—মধ্যগ্রাবরেখা
৪৯নং চিত্র

পর্বতগাত্র অনেক সময় অত্যন্ত খাড়াভাবে থাকে। উপরের স্তূপীকৃত বরফ তখন পর্বতের এই খাড়া গা বাহিয়া সশব্দে প্রবলবেগে নীচে নামিয়া আসে। ইহাকে **হিমানীসম্প্রপাত** (Avalanche) বলে।

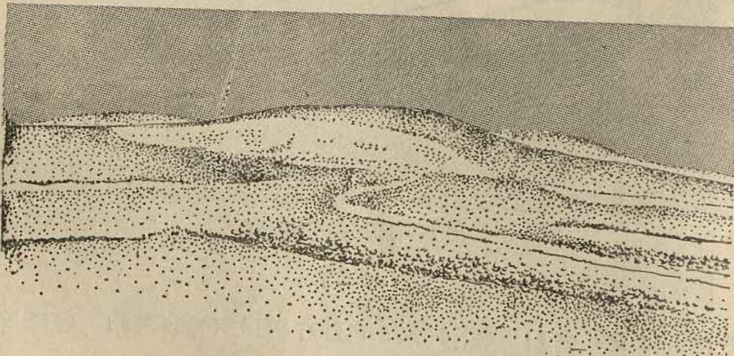
প্রায় দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে তুষার যুগে (Pleistocene Ice Age) ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশ বিশাল বরফস্তূপে আবৃত ছিল। এইরূপ বিশাল হিমবাহকে **মহাদেশীয় হিমবাহ** (Continental Glacier or Ice Sheet) বলা হয়। এই সকল অঞ্চল হইতে মহাদেশীয় হিমবাহ এখন লোপ পাইয়াছে তবে

হ্রদ আছে। প্রান্ত গ্রাবরেখা অনেক সময় জলপ্রবাহের গতি রোধ করিয়া হ্রদের সৃষ্টি করে।

হিমবাহ অনেক সময় বিশাল বিশাল শিলাখণ্ড বহুদূর পর্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যায়। আমেরিকার নিউহ্যাম্পশায়ারে এরূপ একটি শিলা আছে। উহা দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতায় প্রায় ৯০′×৪০′×৩৮′ ফুট। হিমরেখার নীচে এই সকল বিরাট বিরাট প্রস্তরখণ্ড (Erratics) পড়িয়া থাকে।

দুইদিক হইতে ছোট ছোট হিমবাহ বড় হিমবাহে মিলিত হয়। বড় হিমবাহের ক্ষয়-ক্ষমতা বেশী থাকে, তাই উহা খুব গভীর খাত খনন করে। উপহিমবাহ তত গভীর খাত তৈয়ারী করিতে পারে না, তাই এই সকল উপত্যকা হইতে হিমবাহ অন্তর্হিত হইলে উপহিমবাহ (Tributary Glacier)-গুলির উপত্যকা অনেক উচ্চে উঠিয়া থাকে। উহা হইতে নদী জলপ্রপাতের আকারে নিম্নের উপত্যকায় পতিত হয়। উপরের এই উপত্যকাকে ইংরাজীতে Hanging Valley বলে।

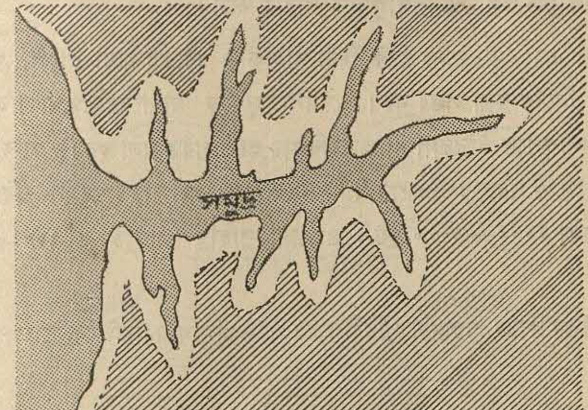
বিভিন্ন দিক হইতে ক্ষয়কার্যের ফলে পর্বতশৃঙ্গগুলি পিরামিডের আকার ধারণ করে।



হিমবাহ সঞ্চিত শিলাস্তূপ
৫২নং চিত্র

হিমবাহ-সৃষ্ট উপত্যকা সমুদ্রে মগ্ন হইলে ফিয়র্ডের সৃষ্টি করে। হিমরেখার নিম্নে যখন বরফ গলিতে থাকে তখন হিমবাহ-বাহিত পাথর, নুড়ি প্রভৃতি হিমবাহের

সম্মুখে স্তূপাকারে পড়িয়া থাকে। এইগুলি জমিয়া ছোট ছোট পাহাড়ের (Morainic Hill) সৃষ্টি করে। নুড়িগুলি জলের স্রোতে আরও নীচের দিকে অগ্রসর হয় এবং নিম্নস্থানে জমিতে থাকে। ইহার সঙ্গে কিছু কাদাও সঞ্চিত হয় এবং ক্রমে কাদা ও নুড়ি দ্বারা একটি সমভূমির সৃষ্টি হয় (Boulder Clay Country)। হিমবাহ যেখানে শেষ হয় তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে স্থানে স্থানে



ফিয়র্ড
৫৩নং চিত্র

স্তূপাকারে কাদা, বালি ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়া থাকে (Drumlins)। এইগুলিকে উল্টানো নৌকার মত মনে হয়। আরও কিছু দূরে হিমবাহ-বাহিত সূক্ষ্ম বালুকণা ও কাদা জলধারার প্রভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই সকল কাদা ও বালি কালক্রমে একটি উর্বর সমভূমির সৃষ্টি করে (Glacio-Fluvial Plain)।

চতুর্থ অধ্যায়

পর্বত

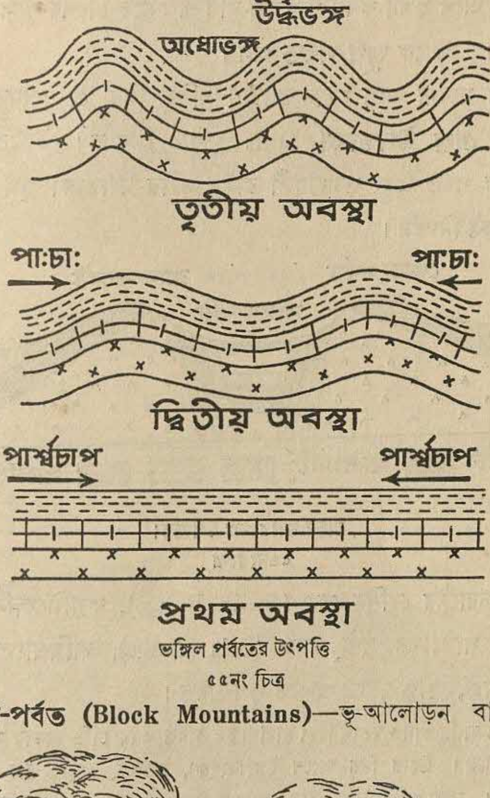
পর্বত—সাধারণতঃ বহুদূর বিস্তৃত সুউচ্চ শিলাস্তূপকে পর্বত এবং অল্পদূরবিস্তৃত এবং অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ শিলাস্তূপকে পাহাড় বলে।

উচ্চতা এবং আয়তনের দিক দিয়া পাহাড় ও পর্বতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমারেখা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। যে শিলাস্তূপকে আমাদের দেশে পাহাড় বলি অনুরূপ শিলাস্তূপকে ইউরোপ বা আমেরিকায় হয়ত পর্বত বলা হয়। আবার একই দেশে পাহাড় ও পর্বতের উচ্চতার ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—বিন্ধ্য পর্বত (গড় উচ্চতা ২০০০—৩০০০ ফুট) ও নাগা পাহাড় (গড় উচ্চতা ৭০০০—৮০০০ ফুট)।

উৎপত্তির কারণ অনুযায়ী পৃথিবীপৃষ্ঠের পর্বতগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) **ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountains)**—ভূ-আন্দোলন এবং পার্শ্বচাপের ফলে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি হয়। অনেক সময় ভূ-ভাগের ক্ষয়জাত পলি স্তরে স্তরে স্থানীয় সমুদ্রের তলায় সঞ্চিত হইতে থাকে। ভূ-আলোড়নের জন্য কখন কখন পার্শ্বচাপের সৃষ্টি হয়। এই পার্শ্বচাপের ফলে পাললিক শিলাস্তরে অল্প অল্প ভাঁজ পড়ে। পার্শ্বচাপের আধিক্য হেতু ভাঁজগুলি ক্রমশঃ অত্যন্ত জটিল ও বড় হইয়া উঠে। তারপর ভূ-আলোড়নের ফলে ভাঁজগুলি সমুদ্রের উপর জাগিয়া উঠিয়া পর্বতের সৃষ্টি করে। এই পর্বতকে **ভঙ্গিল পর্বত** বলে। ভঙ্গিল পর্বতের প্রধান উপাদান পাললিক শিলা। কিন্তু ভূ-আলোড়নের সময় উহাতে যে সকল ফাটল দেখা দেয় তাহার ভিতর গলিত শিলাপদার্থ জমিয়া আগ্নেয় শিলারও সৃষ্টি করে। আবার চাপের ফলে এই উভয় প্রকার শিলাই রূপান্তরিত হয়। পাললিক শিলাদ্বারা গঠিত বলিয়া ভঙ্গিল পর্বতে অনেক জীবাশ্ম পাওয়া যায়। একটি ভাঁজের উচ্চ স্থানকে **ঊর্ধ্বভঙ্গ** (Anticline) এবং নিম্ন স্থানকে **অধোভঙ্গ** (Syncline) বলে।

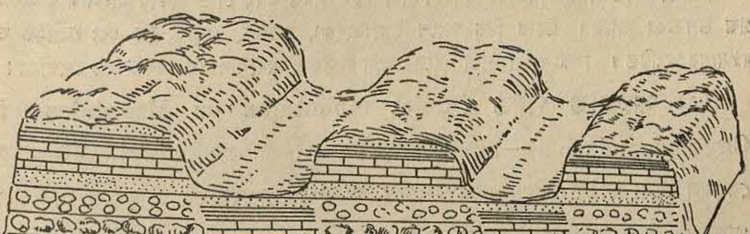
পৃথিবীর অত্যুচ্চ পর্বতগুলি ভঙ্গিল পর্বত। রকি, আন্দিজ, আল্পস্, জুরা এবং হিমালয় ভঙ্গিল পর্বতের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।



ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি

৫৫নং চিত্র

(২) **স্তূপ-পর্বত (Block Mountains)**—ভূ-আলোড়ন বা ভূ-কম্পনের



স্তূপ পর্বত

৫৫নং চিত্র

ফলে ভূ-ত্বক কখন কখন খাড়াভাবে ফাটিয়া যায় এবং এই ফাটলের এক দিকের অংশ উপরে উঠিয়া বা নীচে বসিয়া যায়। ইহার নাম **চ্যুতি** (Fault)। দুই চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ কখন কখন পার্শ্বচাপ বা নিম্ন হইতে চাপের ফলে পর্বতের মত উঁচু হইয়া উঠে। ইহাকে **স্তূপ-পর্বত** বলে।

দুই চ্যুতির মধ্যের অংশ কোন কারণে বসিয়া গিয়া যে অবনত ভূমির সৃষ্টি করে তাহাকে **গ্রস্ত উপত্যকা** (Rift Valley) বলে। ইউরোপের ব্ল্যাক ফরেষ্ট ও ভোজ পর্বত এবং তন্মধ্যবর্তী রাইন নদীর উপত্যকা স্তূপ-পর্বত ও গ্রস্ত উপত্যকার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।



রাইন নদীর গ্রস্ত উপত্যকা
৫৬নং চিত্র

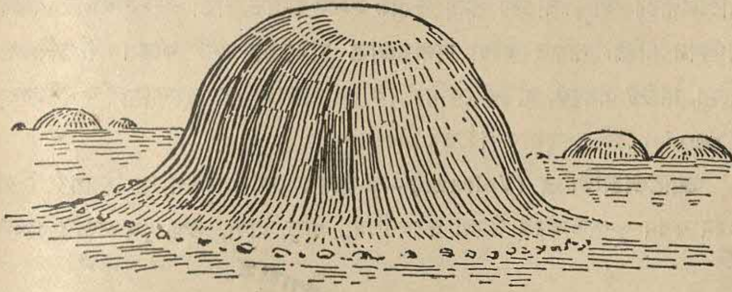
পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের বেসিন রেঞ্জ (Basin Range), ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরা-নেভাদা পর্বত, পাঞ্জাবের সল্ট্ রেঞ্জ (Salt Range), দাক্ষিণাত্যের সাতপুরা, ইউরোপের ভোজ, ব্ল্যাক ফরেষ্ট প্রভৃতি স্তূপ-পর্বত।

সিরিয়া হইতে আফ্রিকার পূর্বভাগ দিয়া নায়াসা হ্রদ পর্যন্ত প্রায় চারি হাজার মাইল দীর্ঘ একটি গ্রস্ত উপত্যকা আছে। উহার নিম্ন অংশে টাঙ্গানাইকা, রুডল্ফ্ প্রভৃতি হ্রদ এবং লোহিত ও মরুসাগর অবস্থিত। বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মধ্যে অবস্থিত নর্মদা উপত্যকা একটি গ্রস্ত উপত্যকা।

(৩) **ক্ষয়জাত পর্বত (Relict Mountains or Mountains of Circumdenudation)**—বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে কোন মালভূমির কোমল শিলা ক্ষয়িত হইয়া গেলে উপরের কঠিন শিলা পর্বতের আকারে দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাকে ক্ষয়জাত পর্বত (Relict Mountain) বলে। বিন্ধ্য পর্বত ইহার একটি নিদর্শন।

নগ্নীভবনের ফলে ভঙ্গিল পর্বতের কোমল শিলাস্তর অপসারিত হইয়া গেলে

কঠিন শিলা অল্প-উচ্চ পাহাড়ের ন্যায় অবস্থান করে। ইহাদিগকেও **ক্ষয়জাত**



ক্ষয়জাত পর্বত
৫৭নং চিত্র

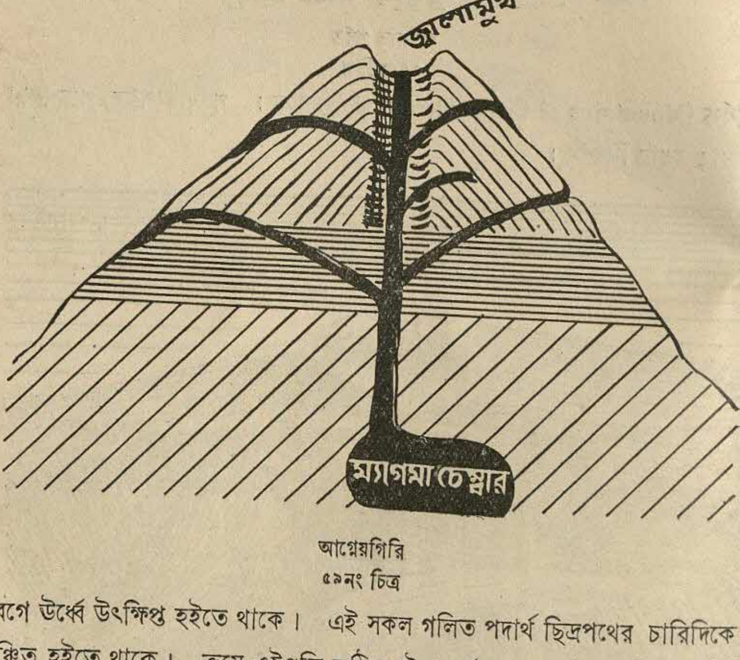
পর্বত (Mountains of Circumdenudation) বলে। পূর্বঘাট পর্বত, পরেশনাথ পাহাড় ইহার নিদর্শন।



সঞ্চয়জাত পর্বত
৫৮নং চিত্র

(৪) **সঞ্চয়জাত পর্বত (Mountains of Accumulation)**—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূ-গর্ভ হইতে নির্গত লাভা প্রভৃতি গলিত পদার্থ দীর্ঘকাল ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া **সঞ্চয়জাত পর্বতের** সৃষ্টি করে। বিসুভিয়স্, এট্না, মাউন্ট এলবুর্জ, মাউন্ট কেনিয়া, কিলিমানজেরো এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাসকেড্ (Cascade) রেঞ্জ সঞ্চয়জাত পর্বতের নিদর্শন।

আগ্নেয়গিরি (Volcano)—ভূ-ত্বকের কোন ফাটল বা ছিদ্রপথ দিয়া কখন কখন ভূ-অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত তরল শিলা, ধাতু, বাষ্প, ভস্ম, ধূম প্রভৃতি প্রবল



আগ্নেয়গিরি
৫৯নং চিত্র

বেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই সকল গলিত পদার্থ ছিদ্রপথের চারিদিকে সঞ্চিত হইতে থাকে। ক্রমে এইগুলি কঠিন হইয়া পর্বতের মত উচ্চ হইয়া উঠে। এইরূপ পর্বতকে **আগ্নেয়গিরি** বলে।

আগ্নেয়গিরির ছিদ্রপথে উত্তপ্ত পদার্থগুলির বিস্ফোরণ ও নির্গমনকে আগ্নেয়গিরির **অগ্ন্যুৎপাত** (Volcanic Eruption) বলে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত গলিত শিলাকে **লাভা** (Lava) বলা হয়। উচ্চ আগ্নেয়গিরির ছিদ্রপথকে সরু নলের

মত দেখায়। এই ছিদ্রপথের বহির্মুখ বাটির মত। ইহাকে **আগ্নেয়গিরির মুখ** বা **জ্বালামুখ** (Crater) বলে। অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বেই ভূ-অভ্যন্তর হইতে লাভা প্রভৃতি আগ্নেয়গিরির ছিদ্রপথের নিকটে ও তলদেশে একটি বিশাল গহ্বরে সঞ্চিত হয়। এই গহ্বরকে **ম্যাগমা চেম্বার** (Magma Chamber) বলে।

অগ্ন্যুদ্গারের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী আগ্নেয়গিরিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) **জীবন্ত আগ্নেয়গিরি**—যে সকল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এখনও বন্ধ হয় নাই তাহাদিগকে **জীবন্ত** (Active) **আগ্নেয়গিরি** বলে। ইহাদের মধ্যে যেগুলি হইতে অনবরত লাভা নির্গত হয়, সেইগুলিকে **অবিরাম আগ্নেয়গিরি** (Incessant Volcano) এবং যেগুলি হইতে মধ্যে মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত হয় সেইগুলিকে



ফুজিয়ামা
৬০নং চিত্র

সবিরাম (Intermittent) **আগ্নেয়গিরি** বলে। ইটালীর অন্তর্গত **বিসুভিয়স্** এবং লিপারী দ্বীপের **ষ্ট্রম্বলি** যথাক্রমে সবিরাম ও অবিরাম আগ্নেয়গিরির উদাহরণ।

(২) **সুপ্ত আগ্নেয়গিরি**—যে সকল আগ্নেয়গিরি বহুকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে, কিন্তু যাহা হইতে ভবিষ্যতে অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাদিগকে **সুপ্ত** (Dormant) **আগ্নেয়গিরি** বলে। জাপানের **ফুজিয়ামা** সুপ্ত আগ্নেয়গিরির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

(৩) **মৃত আগ্নেয়গিরি**—যে সকল আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাতের আর কোন সম্ভাবনা নাই তাহাদিগকে **মৃত** (Extinct) **আগ্নেয়গিরি** বলে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আমেরিকার চিম্বোরাজোর নাম করা যাইতে পারে।

আগ্নেয়গিরির বাহ্য আকৃতি অনুযায়ীও আগ্নেয়গিরিগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

অগ্ন্যুৎপাতের সময় সশব্দে জ্বালামুখ হইতে লাভা প্রভৃতি নির্গত হয়। অনেক সময় ভূ-ত্বকের ফাটল দিয়া নিঃশব্দে লাভা উপরে উঠিতে থাকে (Fissure Eruption)। এই গলিত লাভা চতুর্দিকে ছড়াইয়া গিয়া বহুবিস্তৃত লাভাক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। দাক্ষিণাত্যে প্রায় ২ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান ব্যাসাল্ট জাতীয় লাভায় গঠিত। ইহাই দাক্ষিণাত্যের সুবিখ্যাত কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত-কালে কঠিন, বাষ্পীয় ও তরল এই তিন শ্রেণীর পদার্থই উদ্গীর্ণ হয়। বাষ্পীয় পদার্থের মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অধিক থাকে। ইহা ছাড়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (Hydrochloric Acid) বাষ্প, হাইড্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গন্ধকের বাষ্পও নির্গত হয়। তরল পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লাভাই প্রধান। কোন কোন শ্রেণীর লাভাতে সিলিকার পরিমাণ বেশী থাকে এবং কোন কোন শ্রেণীতে সিলিকা কম থাকে। ভস্ম, শিলাচূর্ণ, পাথরকুচি প্রভৃতি কঠিন পদার্থও অগ্ন্যুৎপাতের সময় উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়। এই পাথরকুচি জমিয়াই পরে ব্রেক্সিয়া (Breccia) নামক শিলা গঠিত হয়।

অগ্ন্যুৎপাতের কারণ—পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রতি ৬৪ ফুট গভীরতার জন্য ১° ফাঃ তাপ বৃদ্ধি পায়। এই হিসাবে তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ভূ-পৃষ্ঠের কয়েক মাইল নীচে তাপ অত্যন্ত অধিক হইবে। এত অধিক তাপে কোন শিলাই কঠিন থাকিতে পারে না। তাই সকল প্রকার শিলারই ঐ স্থানে উত্তপ্ত এবং গলিত অবস্থায় থাকার কথা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। ভূ-পৃষ্ঠের কয়েক মাইল নীচে উপরের শিলাস্তরের ওজনের ফলে চাপ অত্যন্ত বেশী

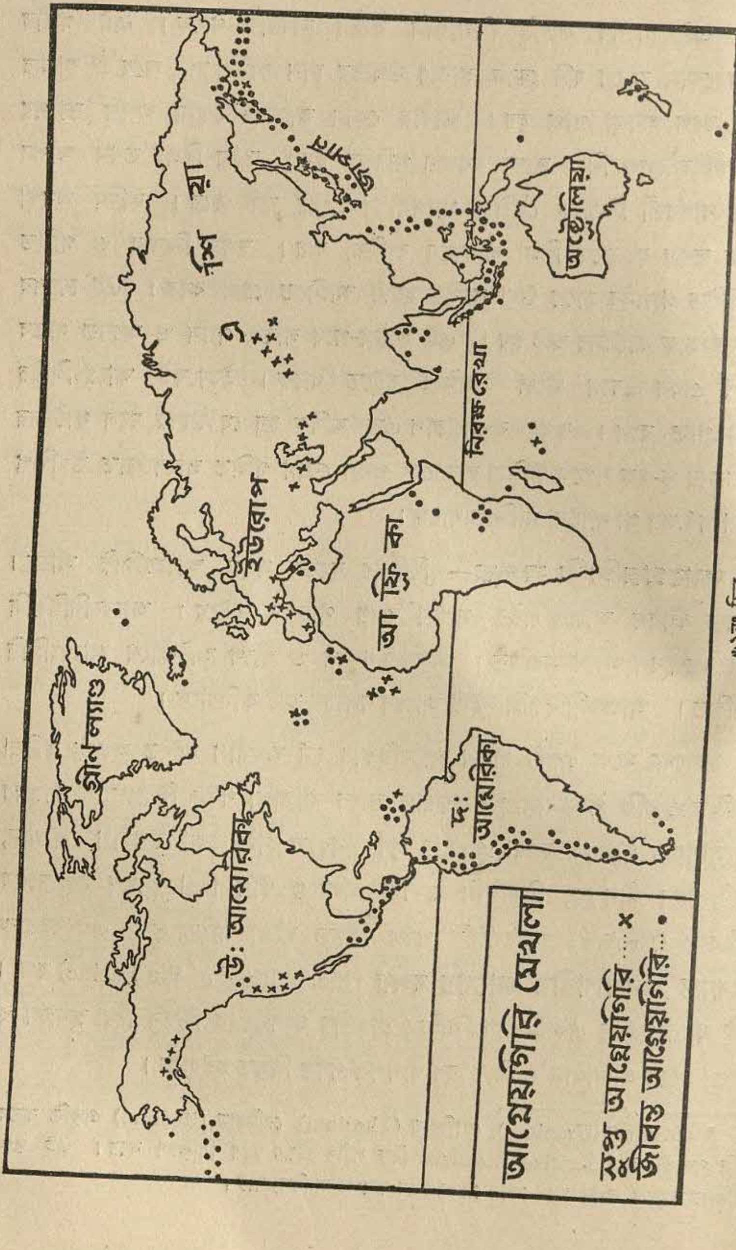
হয়। এই চাপের ফলেই শিলাগুলি কঠিন অবস্থায় থাকে। এই গভীর স্তরের কোন অংশে যদি কোন কারণে উপরের চাপ কমিয়া যায়, তবে ঐ স্থানের শিলা তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আবার কোন কারণে* কোন অংশে তাপের আধিক্য হইলেও শিলা তরল অবস্থায় পরিণত হয়। তরল শিলা তখন আপন চাপে পার্শ্ববর্তী শিলাকে ঠেলিয়া ম্যাগমা চেম্বারের সৃষ্টি করে। কঠিন অবস্থা হইতে তরল হওয়াতে শিলা আয়তনে বাড়িয়া যায়। তখন নিজের ও গলিত শিলাস্থিত গ্যাসের চাপে উহা বাহির হইয়া আসিতে চেষ্টা করে। এই চাপের ফলে ভূ-ত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হয়। এই ফাটল-পথে লাভা, গ্যাস ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ প্রবল বেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ইহাকেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বলে। কখন কখন চাপ এত অধিক হয় যে উহার ফলে ফাটলের উপরকার ভূ-ত্বক সশব্দে উড়িয়া যায় এবং প্রবল বেগে গলিত লাভাস্রোত উৎক্ষিপ্ত হইয়া পর্বতের গা বাহিয়া নামিতে থাকে।

আগ্নেয়গিরি বলয়—পৃথিবীতে কয়েক সহস্র আগ্নেয়গিরি আছে। তন্মধ্যে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সংখ্যা প্রায় পাঁচশত হইবে। আগ্নেয়গিরিগুলি ভূ-ত্বকের দুর্বল অংশে অবস্থিত। সমুদ্র-উপকূলে ও দ্বীপে অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি অবস্থিত। আগ্নেয়গিরিগুলি দুইটি আগ্নেয় বলয়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে একটি দক্ষিণ আমেরিকার হর্ন অন্তরীপ হইতে আরম্ভ করিয়া আণ্ডিজ ও রকি পর্বতমালার সমান্তরাল ভাবে আলাস্কা পর্যন্ত গিয়াছে। তারপর অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হইয়া এশিয়ার পূর্ব উপকূলে কামচাট্‌কা উপদ্বীপ, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি ও নিউজীল্যাণ্ড দ্বীপ দিয়া কুমেরু মহাদেশের ইরিবাস (Erebus) আগ্নেয়গিরি পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই বলয়কে **প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় বলয়** (Fiery Ring of the Pacific) বলে। এই বলয় হইতে একটি শাখা পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়া সুমাত্রা ও জাভা হইয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

---

* ইউরেনিয়াম (Uranium), থোরিয়াম (Thorium), রেডিয়াম (Radium) প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ (Radio-active Element) নিজ শরীর হইতে তাপ বিকিরণ করে। এই তাপ-বিকিরণের ফলে কখন কখন কোন কোন স্থানে তাপের আধিক্য ঘটে।

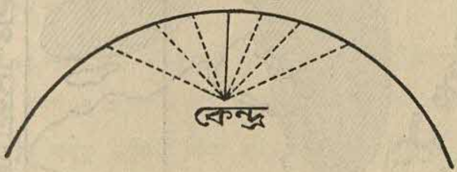

এশিয়া
জাপান
ইউরোপ
আফ্রিকা
অস্ট্রেলিয়া
নিরক্ষরেখা
গ্রীনল্যাণ্ড
উঃ আমেরিকা
দঃ আমেরিকা
আগ্নেয়গিরি মেখলা
মৃত আগ্নেয়গিরি ..... ×
জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ..... •

৬১নং চিত্র

আইস্‌ল্যাণ্ড দ্বীপ হইতে অপর একটি আগ্নেয়গিরি শ্রেণী আয়র্ল্যাণ্ড, অ্যাজোর্‌স্‌ ও কেপ ভার্ড দ্বীপ হইয়া ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার একটি শাখা ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া সিসিলি দ্বীপ হইয়া ককেসস্‌ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত।

অপর একটি ক্ষুদ্র বলয় আফ্রিকার পূর্বাঞ্চল দিয়া মাদাগাস্কার হইয়া কার্গুয়েলেন দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভূমিকম্প—ভূ-অভ্যন্তরস্থ কোন কারণ বশতঃ ভূ-ত্বক সময় সময় কাঁপিয়া উঠে। ইহাকেই আমরা ভূমিকম্প বলি। ভূ-ত্বকের অভ্যন্তরে যে স্থান হইতে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাহাকে ভূমিকম্পের **কেন্দ্র** (Focus) বলে। কেন্দ্রের

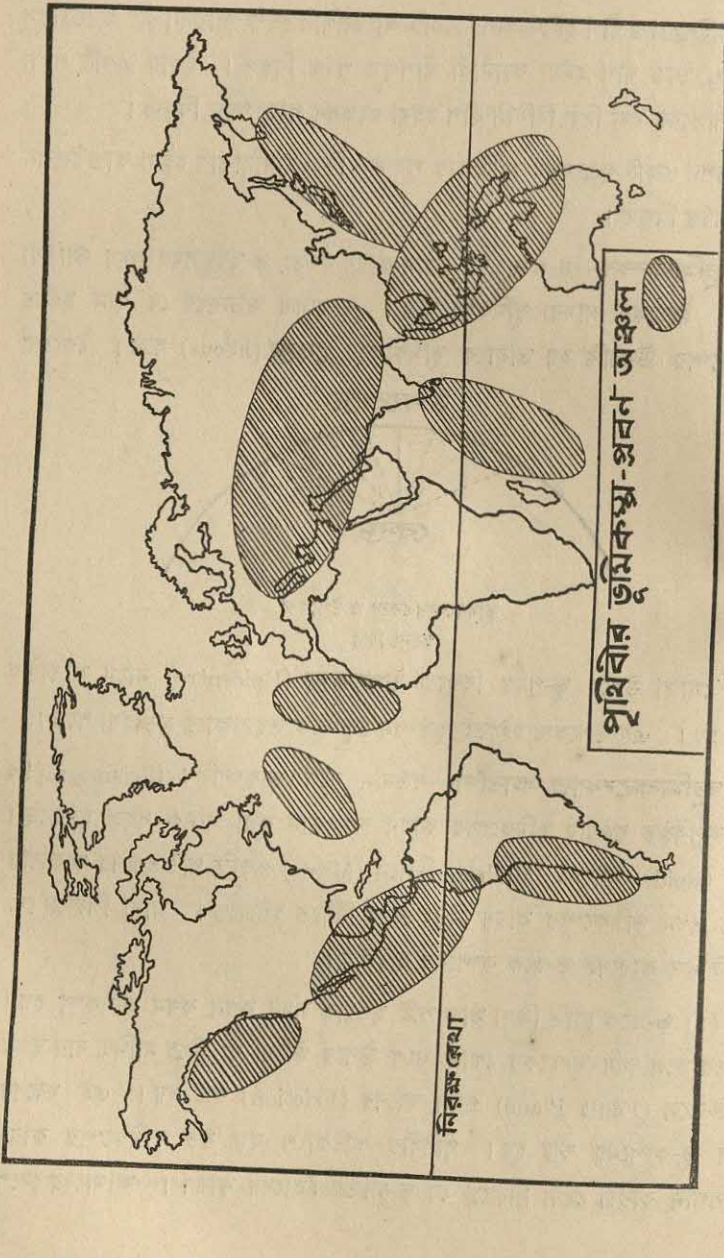


ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র
৭২নং চিত্র

ঠিক সোজা উপরে ভূ-পৃষ্ঠস্থ বিন্দুকে **উপকেন্দ্র** (Epicentre) নামে অভিহিত করা হয়। এই উপকেন্দ্র হইতেই ভূকম্পন চতুর্দিকে তরঙ্গাকারে ছড়াইয়া পড়ে।

ভূমিকম্পের কারণ—বর্তমান যুগে ভূ-কম্পলিখ (Seismograph) যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধান করা অনেক সহজ হইয়াছে। রীড (Reid), ম্যালেট (Mallet), মিল্‌নে (Milne) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে এখন ভূমিকম্পের কারণ নির্ভুলভাবে নির্ণীত হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, নিম্নলিখিত কারণেই ভূ-ত্বকে কম্পনের সৃষ্টি হয়।

(১) ভূ-ত্বকে চ্যুতি কিম্বা ভাঁজ সৃষ্টি হওয়ার সময় কখন কখন ভূমিকম্প হয়। চ্যুতির ফলে যখন ভূ-ত্বকের কোন অংশ উপরে উঠিয়া বা নীচে নামিয়া যায় তখন চ্যুতি-তলে (Fault Plane) প্রবল ঘর্ষণের (Friction) সৃষ্টি হয়। এই ঘর্ষণের ফলে ভূ-কম্পনের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ বড় বড় ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভূ-চ্যুতিই ইহাদের কারণ। আমাদের দেশে



৬নং চিত্র

১৯৩৪ সালের বিহারের ভূমিকম্প এবং ১৯৫০ সালের আসামের ভূমিকম্প এই কারণেই ঘটিয়াছিল।

(২) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় কখন কখন ভূমিকম্প হয়।

(৩) পাহাড়ের ঢালু অংশে বৃষ্টিপাতের ফলে সময় সময় ধ্বস নামে। এই ধ্বস নামার সময়ও কখন কখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। পামীর মালভূমিতে একটি বিশাল ধ্বস নামার ফলে ১৯১১ সালে তুর্কিস্থানে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল। তবে ভূমিকম্পের ফলেও কখন কখন ভূপাত (Land-slide) ঘটে।

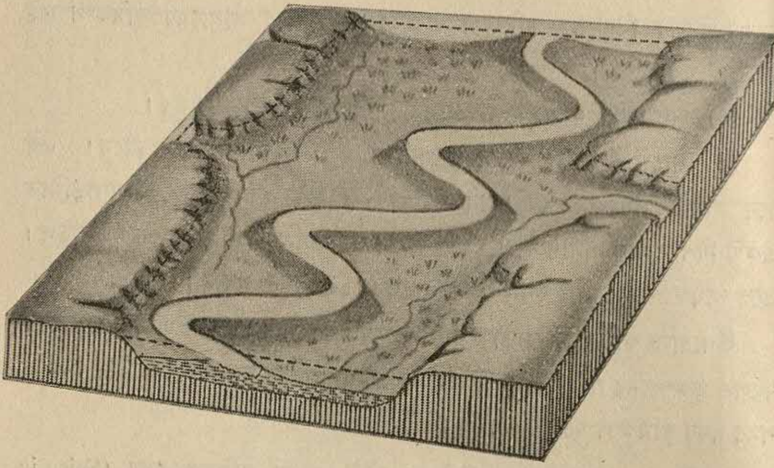
উপরোক্ত কারণগুলি ব্যতীত সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতে এবং হিমানী-সম্প্রপাতের ফলেও ভূকম্পনের সৃষ্টি হইতে পারে। ভূগর্ভস্থ গহ্বরের ছাদ হঠাৎ ধ্বসিয়া গিয়াও সময় সময় ভূমিকম্প ঘটাইতে পারে।

ভূমিকম্প-বলয়—পৃথিবীতে দুইটি প্রধান ভূমিকম্প-বলয় (Seismic Belt) আছে। ইহাদের মধ্যে একটি প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ও অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হইয়া জাপান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। অপরটি আল্পস্ পর্বত হইতে ককেসাস্ ও হিমালয় পর্বত হইয়া পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দুই অঞ্চলেই বেশী ভূমিকম্প হয়। ইহা হইতে দেখা যায় যে আগ্নেয়-বলয় ও ভূমিকম্প-বলয় একই ভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত। (৬১নং ও ৬৩নং চিত্র দেখ)।

নবীন শিলাগঠিত ভঙ্গিল পর্বত অঞ্চলে এখনও পর্বত-সৃষ্টির কার্য বন্ধ হয় নাই। এই অঞ্চলে এখনও ভাঁজের সৃষ্টি হইতেছে এবং শিলাচ্যুতি ঘটিতেছে। তাই এই অঞ্চলগুলি এখনও অধিক ভূমিকম্প-প্রবণ বলা যাইতে পারে।

সমভূমি—সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে অনুচ্চ কিম্বা প্রায় সমতলে অবস্থিত বিস্তৃত সমতলভূমিকে **সমভূমি** বলে। সমভূমি সমুদ্রতল হইতে ক্রমোচ্চ এবং সামান্য উঁচু-নীচুও হইতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার সমভূমি দেখা যায়। উৎপত্তির কারণ অনুযায়ী সমভূমিকে নিম্নোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) **প্লাবন-ভূমি (Flood Plain)**—নদী মধ্য ও নিম্ন গতিতে বন্যাবাহিত



প্লাবন-ভূমি
৬৪নং চিত্র

পলিমাটি উভয় তীরবর্তী ভূভাগে সঞ্চিত করিয়া ক্রমে প্লাবন-ভূমি সৃষ্টি করে। সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।



ইরাবতী নদীর বদ্বীপ—সমভূমি
৬৫নং চিত্র

(২) **বদ্বীপ-সমভূমি (Deltaic Plain)**—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নিম্নগতিতে অনুকূল অবস্থা থাকিলে নদী মোহানার নিকটে ব-দ্বীপ সৃষ্টি করে। এই ব-দ্বীপ প্রায় সমুদ্র-সমতলে অবস্থিত একটি সমভূমি। এইপ্রকার সমভূমিকে আমরা বদ্বীপ-সমভূমি বলি। উদাহরণস্বরূপ বঙ্গদেশের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ এবং মিশরের নীল নদের ব-দ্বীপের সমভূমির নাম করা যাইতে পারে।

(৩) **উপকূল-সমভূমি (Coastal Plain)**—সমুদ্র-উপকূলবর্তী অগভীর অংশ নদী-বাহিত মাটিতে ভরাট হইয়া গেলে অথবা ভূ-আলোড়নের ফলে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিলে সমুদ্র-উপকূলে একটি সঙ্কীর্ণ সমভূমির সৃষ্টি হয়, ইহাকেই উপকূল-সমভূমি বলে। যেমন—করোমণ্ডল উপকূলের সমভূমি, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের সমভূমি।

(৪) **হ্রদ-সমভূমি (Lake Plain)**—নদীবাহিত পলিতে হ্রদ ভরাট হইয়া হ্রদ-সমভূমির সৃষ্টি করে। ক্যানাডার উইনিপেগ (Winnipeg) হ্রদের তীরবর্তী সমভূমির উৎপত্তি এইভাবেই হইয়াছে।



হিমবাহ-সমভূমি ও হিমবাহ-সৃষ্ট হ্রদ
৬৬নং চিত্র

(৫) **হিমবাহ-সমভূমি (Glacial Plain)**—হিমবাহ-বাহিত পাথর-কুচি, কাদা, বালি প্রভৃতি জমিয়া অনেক সময় সমভূমির সৃষ্টি করে। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের উত্তরাংশের সমভূমির অনেক স্থান এইভাবে সৃষ্টি হইয়াছে।

(৬) **লোয়েস্-সমভূমি (Loess Plain)**—বায়ু-তাড়িত লোয়েস্ মৃত্তিকা উত্তর ও মধ্য চীনে লক্ষ লক্ষ বৎসর যাবৎ সঞ্চিত হইয়া লোয়েস্-সমভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্য ইউরোপেও এইরকম সমভূমি কিছুটা আছে।

(৭) **নগ্নীভূত-সমভূমি (Plain of Denudation)**—বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়কার্যের ফলে কোন কোন স্থানে স্থলভাগ প্রায় সমভূমিতে (Peneplain) পরিণত হয়। ফিনল্যাণ্ড ও উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার সুবিস্তীর্ণ সমভূমিকে নগ্নীভূত সমভূমি বলা যাইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

সমুদ্র

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভূ-ত্বকের নিম্নস্থানগুলি জলপূর্ণ হইয়া বিশাল বারি-মণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে। এই বারিমণ্ডল ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ স্থান আবৃত করিয়া আছে। বারিমণ্ডল পাঁচটি মহাসাগরে বিভক্ত।

প্রশান্ত মহাসাগর—মহাসাগরগুলির মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরই বৃহত্তম। ইহা বারিমণ্ডলের প্রায় তিন-অষ্টমাংশ ($\frac{৩}{৮}$) ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহার একদিকে এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া, অপর দিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। নিরক্ষীয় অঞ্চলে এই মহাসাগরের বিস্তৃতি প্রায় ১০,০০০ মাইল। উত্তর দিকে অল্পপরিসর বেরিং প্রণালী প্রশান্ত মহাসাগরকে সুমেরু মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। দক্ষিণে ইহা প্রায় ৪০° দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল মহাসাগরের গভীরতা সর্বত্র সমান নয়; তবে ইহার গড় গভীরতা প্রায় ২১,০০০ ফুট। ফিজি দ্বীপের নিকটে

ইহার গভীরতা প্রায় ১৮,০০০ ফুট। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা সর্বাপেক্ষা অধিক (প্রায় ৩৫,৪৩৩ ফুট)।

আটলান্টিক মহাসাগর—আয়তন হিসাবে প্রশান্ত মহাসাগরের পরেই আটলান্টিক মহাসাগরের স্থান। ইহা বারিমণ্ডলের প্রায় এক-চতুর্থাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব তীরে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ এবং পশ্চিম তীরে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা অবস্থিত। এই মহাসাগরের গড় বিস্তৃতি প্রায় ৩,৬০০ মাইল। উত্তর-দক্ষিণে ইহা সুমেরুবৃত্ত হইতে ৪০° দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি সিন্ধুশৈল বা অন্তঃসাগরীয় পর্বত (Submarine Ridge) আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যভাগ দিয়া উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহার উত্তরাংশ ডলফিন রিজ্ (Dolphin Ridge) এবং দক্ষিণাংশ চ্যালেঞ্জার রাইজ (Challenger Rise) নামে পরিচিত। আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতা গড়ে প্রায় ১৮,০০০ ফুট ; তবে ইহার গভীরতম অংশ (পোর্টোরিকোর নিকটে) ৫ মাইলের চেয়েও অধিক গভীর।

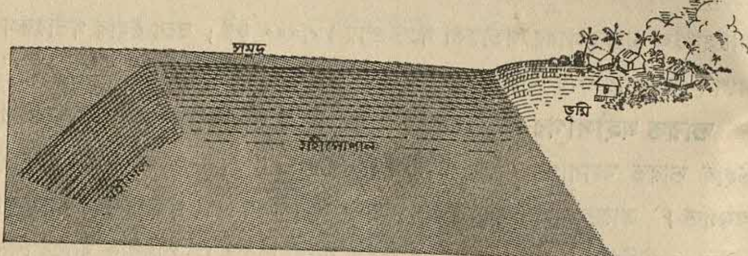
ভারত মহাসাগর—ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে যে বিশাল জলভাগ অবস্থিত উহাই ভারত মহাসাগর নামে পরিচিত। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর ইহারই অন্তর্গত। ভারত মহাসাগর দক্ষিণে কুমেরু মহাসাগর এবং পূর্ব-পশ্চিমে আফ্রিকা হইতে অষ্ট্রেলিয়া ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। পৃথিবীর বারিরাশির প্রায় এক-অষ্টমাংশ স্থান ব্যাপিয়া ভারত মহাসাগর বিস্তৃত। ইহা কতকটা গোলাকার এবং প্রায় ৬,০০০ মাইল চওড়া। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর হইতে ইহার গভীরতা অনেক কম। ইহার গড় গভীরতা প্রায় ১৫,০০০ ফুট।

সুমেরু মহাসাগর—উত্তর মেরুর চতুর্দিক ব্যাপিয়া সুমেরু মহাসাগর অবস্থিত। ইহা প্রায় ২,৫০০ মাইল চওড়া এবং ৭,০০০ ফুট গভীর।

কুমেরু মহাসাগর—কুমেরু মহাসাগর ৪০° দঃ অক্ষরেখা হইতে কুমেরু মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মহাসাগর সম্পর্কিত সকল তথ্য এখনও জানা যায় নাই। গভীরতাও সঠিকভাবে স্থির হয় নাই। মোটামুটি হিসাবে এই মহাসাগরের গভীরতা ৪,৫০০ ফুট ধরা যাইতে পারে।

মহাসাগর	আয়তন
প্রশান্ত মহাসাগর	—৬৭,৭০০,০০০ বর্গমাইল।
আটলান্টিক মহাসাগর	—৩৪,৩০০,০০০ ”
ভারত মহাসাগর	—২৭,৭০০,০০০ ”
*সুমেরু মহাসাগর	—৫,৫০০,০০০ বর্গমাইল।
*কুমেরু মহাসাগর	—৫,৭০০,০০০ বর্গমাইল।

সমুদ্রের তটরেখাকেই আমরা মহাদেশ ও মহাসাগরের সীমারেখা বলি। সমুদ্রতীরে গেলে তোমরা দেখিতে পাইবে যে, তটরেখা হইতেই সমুদ্র হঠাৎ গভীর হইয়া যায় নাই। তীরভূমি খুব ধীরে ধীরে ঢালু হইয়া সমুদ্রের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্রের এই অংশের গভীরতা ৬০০ ফুটের অধিক হয় না। এই অগভীর সমুদ্রতল প্রকৃতপক্ষে মহাদেশেরই নিমজ্জিত অংশ। ইহাকে আমরা **মহীসোপান** (Continental shelf) বলি। কখন কখন মহীসোপান তটরেখা হইতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। মহীসোপানের শেষ প্রান্তেই সমুদ্র হঠাৎ



মহীঢাল ও মহীসোপান

৬৭নং চিত্র

গভীর হইয়া যায়। এই স্থানেই মহাদেশের নিমজ্জিত অংশ হঠাৎ ঢালু হইয়া গভীর সমুদ্রতলে মিশিয়া যায়। এই ঢালু অংশকে **মহীঢাল** (Continental slope) বলে।

মহীঢালই মহাদেশের প্রান্ত সীমা। ইহার পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রতল আরম্ভ হয়। সমুদ্রের এই অংশ গভীর (২৷৩ মাইল) এবং স্থলভাগের মতই সমতল কিম্বা সামান্য উঁচু নীচু। ইহাকে **গভীর সমুদ্রতল** (Deep Sea plain) বলা যাইতে পারে। সমুদ্রতলের কোথাও কোথাও নদীখাতের মত গভীর অংশ

* এই দুই মহাসাগরের আয়তন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে।

(গভীরতা ২৫,০০০ ফুটেরও অধিক) আছে। এই সকল গভীর অংশকে **সমুদ্রখাত** (Ocean deep) নামে অভিহিত করা যায়।

সমুদ্রের অবক্ষেপণ (Ocean deposits)—জলস্রোত বাহিত কাদা, বালি, মাটি, পলি প্রভৃতি অগভীর মহীসোপানে শত শত বৎসর যাবৎ সঞ্চিত হইয়া পাললিক শিলার সৃষ্টি করিতেছে। গভীর সমুদ্র পর্যন্ত নদীবাহিত পলি পৌঁছিতে পারে না। সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ জমিয়া তথায় **সিন্ধুমল** (Ooze) সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত ছাই ভস্ম প্রভৃতি গভীর সমুদ্রে ক্রমাগত সঞ্চিত হইতেছে। ইহা হইতেই সমুদ্রের লাল কাদার উৎপত্তি হয়।

সামুদ্রিক জীব—সমুদ্রে অতি বৃহৎ তিমি, সিন্ধুঘোটক হইতে আরম্ভ করিয়া হাঙ্গর, স্পঞ্জ, মৎস্য, প্রবালকীট প্রভৃতি ক্ষুদ্রবৃহৎ অসংখ্য প্রাণী এবং নানা জাতীয় উদ্ভিদ রহিয়াছে।

সমুদ্রজলের লবণতা (Salinity of Sea-water)—সমুদ্র-জল বিস্বাদ লাগে, কারণ সমুদ্রজলে নানাপ্রকার লবণ দ্রব অবস্থায় আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সমুদ্রজলের ওজনের শতকরা ৩.৫ ভাগই লবণ। এই ৩.৫ ভাগের মধ্যে আবার ২.৭ ভাগ সাধারণ লবণ (Sodium Chloride) যাহা আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিয়া থাকি। অবশিষ্ট নানা জাতীয় খনিজ লবণ। সমুদ্র-জলে এত লবণ কোথা হইতে আসিল সে প্রশ্ন তোমাদের মনে আসিতে পারে। লবণতার কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মত এই যে—সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় যখন সমুদ্রের উৎপত্তি হয় তখন ভূ-ত্বকের লবণ-জাতীয় বহু উপাদান গলিয়া সমুদ্রজলের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। সৃষ্টির পর হইতে যতই দিন যাইতেছে ততই সমুদ্রজলের লবণতা বৃদ্ধি পাইতেছে। নদী, নালা, জলস্রোত প্রভৃতি ভূ-পৃষ্ঠ ধৌত করিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। এই সকল জলস্রোতের সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠের লবণও দ্রব অবস্থায় সমুদ্রে চলিয়া যাইতেছে। আবার সমুদ্রজল বাষ্প হইয়া ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি ও তুষাররূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইতেছে, কিন্তু লবণ সমুদ্রে থাকিয়া যাইতেছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর যাবৎ এইভাবে লবণ সঞ্চিত হইয়া সমুদ্রজল লবণাক্ত এবং বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে।

সমুদ্রজল অবশ্য সকল স্থানে সমান লবণাক্ত নহে। ইহার কারণ নদী-বাহিত স্বাদুজল ও বৃষ্টির পরিমাণ এবং বাষ্পীভবনের পরিমাণের উপরই সমুদ্রজলের লবণতা নির্ভর করে।

(১) ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রে প্রচুর উত্তাপ ও সূর্যালোকের জন্য বাষ্পীভবন বেশী হয়, তাই এই সকল অঞ্চলের সমুদ্রজল অধিক লবণাক্ত।

(২) উচ্চ অক্ষাংশে এবং মেরু প্রদেশে শীতের জন্য বাষ্পীভবন কম হয়, তাই তথায় সমুদ্রজল কম লবণাক্ত।

(৩) প্রায় চারিদিকে স্থলবেষ্টিত সমুদ্রে পতিত নদীর সংখ্যা যদি কম হয় তবে ঐ সমুদ্রের জল অধিক লবণাক্ত হয়। যেমন—ভূমধ্যসাগর। নদী যদি এই সকল সমুদ্রে অধিক স্বাদু জল লইয়া আসে তবে ইহাদের জল কম লবণাক্ত হয়। যেমন—বাল্টিক সাগর, কৃষ্ণ সাগর ইত্যাদি।

(৪) নিরক্ষীয় অঞ্চল উষ্ণ এবং তথায় বাষ্পীভবন বেশী হয়, কিন্তু পরিচলন বায়ুপ্রবাহ হেতু নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রচুর বারিপাত হয় বলিয়া তথায় সমুদ্রজল বেশী লবণাক্ত হইতে পারে না।

(৫) আমাজন, কঙ্গো, নাইজার প্রভৃতি বিশালকায় নদী প্রচুর স্বাদু জল সমুদ্রে লইয়া আসে, তাই এই সকল নদীর মোহানার নিকটবর্তী সমুদ্রজলের লবণতা কম থাকে।

সমুদ্রজলের উষ্ণতা—সমুদ্রের উপরিভাগের জলের উষ্ণতা উহার অবস্থান, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত, ঋতুভেদ এবং দিনরাত্রিভেদের উপর নির্ভর করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উষ্ণতা প্রায় ৮০° ফাঃ। তথা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে উষ্ণতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। মেরু প্রদেশে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উষ্ণতা প্রায় ২৮° ফাঃ। সাধারণতঃ সমুদ্র-পৃষ্ঠের উষ্ণতা বেশী, নিম্নে উষ্ণতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে।

সমুদ্রজল ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়। বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত ও সমুদ্রতরঙ্গে উহা সর্বদা আলোড়িত হইতেছে। তাই ঋতুভেদে ও দিবারাত্রিভেদে উত্তাপের পার্থক্য অধিক হইতে পারে না।

সমুদ্রজলের ঘনত্ব (Density of Sea-water)—পূর্বেই বলিয়াছি, সমুদ্রজলে নানাজাতীয় লবণ দ্রব অবস্থায় আছে। এইজন্য সমুদ্রজল স্বাদু জল অপেক্ষা অধিক ভারী। জলে লবণের পরিমাণ যত বেশী হয় জল তত অধিক ঘন হয়। একই পরিমাণ লবণাক্ত উষ্ণ জল অপেক্ষা শীতল জল অধিক ঘন হয়। আবার অধিক লবণাক্ত উষ্ণ জল অপেক্ষা কম লবণাক্ত শীতল জল বেশী ঘন হইতে পারে। সমুদ্রের উপরিভাগের জল অপেক্ষা নিম্নভাগের জল অধিক ঘন।



0°
আফ্রিকা

সমুদ্রস্রোত—নিয়মিতভাবে সমুদ্রের উপরিভাগের জল একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হইলে তাহাকে সমুদ্রস্রোত বলে। নিম্নলিখিত কারণে সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(১) **উষ্ণতা**—নিরক্ষীয় অঞ্চলে অধিক উত্তাপের ফলে সমুদ্রজল উষ্ণ ও লঘু হয়, তখন উহা উষ্ণ বহিঃস্রোত বা পৃষ্ঠস্রোত (Surface Current)-রূপে মেরু অঞ্চলের শীতল সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। মেরু অঞ্চলের শীতল ঘন জল নিরক্ষীয় অঞ্চলের শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য নিম্নভাগ দিয়া অন্তঃস্রোত (Under-current)-রূপে নিরক্ষ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এইজন্য উষ্ণ সমুদ্র হইতে শীতল সমুদ্রের দিকে উষ্ণ বহিঃস্রোত এবং শীতল সমুদ্র হইতে উষ্ণ সমুদ্রের দিকে শীতল অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হয়।

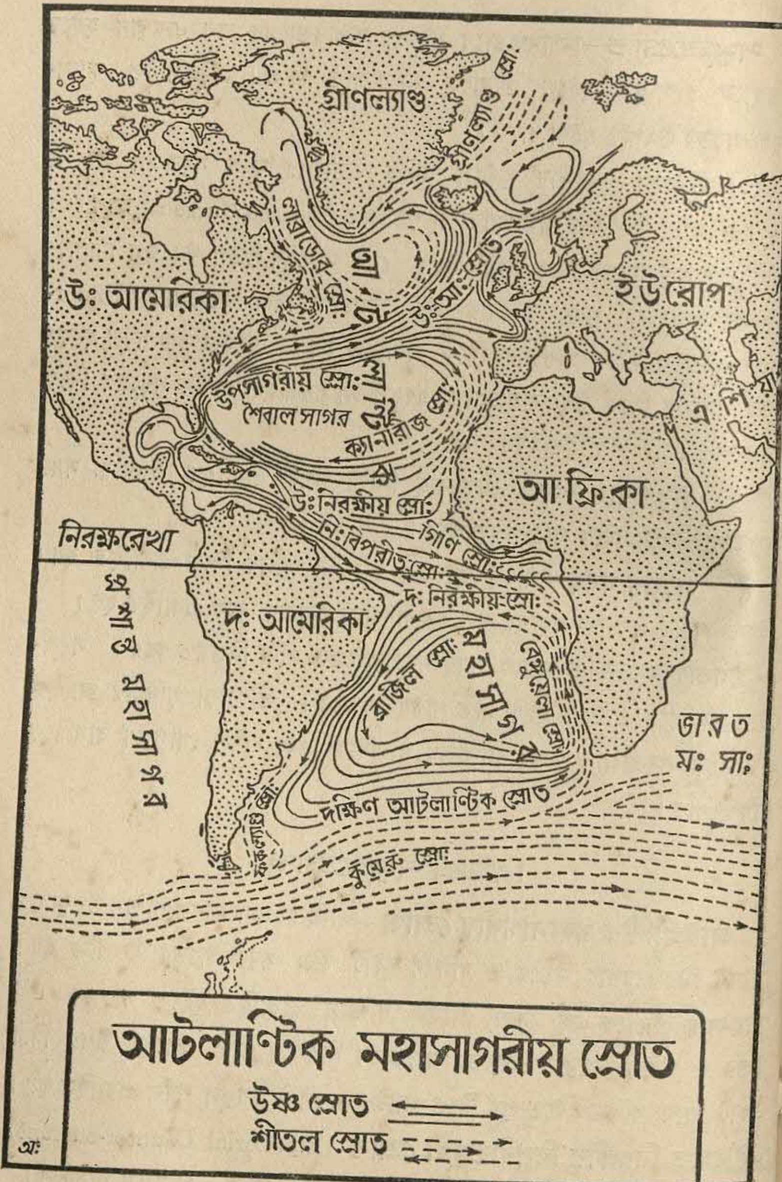
(২) **বায়ুপ্রবাহ**—প্রবল নিয়তবায়ু নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় সমুদ্রজলকেও সেইদিকে পরিচালিত করে।

(৩) **জলের ঘনত্ব**—অধিক ঘন জল কম ঘন জলের দিকে প্রবাহিত হয়। এইজন্য অধিক লবণাক্ত সমুদ্রের জল কম লবণাক্ত সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়।

স্থলভাগের আকৃতি অনেক সময় সমুদ্রস্রোতের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। সমুদ্র-স্রোত স্থলভাগে প্রতিহত হইয়া গতি পরিবর্তন করে। তা'ছাড়া পৃথিবীর আহ্নিক গতি হেতু সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বাঁকিয়া যায়।

বিভিন্ন সমুদ্রস্রোত

আটলাণ্টিক মহাসাগরীয় স্রোত—আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলের নিকটে নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তি হয়। আয়নবায়ু প্রভাবে এই উভয় স্রোতই পশ্চিমে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্যভাগে নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ের উপর দিয়া একটি স্রোত পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে আফ্রিকার গিনি উপকূল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। এই স্রোত **নিরক্ষীয় বিপরীতমুখী স্রোত** (Equatorial Counter-current) এবং গিনি উপকূলের নিকট **গিনি স্রোত** (Guinea Current) নামে পরিচিত।


গ্রীণল্যাণ্ড
উঃ আমেরিকা
ইউরোপ
এশিয়া
আফ্রিকা
নিরক্ষরেখা
দঃ আমেরিকা
প্রশান্ত মহাসাগর
ভারত মঃ সাঃ
উপসাগরীয় স্রোঃ
শৈবাল সাগর
ক্যানারীজ স্রোঃ
উঃ নিরক্ষীয় স্রোঃ
নিঃ বিপরীত স্রোঃ
গিণি স্রোঃ
দঃ নিরক্ষীয় স্রোঃ
ব্রাজিল স্রোঃ
বেঙ্গুয়েলা স্রোঃ
দক্ষিণ আটলাণ্টিক স্রোত
কুমেরু স্রোঃ
আটলাণ্টিক মহাসাগরীয় স্রোত
উষ্ণ স্রোত
শীতল স্রোত

৬৮নং চিত্র

দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত (South Equatorial Current)—পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্বে সেণ্ট্ রক অন্তরীপে প্রতিহত হইয়া দুই শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা ব্রাজিলের পূর্ব দিক দিয়া **ব্রাজিল স্রোত** নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া ৪০° দঃ অক্ষরেখার নিকটে শীতল কুমেরু স্রোতের সহিত মিলিত হয়। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের অপর শাখা দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নিকটে **উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের** সহিত মিলিত হয়।

উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের কিয়দংশ তখন দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত ক্যারেবিয়ান সাগরের উপর দিয়া মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে। অতঃপর মেক্সিকো উপকূল ঘুরিয়া ফ্লোরিডা প্রণালীর ভিতর দিয়া আসিয়া উহা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের নিকট দিয়া উত্তর-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়। ইহাই বিখ্যাত **উপসাগরীয় স্রোত** (Gulf Stream)। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের অধিকাংশ কিউবার উত্তর-পূর্ব দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া ফ্লোরিডার নিকটে উপসাগরীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে। ফ্লোরিডা উপদ্বীপের নিকটে উপসাগরীয় স্রোতের বিস্তার প্রায় ৪০ মাইল, গভীরতা ৩,০০০ ফুট, স্রোতের বেগ ঘণ্টায় ৫ মাইল এবং জলের উষ্ণতা ৮৫° ফাঃ। আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যভাগে উপসাগরীয় স্রোতের বিস্তার বাড়িয়া গিয়া প্রায় ৩০০ মাইলে পরিণত হয়। উত্তর-পূর্ব দিকে ৪০° উঃ অক্ষরেখার নিকটে পৌছিলে উপসাগরীয় স্রোত পশ্চিমা বায়ুর তাড়নায় আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে আরম্ভ করে; কিন্তু মধ্য আটলাণ্টিক পর্যন্ত আসিয়াই উহা তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক শাখা উত্তর দিক দিয়া আইস্ল্যাণ্ডের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলের দিকে প্রবাহিত হয়। দ্বিতীয় শাখা বরাবর উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া নরওয়ের উপকূল পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। উপসাগরীয় স্রোতের এই শাখাটিকে **উত্তর আটলাণ্টিক স্রোত** (North Atlantic Drift) বলা হয়। তৃতীয় শাখা **ক্যানারীজ স্রোত** (Canaries Current) নামে পর্তুগাল ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সকল সমুদ্রস্রোত মধ্যভাগে একটি জলাবর্তের সৃষ্টি করে। এই

জলাবর্ত (Swirl) স্রোতহীন ; তাই এখানে শেওলা, উদ্ভিদ্ ও নানা জঞ্জাল জমিয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে **শৈবাল সাগর** (Sargasso Sea) বলা হয়।

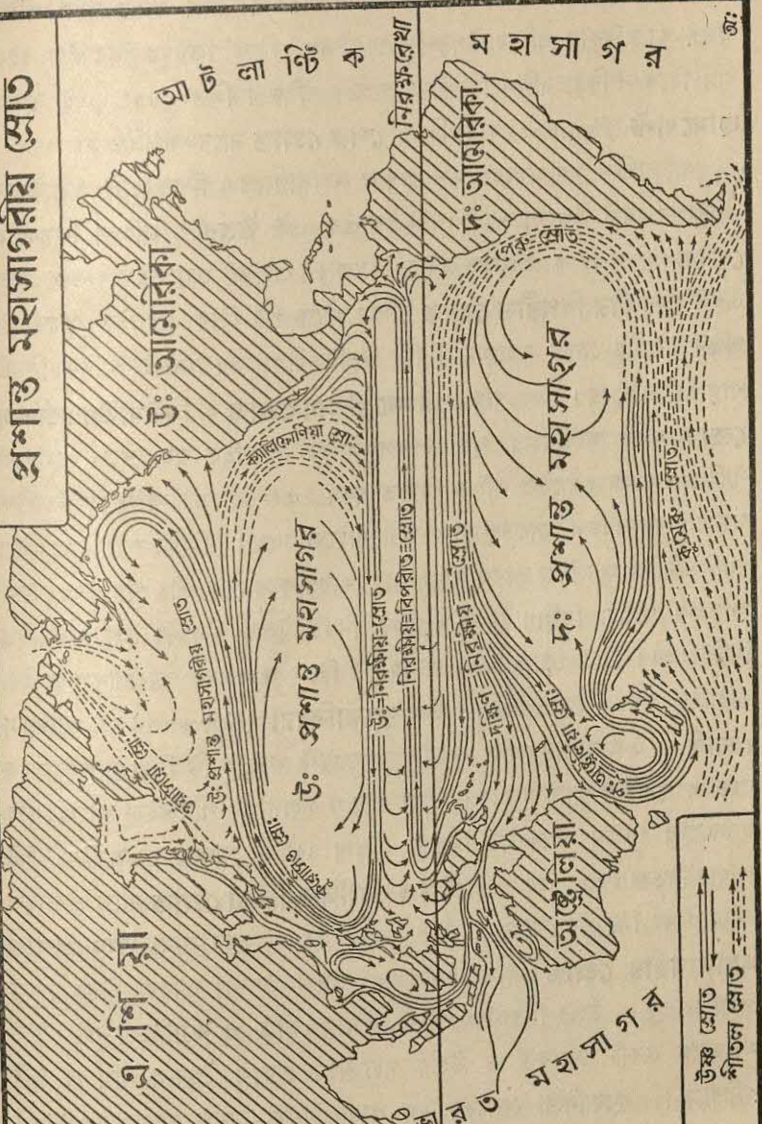
সুমেরু মহাসাগর হইতে দুইটি শীতল স্রোত গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া গ্রীনল্যাণ্ডের দক্ষিণে লাব্রাডোর উপদ্বীপের নিকটে মিলিত হয়। এই মিলিত শীতল স্রোত তখন **লাব্রাডোর স্রোত** নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকটে উহা উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। লাব্রাডোর স্রোতের একাংশ তখন উপসাগরীয় স্রোতের নিম্নদিক দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে এবং অপরাংশ উপসাগরীয় স্রোতের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলের দিকে চলিয়া যায়। এই শীতল ও উষ্ণ স্রোতের সীমারেখায় প্রাচীরের মত তুহিন জমিয়া থাকে। ইহা **হিমপ্রাচীর** (Cold Wall) নামে পরিচিত।

কুমেরু মহাসাগরে একটি শীতল **কুমেরু স্রোতের** উৎপত্তি হয়। পশ্চিমা-বায়ুর প্রভাবে উহা পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত আসে। তখন উহা **বেঙ্গুয়েলা স্রোত** (Benguela Current) নামে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল দিয়া প্রবাহিত হয়। অবশেষে আয়নবায়ু প্রভাবে বাঁকিয়া গিয়া উহা দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশে। কুমেরু মহাসাগর হইতে একটি শীতল স্রোত ফক্ল্যাণ্ড ও টিয়ারাডেল ফিউগোর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রাজিল স্রোতের সহিত মিলিত হয়। ইহাকে **ফক্ল্যাণ্ড স্রোত** বলে।

শীতল লাব্রাডোর স্রোতের জন্য প্রায় সারা শীতকালই লাব্রাডোর উপকূল বরফাচ্ছন্ন থাকে ; কিন্তু উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও পশ্চিম ইউরোপের জলবায়ু শীতকালেও উষ্ণ থাকে। সমুদ্রের উত্তাপ শীতকালেও উষ্ণ থাকে, হিমাঙ্কের নীচে নামে না।

লাব্রাডোর স্রোতের সঙ্গে বহু হিমশৈল চলিয়া আসে। উপসাগরীয় স্রোতের সংস্পর্শে আসিয়া নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপের নিকট ঐগুলি গলিতে আরম্ভ করে। হিমশৈল-বাহিত মৃত্তিকা, পাথর প্রভৃতি জমিয়া তথায় মগ্ন চড়ার সৃষ্টি করিয়াছে। শীতল ও উষ্ণ স্রোতের মিলনস্থানের সন্নিকটে সমুদ্র সকল সময় কুয়াসাচ্ছন্ন থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কুমেরু মহাসাগর হইতে শীতল কুমেরু স্রোত পশ্চিমা বায়ুর তাড়নায় পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইতে


প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত
উঃ আমেরিকা
আ ট লা ন্টি ক
নিরক্ষরেখা
ম হা সা গ র
দঃ আমেরিকা
পেরু স্রোত
দঃ প্রশান্ত মহাসাগর
ক্যালিফোর্ণিয়া স্রো:
উঃ প্রশান্ত মহাসাগর
উঃ নিরক্ষীয় স্রোত
নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত
দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত
উঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত
কুমেরু স্রোত
অস্ট্রেলিয়া
এ শি য়া
ভা র ত ম হা সা গ র
উষ্ণ স্রোত
শীতল স্রোত

৩৩নং চিত্র

থাকে। এই স্রোতের কিয়দংশ দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে বাধা পাইয়া দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়া উত্তর দিকে কিছুদূর প্রবাহিত হইয়া বাম দিকে বাঁকিয়া দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। এই স্রোত **হ্যামবোল্ট** (Hambolt) বা **চিলি** বা **পেরু স্রোত** নামে অভিহিত হয়।

আটলান্টিক মহাসাগরের মত প্রশান্ত মহাসাগরেরও নিরক্ষবৃত্তের অল্প উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি উষ্ণস্রোতের উৎপত্তি হয় এবং এই **উত্তর** ও **দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত** পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই দুই স্রোতের মধ্যভাগ দিয়া একটি **নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত** পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত সলোমন, ফিজি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের নিকটে আসিয়া তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা **পূর্ব অষ্ট্রেলিয়া স্রোত** বা **নিউসাউথওয়েলস্ স্রোত** নামে অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল বাহিয়া প্রবাহিত হয়, পরে বামদিকে বাঁকিয়া কুমেরু স্রোতের সহিত মিলিত হয়। এই স্রোতের সহিত আটলান্টিক মহাসাগরের ব্রাজিল স্রোতের তুলনা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় শাখা অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির মধ্য দিয়া ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে। তৃতীয় শাখা নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নিকট উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। এই স্রোত তখন উত্তর-পূর্ব দিকে জাপানের পূর্ব-উপকূল বাহিয়া প্রবাহিত হয়। ইহাই বিখ্যাত উষ্ণ **কুরোসিয়ো** (Kurosiwo) বা **জাপান স্রোত**। এই জাপান স্রোত ৪০° উঃ অক্ষরেখার কাছাকাছি গিয়া পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে পূর্বদিকে বাঁকিয়া যায়। ইহা প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের নিকটে (প্রায় ৪৫° উঃ অক্ষরেখা) আসিয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা **শীতল ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত** নামে প্রবাহিত হইয়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। অপর শাখা **উষ্ণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত** নামে ক্যানাডার পশ্চিম উপকূল বাহিয়া উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত, জাপান স্রোত ও ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত মধ্যভাগে একটি জলাবর্ত ও উহার মধ্যভাগে প্রকাণ্ড শৈবাল সাগরের সৃষ্টি করিয়াছে। কুরোসিয়ো স্রোতের এক শাখা টুসিমা স্রোত নামে (Tushima Current) কিউস্যু ও সিকোকু দ্বীপের পশ্চিম উপকূল দিয়া জাপান সাগরের দিকে

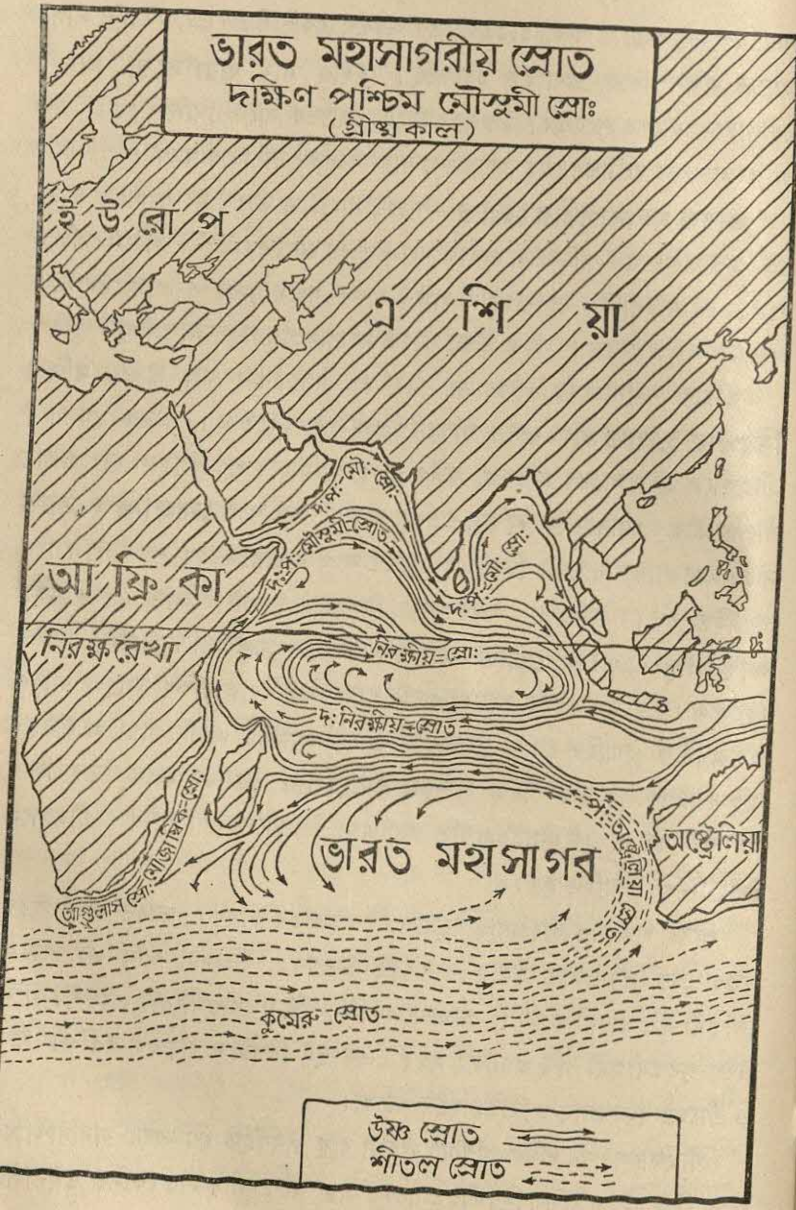
প্রবাহিত হইতেছে। লাব্রাডোর স্রোতের অনুরূপ একটি শীতল স্রোত বেরিং সাগর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার নাম **ওয়াসিয়ো** স্রোত। হোক্কাইডো দ্বীপের পূর্বে ইহা উষ্ণ কুরোসিয়ো স্রোতের সহিত মিলিত হয়। উষ্ণ ও শীতল বায়ুর সংমিশ্রণ হেতু এই অঞ্চল সারা বৎসর কুয়াসাচ্ছন্ন থাকে।

ভারত মহাসাগরীয় স্রোত—পার্শ্বের মানচিত্রে ভারত মহাসাগরের সমুদ্র-স্রোতের সহিত আটলান্টিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের স্রোতের তুলনা করিলে দেখিতে পাইবে যে আটলান্টিক মহাসাগর ও দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের সমুদ্রস্রোতের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উত্তর ভারত মহাসাগরের সমুদ্রস্রোত সম্পূর্ণ পৃথক।

ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে ২০° দঃ অক্ষরেখার অল্প উত্তরে **দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত** পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে এই স্রোতের গতিবেগ অধিক হয়। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মাদাগাস্কার দ্বীপের উত্তরে আসিয়া ইহা দক্ষিণে বাঁকিয়া যায়। এক অংশ **মোজাম্বিক স্রোত** নামে মোজাম্বিক প্রণালী দিয়া এবং অপর অংশ মাদাগাস্কারের পূর্ব উপকূল দিয়া প্রবাহিত হয়। উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে এই দুই স্রোত একত্র হইয়া **আগুলাস্** (Agulhas) **স্রোত** নামে দক্ষিণ দিকে কুমেরু স্রোতের সহিত মিলিত হইতেছে। কুমেরু স্রোত হইতে একটি শাখা অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূল বাহিয়া পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। কুমেরু স্রোত হইতে অপর একটি শাখা অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলের নিকট দিয়া **পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া স্রোত** নামে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। এই স্রোতের গতি অল্প এবং শীতকালে উহা দক্ষিণ ও গ্রীষ্মকালে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রস্রোতের অন্যতম কারণ। ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশের সমুদ্রস্রোত ইহার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। তোমরা জান এই অঞ্চলে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এবং শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এই দুই বিপরীত বায়ুপ্রবাহের জন্য শীত ও গ্রীষ্মের সমুদ্রস্রোতও বিভিন্ন হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে যখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় তখন মাদাগাস্কারের উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের এক অংশ আফ্রিকার কেনিয়া ও ইতালীয়


ভারত মহাসাগরীয় স্রোত
দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী স্রোঃ
(গ্রীষ্ম কাল)
ই উ রো প
এ শি য়া
আ ফ্রি কা
নিরক্ষরেখা
দ: প: মৌ: স্রোঃ
দ: প: মৌসুমী স্রোত
নিরক্ষীয় স্রো:
দ: নিরক্ষীয় স্রোত
মোজাম্বিক স্রো:
আগুলাস স্রো:
প: অষ্ট্রেলিয়া
ভারত মহাসাগর
অষ্ট্রেলিয়া
কুমেরু স্রোত
উষ্ণ স্রোত
শীতল স্রোত

৭০নং চিত্র


ভারত মহাসাগরীয় স্রোত
উত্তর-পূর্ব মৌসুমী স্রোঃ
(শীতকাল)
ইউরোপ
এশিয়া
আফ্রিকা
নিরক্ষরেখা
উঃ পূঃ মৌঃ স্রোঃ
উঃ পূঃ মৌসুমী স্রোত
উঃ পূঃ মৌঃ স্রোঃ
নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোঃ
নিরক্ষীয় স্রোত
মোজাম্বিক স্রোঃ
আগুলাস স্রোঃ
ভারত মহাসাগর
অষ্ট্রেলিয়া
কুমেরু স্রোত
উষ্ণ স্রোত
শীতল স্রোত

৭১নং চিত্র

সোমালিল্যাণ্ডের উপকূল বাহিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। তারপর এই স্রোত এডেন উপসাগর দিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছে। তথা হইতে পশ্চিম উপকূল বাহিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। কুমারিকা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া উহা পূর্ব উপকূল দিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে চলিতে থাকে, তারপর ব্রহ্মদেশের উপকূল হইতে উহা দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া প্রশান্ত মহাসাগর হইতে যে স্রোত ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে তাহার সহিত মিলিত হয়। এই স্রোতকে **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী স্রোত** বলে। এই সময় নিরক্ষীয় অঞ্চলে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে একটি স্রোত প্রবাহিত হয়। ইহাকে **নিরক্ষীয় স্রোত** বলা যাইতে পারে।

শীতকালে ব্রহ্মদেশের উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া একটি স্রোত ভারতের উপকূল দিয়া প্রবাহিত হয়। তারপর ইহা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হইয়া নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোতের সহিত মিশিয়া যায়। এই স্রোত **উত্তর-পূর্ব মৌসুমী স্রোত** নামে পরিচিত। এই সময় **উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত** ও **নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোতের**ও (প্রায় ৭° দঃ অক্ষরেখার নিকটে) উৎপত্তি হয়।

সমুদ্রস্রোতের প্রভাব—(১) সমুদ্রস্রোতের জন্য স্রোতের অনুকূলে জাহাজ চালাইবার সুবিধা হয়।

(২) সমুদ্র উপকূলের স্থানগুলির জলবায়ুর উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব খুব বেশী। শীতল স্রোত উপকূলের উত্তাপের হ্রাস করে এবং উষ্ণ স্রোত উত্তাপ বৃদ্ধি করে। শীতল লাব্রাডোর স্রোতের প্রভাবে উত্তর আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদী ও মোহানা বৎসরের নয় মাসই বরফে আবৃত থাকে; কিন্তু উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাব হেতু একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে কখনও বরফ জমিয়া জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। এই একই কারণে নরওয়ের উপকূল সারা বৎসর বরফমুক্ত থাকে।

(৩) উষ্ণ স্রোতের উপরিভাগের বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকে। তাই উষ্ণ স্রোতের উপর দিয়া বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হইলে অধিক বৃষ্টি ঘটায়। অপরপক্ষে শীতল স্রোতের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু শুষ্ক হয়।

(৪) শীতল ও উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের মিলনস্থান সর্বদা ঘন কুয়াসাবৃত থাকে। এইজন্য নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড ও জাপানের হোক্কাইডোর নিকট সব সময় কুয়াসা জমিয়া থাকে।

জোয়ার-ভাঁটা—কলিকাতার গঙ্গায় জলের যে হ্রাসবৃদ্ধি হয় তাহা তোমরা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। কয়েক ঘণ্টা যাবৎ গঙ্গার জল বাড়িতে

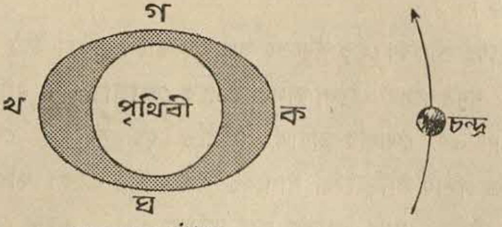
থাকে আবার কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া জল কমিতে থাকে। গঙ্গার জলের এই হ্রাস-বৃদ্ধিকে আমরা গঙ্গার জোয়ার-ভাঁটা বলিয়া থাকি। কেন এই জোয়ার-ভাঁটা হয় ? জোয়ারের জল কোথা হইতে আসে ? এ সকল প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক।

চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ হেতু সমুদ্রের জল এক স্থানে ফুলিয়া উঠে ও অন্য স্থানে নামিয়া যায়। সমুদ্রজলের এইরূপ ফুলিয়া উঠাকে **জোয়ার** এবং নামিয়া যাওয়াকে **ভাঁটা** বলে। এই জোয়ার-ভাঁটার উৎপত্তি হয় সমুদ্রে। জোয়ারের সময় মোহানা হইতে গঙ্গার ফাঁড়ি দিয়া সাগরের জল গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া জোয়ারের সৃষ্টি করে। ভাঁটার সময় সমুদ্রের জল নামিয়া যায়। এজন্য জোয়ারের সময় প্রবিষ্ট জলও গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তাই গঙ্গার জল কমিয়া যায়। ইহাই গঙ্গার **ভাঁটা**।

জোয়ার-ভাঁটার কারণ—আকাশের জ্যোতিষ্কগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করে। চন্দ্র এবং সূর্যও সব সময় পৃথিবীকে এবং পৃথিবীর সকল পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে। সূর্য পৃথিবী হইতে বহুদূরে এবং চন্দ্র খুব নিকটে আছে বলিয়া পৃথিবীর উপর সূর্য অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণই বেশী। এজন্য জোয়ার-ভাঁটার উপর চন্দ্রের প্রভাবই অধিক থাকে।

মনে কর পৃথিবীপৃষ্ঠের সর্বত্র সমান জলরাশিদ্বারা আবৃত আছে। পর পৃষ্ঠার চিত্রে, মনে কর, পৃথিবীপৃষ্ঠের **ক** স্থান চন্দ্রের দিকে আছে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে উহা চন্দ্রের নিকটবর্তী, তাই **ক** স্থানে চন্দ্রের আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশী। তরল বা জলীয় পদার্থের অণুগুলি শিথিলভাবে সংযুক্ত থাকে, তাই চন্দ্রের আকর্ষণ হেতু **ক** স্থানে জল ফুলিয়া উঠে। **গ** ও **ঘ** স্থান হইতে জল তখন **ক** স্থানের দিকে ধাবিত হয়। ইহাকে **নিকটবর্তী** (Near side) বা **প্রত্যক্ষ** (Direct) বা **মুখ্য** (Primary) জোয়ার বলে। **খ** ভূ-কেন্দ্র হইতে প্রায় চারি হাজার মাইল দূরে, কাজেই ভূ-কেন্দ্রে চন্দ্রের আকর্ষণ যেরূপ, **খ** স্থানে আকর্ষণ তাহার চেয়ে অনেক কম। **খ** স্থানের সমুদ্রের তলদেশ ভূ-কেন্দ্রের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত, তাই ঐ স্থানে আকর্ষণ কেন্দ্রের আকর্ষণেরই অনুরূপ। অতএব সমুদ্রের তলদেশে চন্দ্রের আকর্ষণ সমুদ্রের উপরিভাগের আকর্ষণ অপেক্ষা বেশী। এই জন্য **খ** স্থানেও

জল স্ফীত হইয়া উঠিবে। এই জোয়ারকে **দূরবর্তী** (Far side), **পরোক্ষ** (Indirect) বা **গৌণ** (Secondary) জোয়ার বলে। **ক** ও **খ** স্থানের জল ফুলিয়া উঠার সময় **গ** ও **ঘ** স্থানের জল **ক** ও **খ** স্থানের দিকে সরিয়া যায়। তাই



জোয়ার ভাঁটা

১২নং চিত্র

তখন **গ** ও **ঘ** স্থানে **ভাঁটা** (Low tide) হয়। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে কোন স্থান যখন চন্দ্রের সম্মুখীন হয়, তখন সেই স্থানে ও তাহার প্রতিপাদ স্থানে জোয়ার হয় এবং ইহাদের মধ্যবর্তী স্থানে ভাঁটা হয়। পৃথিবী নিজ অক্ষের চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে। তাই ধরাপৃষ্ঠের সকল স্থানই ২৪ ঘণ্টায় একবার চন্দ্রের সম্মুখীন হইতেছে, একবার চন্দ্রের ঠিক বিপরীত দিকে যাইতেছে। তাই ২৪ ঘণ্টায় একই স্থানে একবার মুখ্য জোয়ার ও একবার গৌণ জোয়ার হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন একই স্থানে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা হয়।

ভরা কোটাল ও মরা কোটাল—চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার-ভাঁটা হয় বটে, কিন্তু সূর্যের আকর্ষণ হেতু উহার তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অমাবস্যা



ভরা কোটাল

১৩নং চিত্র

ও পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র সূর্য ও পৃথিবী একই সমান্তরালে অবস্থিত থাকে। অমাবস্যা

তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর একই দিকে অবস্থিত থাকে। এই দিন চন্দ্র ও সূর্য উভয়েই পৃথিবীকে একই দিকে আকর্ষণ করে। উভয়ের মিলিত আকর্ষণ হেতু জল তখন খুব বেশী স্ফীত হইয়া উঠে। ইহাকে **ভরা কোটাল, তেজ কোটাল** বা **ভরা জোয়ার** (Spring Tide) বলে। পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী মধ্যভাগে এবং চন্দ্র ও সূর্য পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে। নিম্নের চিত্রটি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে যে চন্দ্র যেখানে মুখ্য জোয়ার উৎপন্ন করে সূর্য সেখানেই গৌণ জোয়ার সৃষ্টি করে। ইহার ফলে এইস্থানে অত্যধিক জলস্ফীতি হয়। তাই পূর্ণিমা তিথিতেও ভরা জোয়ার হইয়া থাকে।

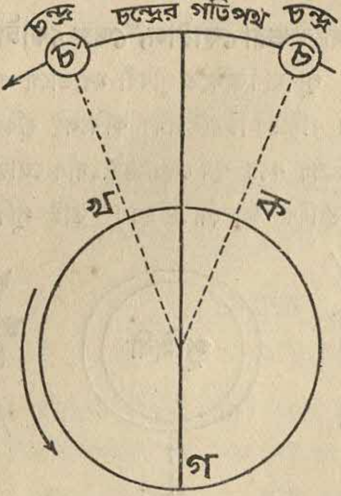


মরা কোটাল
১৪নং চিত্র

অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর সহিত সমকোণে থাকিয়া পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। তাই চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে জোয়ার হওয়ার কথা, সূর্য সেখানে ভাঁটার সৃষ্টি করিতে চায়। আবার চন্দ্র যেখানে ভাঁটার সৃষ্টি করে সূর্যের আকর্ষণে সেখানে জোয়ার হয়। চন্দ্রের আকর্ষণ বেশী বলিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠের চন্দ্রের দিকের অংশ ও উহার বিপরীত দিকে জোয়ার এবং দুই জোয়ারের মধ্যবর্তী অংশে ভাঁটা হয়; কিন্তু এই জোয়ারের সময় জলস্ফীতি বেশী হয় না এবং ভাঁটার সময়েও জল খুব বেশী নীচে নামিয়া যায় না। ইহাকে **মরা কোটাল** বা **মরা জোয়ার** (Neap Tide) বলে।

জোয়ার-ভাঁটার সময়-ব্যবধান—মনে কর **চ** স্থানে (১৫নং চিত্র দেখ) চন্দ্রের অবস্থিতির জন্য **ক** স্থানে মুখ্য জোয়ার হইতেছে। **ক** ঠিক ২৪ ঘণ্টা পরে পুনরায় স্বস্থানে ঘুরিয়া আসিবে। চন্দ্রও নিজ কক্ষপথে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। মনে কর ২৪ ঘণ্টা পর চন্দ্র **চ'** স্থানে সরিয়া গিয়াছে। **খ** স্থান

চ'-এর ঠিক সম্মুখীন। **ক** যখন **খ** স্থানে আসিবে তখন সেখানে পুনরায় মুখ্য জোয়ার হইবে। চন্দ্র ২৮ দিনে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। তাই **কখ** বৃত্তচাপ ভূ-পরিধির ১/২৮ অংশ। সম্পূর্ণ পরিধি অর্থাৎ এক পাক ঘুরিতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা লাগে, অতএব এক পাকের ১/২৮ অংশ ঘুরিতে ২৪×৬০/২৮ মিনিট অর্থাৎ প্রায় ৫২ মিনিট লাগিবে। তাই **ক** স্থানে ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট পর পুনরায় মুখ্য জোয়ার হইবে। আবার **ক** যখন **গ** স্থানে পৌছিবে তখন সেখানে গৌণ জোয়ার হইবে। দুই মুখ্য জোয়ারের ব্যবধানের অর্ধেক সময় পরেই এই গৌণ জোয়ার হইবে; অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট পর পর জোয়ার-ভাঁটা হইবে। জোয়ারের ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পর ভাঁটা এবং ভাঁটার ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পর জোয়ার হইবে। তাই জোয়ার ও ভাঁটা—এই দুয়েরই স্থিতিকাল ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। আজ যদি কলিকাতার গঙ্গায় সকাল ৯টায় মুখ্য জোয়ার হয়, তবে কাল সকাল ৯টা ৫২ মিনিটের সময় পুনরায় মুখ্য জোয়ার হইবে।



৭৫নং চিত্র

জোয়ার-তরঙ্গ সর্বত্র ঠিক একই বেগে এবং একই ভাবে চলে না। সমুদ্রের গভীরতা, বায়ুর বেগ এবং উপকূলভাগের গঠন-বৈচিত্র্যের উপর উহা নির্ভর করে। যে সকল স্থানে একই সময়ে জোয়ার আসে সেই সকল স্থানকে যে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ করা যায় তাহাকে **সহ-জোয়ারী রেখা** (Co-tidal line) বলে।

জোয়ার-ভাঁটার টান (Tidal Current)—গভীর সমুদ্রে জোয়ারের জলস্ফীতি খুবই কম (৩।৪ ফুট) হয়; কিন্তু উপকূলের নিকটে কখনও কখনও জল ৩০।৪০ ফুট উঁচুও হয়। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বে আবর্তন করে, তাই জোয়ার-তরঙ্গ পূর্ব হইতে পশ্চিমে ছুটিতে থাকে। ইহাকেই **জোয়ার-ভাঁটার টান** বলে।

জোয়ারের জল নদীমুখে প্রবেশ করিবার সময় কখনও কখনও খুব উঁচু হইয়া স্রোতের বিপরীত দিকে ধাবিত হইতে থাকে। ইহারই নাম **বান** (Tidal Bore)। হুগলী, সালউইন, আমাজন প্রভৃতি নদীর বান খুব প্রবল হয়। নদী খরস্রোতা হইলে, এবং প্রশস্ত ফাঁড়ি ও নদীমুখে বালির বাঁধ থাকিলে বান খুব উঁচু হয়।

বাল্টিক, ভূমধ্যসাগর প্রভৃতি স্থল-বেষ্টিত সাগরে জলস্ফীতি এত কম হয় যে এ সকল সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা হয় না বলিলেই চলে।

জোয়ার-ভাঁটার কার্য—(১) জোয়ারের সময় নদীজল বৃদ্ধি পায় এবং বড় বড় জাহাজ সহজে নদীতে প্রবেশ করিতে পারে।

(২) ভাঁটার টানে নদীর আবর্জনা সমুদ্রে চলিয়া যায়, এজন্য নদীজল অপেক্ষাকৃত নির্মল হয়।

(৩) ভাঁটার টানে নদীমুখের পলি, বালি প্রভৃতি পরিষ্কার হইয়া যায়। তাই নদীমুখে বালুচর পড়িতে পারে না। তা'ছাড়া জোয়ারের টানে নদীখাত গভীর হয়।

(৪) জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল নদীতে প্রবেশ করিয়া নদীর জলকে কিছুটা লবণাক্ত করে, ফলে শীতকালে নদী জমিয়া যায় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বায়ুমণ্ডল ও বৃষ্টিপাত

বায়ুমণ্ডল—পৃথিবীর চতুর্দিকে যে গ্যাসীয় আবরণ রহিয়াছে তাহাকে আমরা বায়ুমণ্ডল বলি। পৃথিবীর আকর্ষণ হেতু বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। বায়ুমণ্ডলের গভীরতা সম্বন্ধে এখনও পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারেন নাই। তবে বায়ুমণ্ডলের গভীরতা যে ২০০ মাইলেরও অধিক সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই।

বায়ুর উপাদান—বায়ুমণ্ডলকে বিভিন্ন গ্যাসের একটি সাধারণ মিশ্রণ বলা যাইতে পারে। ধরাপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর সর্বত্রই শুষ্ক বায়ুর উপাদান ও গঠন প্রায় একইরূপ। একশত ঘনফুট বায়ুতে প্রায় ৭৮ ঘনফুট নাইট্রোজেন ও প্রায় ২১ ঘনফুট

অক্সিজেন আছে। আরগন (Argon), কার্বন-ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নিওন্, ক্রিপ্‌টন্ এবং জেনন (Zenon) প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ প্রায় ১ ঘনফুট। ইহা ছাড়া বায়ুতে ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্পও আছে। তবে ইহাদের পরিমাণ সর্বত্র একরূপ নহে।

বায়ুর ধর্ম ঃ—

(১) তাপ পাইলে বায়ু প্রসারিত ও লঘু হয়; তাপ কমিয়া গেলে বায়ু সঙ্কুচিত ও ভারী হয়। এইজন্য শীতল বায়ু উষ্ণ বায়ু অপেক্ষা ভারী হয়।

(২) চাপ বৃদ্ধি পাইলে বায়ু সঙ্কুচিত, ভারী ও উষ্ণ হয়; চাপের হ্রাস হইলে বায়ু প্রসারিত, লঘু ও শীতল হয়।

(৩) উষ্ণ বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা শীতল বায়ু অপেক্ষা অধিক।

(৪) জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা হাল্কা।

(৫) বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ুর তাপ গ্রহণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশী।

বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর তাপ আটকাইয়া রাখিয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠ যে তাপ বিকিরণ করে বায়ুমণ্ডল তাহা ধরিয়া রাখে। তাহা না হইলে রাত্রিকালে অথবা মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্যালোকের অভাবে আমরা অত্যধিক শীত অনুভব করিতাম

বায়ুর উষ্ণতা—বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া সূর্যকিরণ যখন ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয় তখন বায়ুস্থিত ধূলিকণা সূর্যকিরণ হইতে কিছুটা তাপ শোষণ করিয়া লয়। ইহাতে বায়ুমণ্ডল ঈষৎ উষ্ণ হয়। সূর্যতাপে ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। ভূ-পৃষ্ঠ যে তাপ বিকিরণ করে তাহা হইতেও বায়ুর তাপ বৃদ্ধি পায়। তা'ছাড়া উত্তপ্ত ভূ-ত্বকের সন্নিহিত বায়ু ভূ-ত্বকের সংস্পর্শে উত্তপ্ত ও হাল্কা হইয়া উর্ধ্বে উঠিয়া যায়। ভারী ও শীতল বায়ু তখন ঐ স্থান অধিকার করে, আবার উহা উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে এবং শীতল ভারী বায়ু আবার সেই শূন্যস্থান দখল করে। এইরূপ পরিচলন ক্রিয়ার ফলেও বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হয়।

তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর তাপ নির্ধারণ করা হয়। কোন স্থানের বায়ুর তাপকেই আমরা সেই স্থানের তাপ বলিয়া থাকি। কলিকাতায় ভূ-পৃষ্ঠের কয়েক ফুট উপরে বায়ুর তাপমাত্রা যদি কোন এক সময়ে ৮৫° ফাঃ হয় তবে আমরা উহাকে সেই সময়ের কলিকাতার তাপমাত্রা বলি।

ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রার পার্থক্য—পৃথিবীর সর্বত্র তাপমাত্রা সমান নহে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণের জন্যই বায়ুর তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে।

(১) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তির্যক সূর্যরশ্মি অপেক্ষা লম্ব সূর্যরশ্মি ভূ-ত্বককে অধিক উত্তপ্ত করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যকিরণ প্রায় লম্বভাবে পতিত হয়, তাই নিরক্ষীয় অঞ্চল অধিক উত্তপ্ত হয়। মেরুর দিকে সূর্যকিরণ হেলিয়া পড়ে, তাই নিরক্ষরেখা হইতে মেরুর দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায় তাপও তত কমিতে থাকে।

(২) সমুদ্র-সমতল হইতে যে স্থান যত উঁচু তাহার তাপমাত্রা তত কম হয়।

(৩) সূর্যই তাপের উৎস, তাই দিনের পরিমাণ বেশী হইলে তাপের আধিক্য ঘটে এবং দিনমান ছোট হইলে তাপও কম হয়।

(৪) কোন স্থানের বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকিলে সেই স্থানের উত্তাপ বেশী হইতে পারে না। কারণ বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পকণা সূর্যতাপের অনেকটা শোষণ করিয়া লয়, ভূ-পৃষ্ঠে তাই অধিক তাপ পৌঁছিতে পারে না। এইজন্য ভূ-ত্বক অধিক উত্তপ্ত হয় না এবং তৎসন্নিহিত বায়ুও সেইজন্য অধিক উত্তপ্ত হইতে পারে না।

(৫) বৃষ্টিপাত হইলে উত্তাপ কমিয়া যায়। আমাদের দেশে ইহা তোমরা ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। বাঙ্গালা দেশে এপ্রিল-মে মাসে প্রচণ্ড উত্তাপ হয়, কিন্তু বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ হঠাৎ কমিয়া যায়।

(৬) অরণ্যভূমির নিকটবর্তী স্থানের উত্তাপ বেশী হয় না। কারণ গাছপালা পাতার সাহায্যে জলীয় বাষ্প নিঃসরণ করে, উহা বায়ুতে মিশিয়া বায়ুর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, তাই তাপ কমিয়া যায়।

ভূ-পৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে উঠা যায় বায়ুমণ্ডলের তাপ তত কমিয়া যায়—এরোপ্লেন, বেলুন প্রভৃতির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সমুদ্র-সমতল হইতে উচ্চতা যত বৃদ্ধি পায় বায়ুর তাপও তত কম হয়। সাধারণতঃ প্রতি ৩০০ ফুট উচ্চতার জন্য ১° ফাঃ উষ্ণতা কম হয়। যেমন, কলিকাতায় তাপমাত্রা যখন ৮৫° ফাঃ, কলিকাতার ৩০০০ ফুট উপরের বায়ুমণ্ডলের তাপ তখন ৭৫° ফাঃ। নিম্নলিখিত কারণের জন্য নীচের বায়ু উষ্ণ এবং উপরের বায়ু শীতল হয়।

নীচের বায়ুতে জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা প্রভৃতি অধিক থাকে। ইহারা একদিকে যেমন সূর্যরশ্মি হইতে তাপ শোষণ করে, অন্যদিকে তেমনি ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিকিরিত তাপ আটকাইয়া রাখে। নীচের বায়ু ভূ-পৃষ্ঠ-সংলগ্ন থাকায় সহজেই উহা উষ্ণ হয়।

ইহা ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠ-সংলগ্ন বায়ুর চাপের পরিমাণও অধিক, তাই নীচের বায়ু অধিক উষ্ণ হয়।

উপরের বায়ু অপেক্ষাকৃত হাল্কা, শুষ্ক এবং উহাতে ধূলিকণাও কম, তাই উহা অধিক তাপ ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। ভূ-পৃষ্ঠের বিকীর্ণ তাপ অধিক ঊর্ধ্বে পৌছিবার পূর্বে অনেকটা নিঃশেষ হইয়া যায়। বায়ুমণ্ডল এই তাপ শোষণ করিয়া লয়। উপরের বায়ুর চাপ নীচের বায়ুর চাপ অপেক্ষা কম। তা'ছাড়া নীচের বায়ু যখন উষ্ণ হইয়া উপরে উঠিয়া যায় তখন হঠাৎ চাপের হ্রাস হওয়ায় উহা শীতল হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে উপরের বায়ু নীচের বায়ু অপেক্ষা শীতল হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রতি ৩০০ফুট উচ্চতার জন্য ১° ফাঃ তাপমাত্রা কম হয়। এই হিসাবে সমুদ্র-সমতল হইতে প্রায় ১০।১১ মাইল উর্ধ্ব পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের তাপ হ্রাস পাইতে থাকে। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরকে **ট্রপোস্ফীয়ার** (Troposphere) বলে। এই স্তরেই বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয়, আকাশের মেঘগুলিও এই স্তরের মধ্যভাগে ভাসিয়া বেড়ায়। এই স্তর হইতে ৪০ মাইল পর্যন্ত বায়ুস্তরের নাম **ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ার** (Stratosphere)। এই স্তরে বায়ু প্রবাহহীন এবং শীতল। উচ্চতার জন্য এখানের তাপমাত্রার হ্রাস হয় না। এই স্তরের সর্বত্রই তাপমাত্রা প্রায় একইরূপ। এই স্তরের উপরের স্তরের নাম **আয়নোস্ফীয়ার** (Ionosphere)।



তাপ মণ্ডল

৭৬নং চিত্র

সমোষ্ণরেখা (Isotherm)—যে সকল স্থানের সমুদ্র-সমতলের উত্তাপ এক, সেই সকল স্থান যোগ করিয়া যে রেখা টানা হয় তাহাকে **সমোষ্ণরেখা** বলে।

তাপমণ্ডল—সূর্যতাপের তারতম্য এবং দিনের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীনেরা পৃথিবীকে পাঁচটি

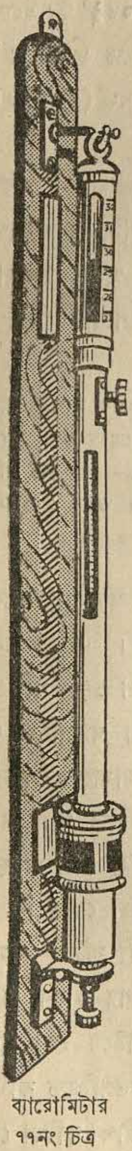
তাপমণ্ডলে ভাগ করিয়াছেন। যথা—(১) **উষ্ণমণ্ডল** (২৩½° দঃ অক্ষরেখা হইতে ২৩½° উঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত), (২) **উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল** (২৩½° উঃ হইতে ৬৬½° উঃ), (৩) **দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল** (২৩½° দঃ হইতে ৬৬½° দঃ), (৪) **উত্তর হিমমণ্ডল** (৬৬½° উঃ হইতে সুমেরু পর্যন্ত) এবং (৫) **দক্ষিণ হিমমণ্ডল** (৬৬½° দঃ হইতে কুমেরু পর্যন্ত)।

মোটামুটি ভাবে ভূ-পৃষ্ঠকে উপরোক্ত তাপমণ্ডলে ভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু জল ও স্থলভাগের অসমান উষ্ণতা, সাগর ও মহাদেশের অবস্থান, সমুদ্রস্রোত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির প্রভাবে আবার একই তাপমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে উষ্ণতার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। তাই বর্তমান কালের ভৌগোলিকরা উপরোক্ত বিভাগগুলির কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে করেন না।

বায়ুর ওজন ঃ বায়ুকে আমরা চোখে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু বায়ুর অস্তিত্ব আমরা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারি। বায়ু একটি গ্যাসীয় পদার্থ। পদার্থ মাত্রেরই ওজন আছে। সুতরাং বায়ুরও ওজন আছে—এ কথা মানিতেই হইবে। বায়ুর ওজন আছে—এই তথ্য বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণ অবস্থায় এক ঘনফুট বায়ুর ওজন প্রায় সোয়া আউন্স।

বায়ুর চাপ—সমুদ্র-সমতলে এক বর্গইঞ্চি পরিমিত স্থানের উপরের বায়ুমণ্ডলের ওজন প্রায় ১৪·৭ পাউণ্ড (অর্থাৎ ৭ সের ২ ছটাক)। এই ওজনের জন্যই বায়ু চাপ দেয়। সমুদ্র-সমতলে প্রতি বর্গইঞ্চিতে বায়ুর চাপ ১৪·৭ পাউণ্ড। বায়ু যে শুধু নিম্নদিকেই চাপ দেয় তাহা নহে। গ্যাসীয় পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী বায়ু নিম্নদিকে, ঊর্ধ্বদিকে এবং চারি পার্শ্বে চাপ দেয়। আমাদের শরীরের উপরেও বায়ু চাপ দিতেছে, কিন্তু আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। তাহার কারণ আমাদের শরীরের ভিতরেও সমপরিমাণ বহির্মুখী চাপ আছে। সমপরিমাণ বিপরীতমুখী চাপের ফলে চাপসাম্য ঘটে এবং আমরা কোন দিকের চাপই অনুভব করিতে পারি না। কোন কারণে চাপের বৈষম্য ঘটিলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি। উপরকার বায়ুর ওজনই যখন বায়ুর চাপের কারণ, তখন সমুদ্র-সমতল হইতে উঁচুতে উঠিলে বায়ুর চাপ যে কমিয়া যাইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। নিম্নের বায়ুস্তরে উচ্চতার জন্য বায়ুচাপ খুব দ্রুতগতিতে কমিতে থাকে, কিন্তু বেশী উঁচুতে অতি মন্থরগতিতে কমিতে থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা

গিয়াছে যে সাড়ে তিন মাইল উপরের বায়ুর চাপ, সমুদ্র-সমতলের বায়ুর চাপের প্রায় অর্ধেক। ইহা হইতে এই বুঝায় না যে বায়ুস্তর মাত্র সাত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। নীচের বায়ুস্তর ঘন, তাই উহার ওজন বেশী; উপরের বায়ুস্তর কম ঘন, তাই উহার ওজন কম। যত উপরে যাওয়া যায় বায়ুর ঘনত্ব তত কমিয়া যায়। ওজনের দিক হইতে দেখিতে গেলে সমুদ্র-সমতল হইতে ৩½ মাইলের মধ্যেই বায়ুমণ্ডলের অর্ধেক বায়ু আছে। অবশিষ্ট অর্ধেক ৩½ মাইলের পর হইতে বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে।



ব্যারোমিটার
১১নং চিত্র

ব্যারোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর চাপ পরিমাপ করা হয়। এই যন্ত্রের পারদস্তম্ভের উচ্চতা হইতেই চাপ নির্ধারণ করা হয়। প্রতি বর্গইঞ্চিতে বায়ুর চাপ ৩০″ বলিলে এই বুঝায় যে বায়ুচাপ ১ বর্গইঞ্চি পরিমিত স্থানের উপর ৩০″ উচ্চ পারদস্তম্ভের অর্থাৎ ৩০ ঘনইঞ্চি পারদের ওজনের সমান।

উচ্চতার জন্য তাপ একটি নির্দিষ্ট হারে কমিতে থাকে, কিন্তু চাপের বেলায় সেরূপ কোন নিয়ম খাটে না। বায়ুর তাপ যদি ৩২° ফাঃ থাকে তবে সমুদ্র-সমতল হইতে ১৫০০ ফুট উপর পর্যন্ত প্রতি ৯০০ ফুটে ১″ পরিমাণ চাপ কমিয়া যায়।

বায়ুচাপের পার্থক্য—পৃথিবীপৃষ্ঠের সর্বত্র বায়ুর চাপ সমান নহে। আবার একই স্থানে বিভিন্ন সময়ে বায়ুর চাপ বিভিন্ন হইতে পারে। শুধু তাই নয়, একই স্থানে মুহূর্ত মধ্যে বায়ুচাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। নিম্নলিখিত কারণে বায়ুর চাপের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

(১) **বায়ুর উষ্ণতার তারতম্য**—উষ্ণ হইলে বায়ু প্রসারিত ও লঘু হয়। তাই উহার চাপ কমিয়া যায়। সেইজন্য শীতল বায়ুর চাপ বেশী এবং উষ্ণ বায়ুর চাপ কম হয়। ধরাপৃষ্ঠের সর্বত্র বায়ুর উষ্ণতা এক নহে, তাই বায়ুর চাপও সমান নহে।

(২) **বায়ুর আর্দ্রতার তারতম্য**—জলীয় বাষ্প শুষ্ক

বায়ু অপেক্ষা হাল্কা। তাই যে বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকে তাহা অত্যন্ত লঘু হয় এবং উহার চাপও কম হয়।

(৩) **উচ্চতার তারতম্য**—উচ্চতার জন্য বায়ুর চাপ কম হয় তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

অধিক চাপযুক্ত বায়ুকে **উচ্চচাপের বায়ু** এবং কম চাপযুক্ত বায়ুকে **নিম্নচাপেরবায়ু** বলে।

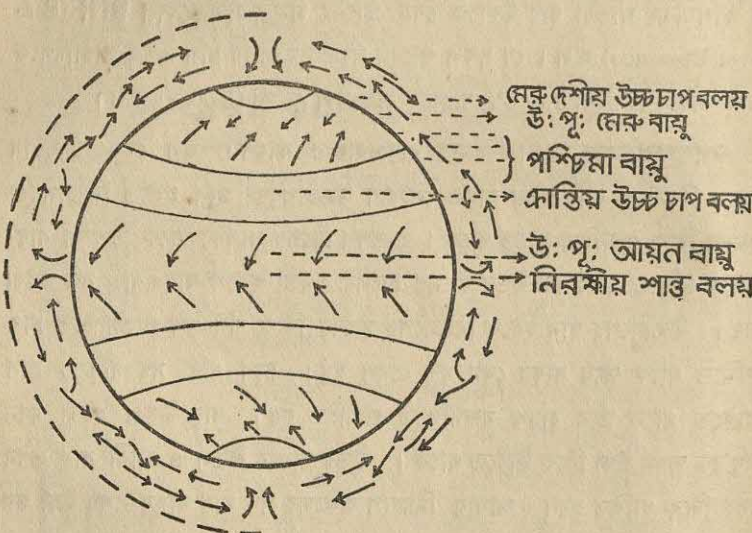
কোন স্থানের উচ্চতার জন্য চাপের যে পার্থক্য হয় তাহা সংশোধন করার পর যে চাপমাত্রা পাওয়া যায় উহাকে সেই স্থানের **সমুদ্র-সমতলের চাপ** (Sea-level Pressure) বলে। যে সকল স্থানের সমুদ্র-সমতলের চাপ একই তাহাদিগকে যোগ করিয়া যে রেখা টানা হয় তাহাকে **সমচাপ রেখা** (Isobar) বলে।

বায়ুপ্রবাহ—চাপ-বৈষম্যই বায়ুপ্রবাহের কারণ। জল যেমন উচ্চস্থান হইতে নিম্নদিকে ধাবিত হয় বায়ুও সেইরূপ উচ্চচাপযুক্ত স্থান হইতে নিম্নচাপযুক্ত স্থানের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। যতক্ষণ চাপের পার্থক্য থাকে ততক্ষণ বায়ু-প্রবাহ চলিতে থাকে। উভয় স্থানের চাপের সমতা হইলে বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। উচ্চচাপের স্থান হইতে নিম্নচাপের স্থানের দিকে যদি খুব দ্রুতগতিতে চাপ কমিতে থাকে তবে বায়ুর বেগ খুব প্রবল হয়। চাপ যদি মন্থরগতিতে হ্রাস পাইতে থাকে তবে বায়ুও মন্দগতিতে প্রবাহিত হয়। বায়ু উত্তপ্ত হইয়া যখন লঘু হয় তখন ঊর্ধ্ব দিকে উঠিতে থাকে। উভয় পার্শ্বের শীতল ও ভারী বায়ু তখন সেই দিকে ধাবিত হয়। আবার নিম্নচাপ অঞ্চলের লঘু বায়ু বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব স্তর দিয়া উচ্চচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। বায়ু যে দিক হইতে প্রবাহিত হয় সেই দিকের নাম অনুসারে উহার নামকরণ হয়। যেমন পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হইলে পশ্চিমা বায়ু, উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হইলে উত্তর-পূর্ব বায়ু বলা হয়।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি বশতঃ বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বাঁকিয়া যায়। ইহাই **ফেরেলের সূত্র (Ferrel's Law)** নামে অভিহিত হয়।

বায়ুচাপ বলয় (Pressure Belt)—উষ্ণতার এবং আর্দ্রতার তারতম্য হেতু ভূ-পৃষ্ঠে সাতটি চাপ-বলয়ের সৃষ্টি হয়। যথা—

(১) **নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় (Equatorial Low Pressure Belt)**—নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৎসরের সকল সময় সূর্যকিরণ প্রায় লম্বভাবে পতিত হয়। তাই এই অঞ্চলে সূর্যতাপ খুব প্রখর। এই তাপাধিক্য হেতু এখানে বায়ুর চাপ কম। এ ছাড়া নিরক্ষ অঞ্চলে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ বেশী। প্রখর সূর্যতাপে জলভাগ হইতে প্রচুর জলীয় বাষ্পও বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। এই সকল কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

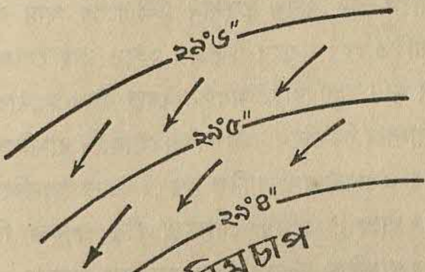


ধরা পৃষ্ঠের চাপবলয় ও নিয়তবায়ু প্রবাহ

৭৮নং চিত্র

নিরক্ষ বৃত্তের ৫° উত্তর হইতে ৫° দক্ষিণ পর্যন্ত অঞ্চলের বায়ু অত্যধিক উত্তাপ এবং জলীয় বাষ্পের সংযোগ হেতু লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। এখানকার বায়ু সর্বদাই ঊর্ধ্বগামী। এই অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ (ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরালে) প্রায়ই অনুভব করা যায় না। তাই এই অঞ্চলকে **নিরক্ষীয় শান্ত বলয় (Equatorial Calms or Doldrums)** বলে।

(২-৩) **কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় (Tropical High Pressure Belts)**—নিরক্ষ প্রদেশের বায়ু অধিক উষ্ণতা হেতু উত্তপ্ত হয় এবং লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। এই বায়ু উপরে উঠিয়া উভয় মেরুর দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই বায়ু ক্রমশঃ শীতল হইয়া ভারী হয় এবং ক্রান্তিবৃত্ত অঞ্চলে নামিয়া আসে। এই জন্যই ক্রান্তীয় অঞ্চলে একটি উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলে বায়ু নিম্নগামী। ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরালে এখানে বায়ুপ্রবাহ বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। এইজন্যই ইহাদিগকে **ক্রান্তীয় শান্ত বলয় (Tropical Calms)** বলা হয়। ৩০° হইতে ৩৫° অক্ষাংশের মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত। আটলান্টিক মহাসাগরের উপর কর্কটীয় শান্ত বলয় **অশ্বাক্ষরেখা (Horse Latitude)** নামে অভিহিত হয়। সেকালে যখন পালের সাহায্যে জাহাজ চলিত তখন এই অঞ্চলে আসার পর বায়ুর অভাবে জাহাজগুলি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কখন কখন বাতাসের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিতে হইত। তখন পানীয় জলের অভাবে নাবিকেরা জাহাজের অশ্বগুলিকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিত। এইজন্য এই অক্ষরেখাগুলি অশ্বাক্ষরেখা নামে অভিহিত হয়। এই অঞ্চলে বায়ু নিম্নগামী, তাই বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা (relative humidity) কম। এই কারণে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয় এবং পৃথিবীর অধিকাংশ মরুভূমি এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলে মরুভূমির অবস্থিতির অন্যান্য কারণও আছে।



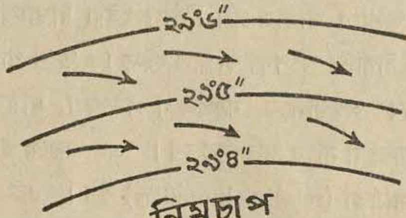
উত্তর গোলার্ধের বায়ুপ্রবাহের রূপ
৭৯নং চিত্র

(৪-৫) **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের নিম্নচাপ বলয় (Temperate Low**

Pressure Belts)—পৃথিবীর আবর্তনের ফলে এই অংশ হইতে বায়ু বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে চলিয়া যায়। এইজন্য সুমেরু ও কুমেরু বৃত্তের সন্নিহিত অঞ্চলে ৬০° হইতে ৭০° অক্ষাংশ মধ্যে একটি নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়।

(৬-৭) **মেরুস্থানীয় উচ্চচাপ বলয় (Polar High Pressure Belts)**—মেরুপ্রদেশ অত্যন্ত শীতল, প্রায় সর্বদাই বরফে ঢাকা থাকে। এখানে সূর্যকিরণের প্রখরতা নাই বলিলেও চলে। তাই এই অঞ্চলের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুবই কম। অতিরিক্ত শৈত্য এবং জলীয় বাষ্পের অল্পতার জন্য এখানকার বায়ু ভারী। এই ভারী বায়ু মেরু অঞ্চলে উচ্চচাপের সৃষ্টি করিয়াছে।

বায়ু কিভাবে প্রবাহিত হয় তাহা তোমাদিগকে বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা জানিয়া রাখা ভাল। জল যেমন উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন



দক্ষিণ গোলার্ধের বায়ুপ্রবাহের রূপ
৮০নং চিত্র

স্থানের দিকে প্রবাহিত হয় বায়ুও তেমনি উচ্চচাপের স্থান হইতে নিম্নচাপের স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। তবে উচ্চচাপ হইতে বায়ু সোজাসুজি নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয় না। পৃথিবীর আবর্তন হেতু উহা সামান্য হেলিয়া যায়। বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে হেলিয়া চলে। উত্তর গোলার্ধে বায়ু এরূপভাবে প্রবাহিত হয় যে উহার ডানদিকে উচ্চচাপ এবং বামদিকে নিম্নচাপ থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা। সেখানে বায়ুপ্রবাহের বামদিকে উচ্চচাপ এবং ডানদিকে নিম্নচাপ থাকে।

বায়ুপ্রবাহের শ্রেণীবিভাগ—পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহগুলিকে প্রধানতঃ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যেমন:—(১) **নিয়ত বায়ু** (Constant or Planetary winds)—এই বায়ু সারা বৎসর একই দিকে প্রবাহিত

হয়। যেমন—আয়ন বায়ু, প্রত্যায়ন বায়ু। (২) **সাময়িক বায়ু** (Periodical winds or Seasonal winds)—এই বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হয় না এবং সব সময় একই দিকে প্রবাহিত হয় না। ইহা বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রবাহিত হয়। যেমন—স্থলবায়ু, সমুদ্রবায়ু, মৌসুমীবায়ু ইত্যাদি। (৩) **আকস্মিক বায়ু** (Sudden winds or Irregular winds)—এই বায়ুর কোন স্থিরতা নাই। ইহা অকস্মাৎ প্রবাহিত হয়। যেমন—ঘূর্ণবাত, প্রতীপ ঘূর্ণবাত ইত্যাদি। (৪) **স্থানীয় বায়ু** (Local winds)—স্থানীয় কারণ বশতঃ কোথাও কোথাও স্থানীয় বায়ু প্রবাহিত হয়। যেমন—সাইমুম, সিরোক্কো, লু, চিনুক ইত্যাদি।

নিয়ত বায়ু—উষ্ণতার তারতম্য এবং অন্যান্য কারণ হেতু ধরাপৃষ্ঠে কতকগুলি উচ্চ ও নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। চাপবলয়ের এই অসাম্যের জন্যই কতকগুলি নিয়ত বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ু পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে হেলিয়া প্রবাহিত হয়। এই বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক হইতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহ আয়ন-বায়ু (Trade winds) নামে পরিচিত। উত্তর গোলার্ধে ইহা উত্তর-পূর্ব আয়ন-বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ইহা দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু নামে অভিহিত হয়। উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ুর বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১০ মাইল এবং দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ুর বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১৪ মাইল।

প্রত্যায়ন বায়ু (Anti-trade winds)—ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে আরও দুইটি বায়ুপ্রবাহ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে একটি বায়ুপ্রবাহ সুমেরু বৃত্তের নিম্নচাপের দিকে এবং মকরীয় উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে আর একটি বায়ুপ্রবাহ কুমেরু বৃত্তের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী ইহা উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয়। ইহা আয়নবায়ুর বিপরীত দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া এই বায়ুকে প্রত্যায়ন বায়ু (Anti-trade winds) বলে। উত্তর গোলার্ধে এই বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ন

বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উহা উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু নামে পরিচিত। এই বায়ু অনেক সময় প্রায় পশ্চিম দিক হইতেই প্রবাহিত হয়, তাই ইহাকে পশ্চিমা বায়ুও (Westerlies) বলা হইয়া থাকে। এই বায়ু উষ্ণ এবং ইহাতে জলীয় বাষ্পও প্রচুর থাকে। এই বায়ু উচ্চ অক্ষাংশের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় বারিপাত ঘটায়, তাই ইহাকে আর্দ্র পশ্চিমা বায়ু (Wet Westerlies) বলা হয়। অপর পক্ষে আয়নবায়ু উচ্চ অক্ষাংশ হইতে নিম্ন অক্ষাংশের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহার আপেক্ষিক আর্দ্রতা (relative humidity) সাধারণতঃ কম। তাই ইহা শুষ্ক আয়নবায়ু নামে কথিত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ মরুভূমি এই আয়নবায়ু অঞ্চলেই অবস্থিত।

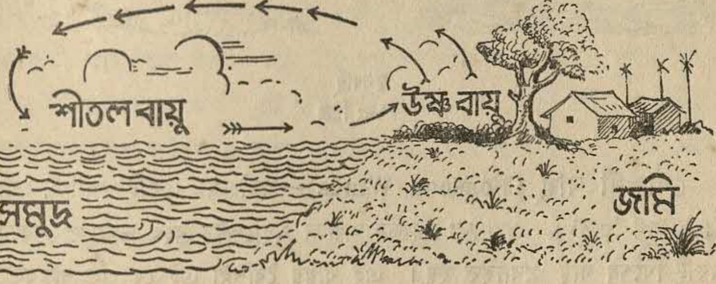
জল ও স্থলের অসমান উত্তপ্ততার জন্য পশ্চিমা বায়ুর বেগ সর্বত্র সমান হয় না। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বেশী, তাই সেখানে পশ্চিমা বায়ুর বেগ তত প্রবল নহে। দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ বেশী, তাই সেখানে পশ্চিমা বায়ু অত্যন্ত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। ৪০° ও ৫০° অক্ষাংশের মধ্যে ইহা প্রবল বেগে সোজা পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয়। তাই ইহাকে **প্রবল পশ্চিমা** (Brave Westerlies) বলে। এই অঞ্চলে, বিশেষতঃ ৪০° অক্ষাংশে, এই বায়ু অত্যন্ত প্রবল হয়। তাই ইহা **গর্জনকারী চল্লিশা** (Roaring Forties) নামে অভিহিত হয়।

মেরুবায়ু (Polar winds)—সুমেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ হইতে একটি উত্তর-পূর্ব বায়ুপ্রবাহ সুমেরু বৃত্তের নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরু অঞ্চল হইতে অনুরূপ আরও একটি দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুপ্রবাহ কুমেরু বৃত্তের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহারা যথাক্রমে সুমেরু বায়ু (North Polar winds) ও কুমেরু বায়ু (South Polar winds) নামে পরিচিত। এই বায়ু অত্যন্ত শীতল ও শুষ্ক।

সাময়িক বায়ু

স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু (Land and Sea breezes)—জল ও স্থলের উত্তাপ গ্রহণ ও বিকিরণ ক্ষমতা একরূপ নহে। সমপরিমাণ তাপ প্রয়োগে স্থল যে পরিমাণ উত্তপ্ত হয়, জল তাহা অপেক্ষা অনেক কম উত্তপ্ত হয়। আবার স্থল যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় জল তত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না। এইজন্য দিনের বেলা সূর্যকিরণে

সমুদ্র-উপকূলের স্থলভাগ সমুদ্রজল অপেক্ষা শীঘ্র ও অধিক উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত স্থলভাগের সংস্পর্শে তথাকার বায়ু উষ্ণ ও লঘু হইয়া উপরে উঠিতে থাকে। তাই স্থলভাগের উপরে বায়ুর চাপ কমিয়া যায়। সমুদ্রের উপরের বায়ু তখনও অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ এবং সমুদ্রবায়ুর চাপও তখন অধিক। বায়ুচাপের এই অসাম্যের ফলে একটি বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। সমুদ্র হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল ও উচ্চচাপযুক্ত বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহাকেই **সমুদ্রবায়ু** (Sea breeze) বলে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রবায়ুর বেগ বাড়িতে থাকে, অপরাহ্ণে ইহার বেগ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়।



সমুদ্রবায়ু
৮১নং চিত্র

সন্ধ্যার পর স্থলভাগ তাপ বিকিরণ করিয়া শীঘ্র শীতল হইয়া পড়ে। সমুদ্রের জল এত তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করিতে পারে না। তাই সমুদ্রজল রাত্রিতে স্থলভাগ অপেক্ষা উষ্ণ থাকে। রাত্রিতে স্থলভাগের উপরের বায়ু শীতল হয় ও উচ্চচাপের সৃষ্টি করে। সমুদ্রের উপরের বায়ু তখন উষ্ণ থাকে এবং তথায় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তাই তখন স্থলভাগ হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহা **স্থলবায়ু** (Land breeze) নামে পরিচিত। স্থলবায়ু সারারাত্রি ধরিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। রাত্রি যত বাড়িতে থাকে স্থলবায়ুর বেগও তত প্রবল হয়, রাত্রিশেষে ইহার বেগ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। সূর্যোদয়ের পর স্থলভাগ উষ্ণ হইতে থাকে। তারপর জলের ও স্থলের উষ্ণতা সমান হইলে স্থলবায়ু বন্ধ হইয়া যায়।

এই দুই বায়ুপ্রবাহ সমুদ্র এবং বৃহৎ হ্রদের নিকটবর্তী স্থানেই দেখা যায়। এই বায়ুপ্রবাহের ফলে এই সকল স্থানের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ হইয়া থাকে।



স্থলবায়ু
৮২নং চিত্র

মৌসুমী বায়ু (Monsoon Winds)—'মৌসুম' একটি আরবী শব্দ। ইহার অর্থ 'ঋতু'। প্রধানতঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলে মহাদেশীয় বৃহৎ ভূখণ্ডের পূর্বভাগে একটি বিশেষ বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর বৈশিষ্ট্য এই যে ঋতু পরিবর্তনের সংগে সংগে ইহার দিক পরিবর্তন ঘটে। গ্রীষ্মকালে এই বায়ু যে দিক হইতে প্রবাহিত হয় শীতকালে উহা তাহার প্রায় বিপরীত দিক হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহা শুধু ক্রান্তীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নহে। এশিয়া মহাদেশের পূর্বভাগে প্রায় ৬০° উঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত স্থানে এই বায়ু প্রবাহিত হয়। ঋতু পরিবর্তনের সংগে এই বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয় বলিয়া ইহাকে ঋতু বায়ু বা মৌসুমী বায়ু বলে। জল ও স্থলের অসমান উত্তপ্ততার জন্য মৌসুমী বায়ুর উৎপত্তি হয়। ইহাকে স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর একটি সুবৃহৎ রূপ বলা যাইতে পারে।

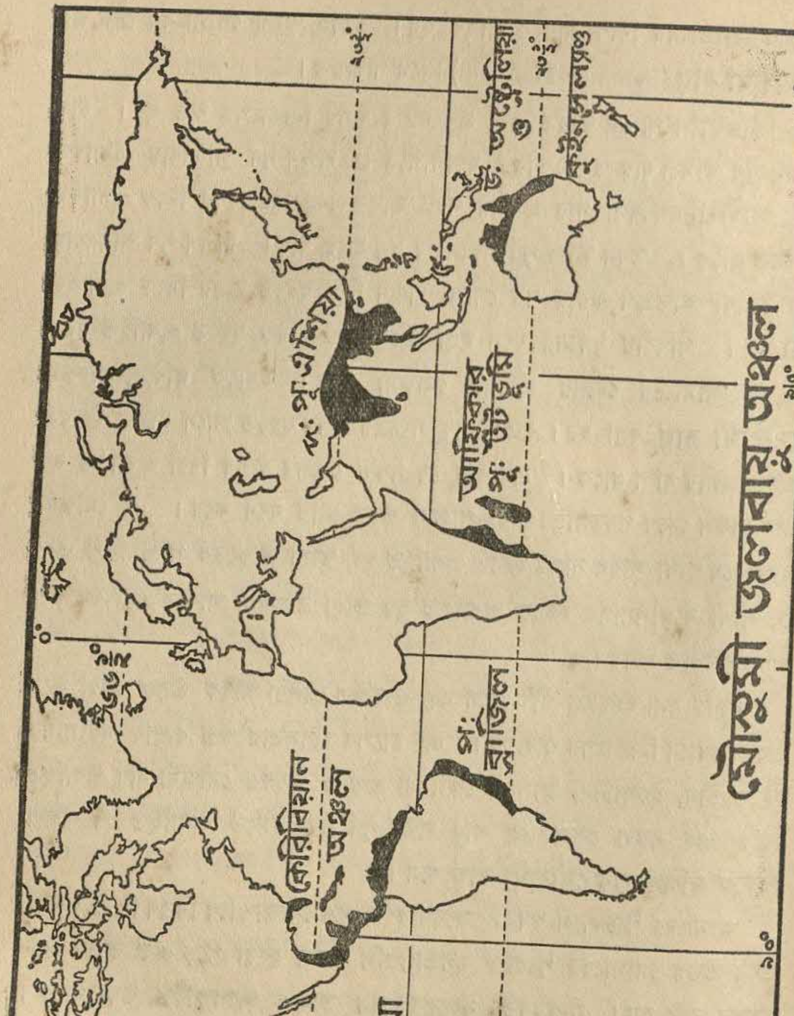
আমাদের গ্রীষ্মকালে সূর্য কর্কটক্রান্তি অঞ্চলে লম্বভাবে কিরণ দেয়। ইহার ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলের স্থলভাগ অর্থাৎ মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম ভারত, মধ্য আফ্রিকার উত্তর ভাগ, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগ, মেক্সিকো প্রভৃতি স্থান সন্নিহিত জলভাগ অপেক্ষা অধিক উষ্ণ হইয়া উঠে। এই হেতু এই সকল স্থলভাগের উপর লঘুচাপের সৃষ্টি হয়, তখন সমুদ্রের বায়ুর চাপ বেশী থাকায় সমুদ্র

হইতে স্থলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহাই উত্তর গোলার্ধের **গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ু** (Summer Monsoon) নামে পরিচিত।

গ্রীষ্মকালে পশ্চিম ভারত এবং ব্রহ্মদেশের উপর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। চাপ যখন খুব কমিয়া যায় তখন ভারত মহাসাগরে যে দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু প্রবাহিত হয় তাহা নিরক্ষরেখা পার হওয়ার পরই ভারতবর্ষের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু বন্ধ হইয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু বিষুবরেখা অতিক্রম করার পর সোজা দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় না। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয়। ইহাই আমাদের দেশের গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ু। ইহাকে **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু** বলা হয়। এই বায়ু সমুদ্রের উপর হইতে আসে বলিয়া ইহাতে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে। এই বায়ু যে সকল দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় সেই সকল দেশে পর্বতগাত্রে বাধা পাইলে প্রচুর বারি বর্ষণ করে। এই মৌসুমী বায়ুর যে শাখা আরব সাগর হইতে প্রবাহিত হয়, তাহা ভারতের পশ্চিমাংশে এবং যে শাখা বঙ্গোপসাগর হইতে প্রবাহিত হয় তাহা ব্রহ্মদেশ, আসাম এবং বঙ্গদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে গ্রীষ্মকালে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া অধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপের অসমতার জন্য প্রশান্ত মহাসাগর হইতে চীন, ইন্দোচীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশেও মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এই সকল দেশে এই বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে **দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ু** বলে।

আমাদের শীতকালে সূর্য নিরক্ষরেখার দক্ষিণে সোজাভাবে কিরণ দিতে থাকে, তখন উত্তর গোলার্ধের পূর্বোক্ত স্থলভাগগুলি শীতল হইয়া পড়ে এবং তথায় উচ্চ-চাপের সৃষ্টি হয়। নিকটবর্তী সমুদ্রের জল তখনও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। সমুদ্রের উপর তখন নিম্নচাপ থাকে। তাই এশিয়ার স্থলভাগ হইতে তখন শীতল ও উচ্চ চাপের বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাকে **শীতের মৌসুমী বায়ু** বলে। ভারতবর্ষে এই বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া আমাদের দেশে ইহা **উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু** নামে পরিচিত। শীতকালে


মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল
দঃ পূঃ এশিয়া
আফ্রিকার পূঃ উপকূল
পঃ ব্রাজিল
ক্যারিবিয়ান অঞ্চল
নিরক্ষ রেখা
অস্ট্রেলিয়ার উঃ
০°
৩০°
৯০°
১৫০°

চিত্র ১২৩৮

উত্তর চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের উপর দিয়া উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে এবং দক্ষিণ চীন, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের উপর দিয়া উত্তর দিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে এই মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়।

এই বায়ু স্থলভাগের উপর হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া এই বায়ুতে জলীয় বাষ্প খুব কম থাকে। তাই এই বায়ু হইতে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত হয় না। সেইজন্য শীতকালে আমাদের দেশে খুব অল্পই বৃষ্টিপাত হয়। তবে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু যখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তখন উহা প্রচুর জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে। তারপর উহা মাদ্রাজ উপকূলে ও সিংহলে প্রচুর বারিপাত ঘটায়। এই জন্যই মাদ্রাজ ও সিংহলে শীতকালেও বৃষ্টিপাত হয়।

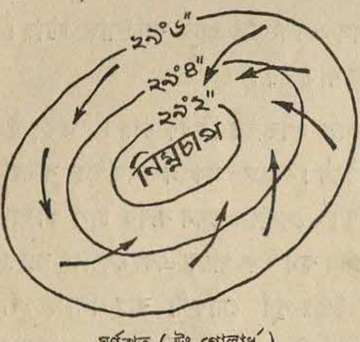
আমাদের শীতকালে সূর্য মকরক্রান্তি অঞ্চলে লম্বভাবে কিরণ দেয়। তখন ঐ অঞ্চলের স্থলভাগ অত্যধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর ভাগ তখন ভীষণ উত্তপ্ত হয়। সেখানে তখন বায়ুর চাপ কমিয়া যায়। নিকটবর্তী সমুদ্রের উপরের বায়ু তখন কম উষ্ণ থাকে এবং সেখানে বায়ুর চাপ অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। এইজন্য উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করার পর উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার দিকে ধাবিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু ঐ অঞ্চলে বন্ধ হইয়া যায়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে এই মৌসুমী বায়ু উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয়। ইহাই অষ্ট্রেলিয়ার **উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু**। ইহার ফলে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

আকস্মিক বায়ু

ঘূর্ণবাত (Cyclone)—কোন অল্প পরিসর স্থান যদি হঠাৎ উত্তপ্ত হইয়া যায় তবে সেখানকার বায়ু উত্তপ্ত ও লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। তখন সেখানে একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। চারি পার্শ্বের বায়ুর চাপ বেশী থাকে। এইজন্য বায়ু চারিদিক হইতে কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে এই বায়ু সোজা কেন্দ্রের দিকে যায় না, ইহা একটি ঘূর্ণাবর্তের আকারে কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়া যায়। এই ঘূর্ণনের একটি নিয়ম আছে। উত্তর গোলার্ধে এই বায়ু **বামাবর্তে** (ঘড়ির কাঁটা যে দিকে চলে তাহার বিপরীত দিকে) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে

দক্ষিণাবর্তে (ঘড়ির কাঁটা যেদিকে চলে সেই দিকে) ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেন্দ্রের দিকে আসে। কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া এই বায়ু উর্ধ্বগামী হয়। ঘূর্ণ্যমান এই বায়ু-প্রবাহকে **ঘূর্ণবাত** (Cyclone) বলে।

ঘূর্ণবাত একস্থানে স্থির থাকে না। ঘুরিতে ঘুরিতে উহা একস্থান হইতে অন্য-স্থানে চলিয়া যায়। একটি বৃহৎ ঘূর্ণবাতের উচ্চতা ৩।৪ মাইল এবং ব্যাস তিন চারি শত মাইল পর্যন্তও হইয়া থাকে। কখনও কখনও ইহার চেয়েও বৃহৎ ঘূর্ণবাত দেখা যায়। কোন স্থানের উপর দিয়া ঘূর্ণবাত প্রবাহিত হইলে সেই স্থানের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। এ সম্বন্ধে পরে তোমরা বিশদভাবে জানিতে পারিবে। ঘূর্ণবাত আসন্ন হইলে বায়ুর চাপ হঠাৎ কমিয়া যায়। ইহা হইতেই লোকে ঘূর্ণবাত আসিতেছে বুঝিতে পারে।



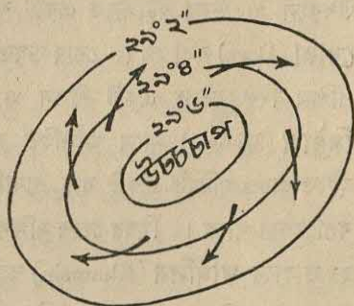
ঘূর্ণবাত (উঃ গোলার্ধ)
৮৪নং চিত্র

সমুদ্রের উপর দিয়া যাইবার সময় ঘূর্ণবাত অনেক সময় উঁচু থামের আকারে জলরাশি উর্ধ্বে তুলিয়া **জলস্তম্ভের** (Water-spout) সৃষ্টি করে। এইভাবে মরুভূমির উপরেও **বালুকাস্তম্ভের** সৃষ্টি হয়।

এই ঘূর্ণবাত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইহা চীন সমুদ্রে **টাইফুন** (typhoon), বঙ্গোপসাগরে **সাইক্লোন** (cyclone), পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে **হ্যারিকেন** (hurricane) নামে পরিচিত। এই ঘূর্ণবাতই বাঙ্গালা দেশে কালবৈশাখী এবং আশ্বিনে-ঝড়ের সৃষ্টি করে।

প্রতীপ-ঘূর্ণবাত (Anticyclone)—কোন অল্পপরিসর স্থানে বায়ু হঠাৎ শীতল হইয়া গেলে উহা ভারী হইয়া উচ্চচাপের সৃষ্টি করে। তখন ঐ স্থানের কেন্দ্রে উচ্চচাপ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিম্নচাপ থাকে। তাই কেন্দ্র হইতে বায়ু বাহিরের নিম্নচাপের দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাকে **প্রতীপ-ঘূর্ণবাত** বলে। প্রতীপ-ঘূর্ণবাতের গতি উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে এবং

দক্ষিণ গোলার্ধে বামাবর্তে হইয়া থাকে। ইহার ঘুরিবার নিয়ম ঘূর্ণবাতের বিপরীত। প্রতীপ-ঘূর্ণবাত ততটা ভীষণ আকার ধারণ করে না এবং খুব দ্রুত স্থান-পরিবর্তনও করে না। দুইটি ঘূর্ণবাতের মধ্যভাগে সাধারণতঃ একটি প্রতীপ-ঘূর্ণবাত দেখা যায়।

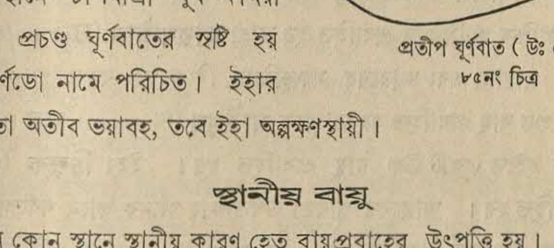


প্রতীপ ঘূর্ণবাত (উঃ গোলার্ধ)
৮৫নং চিত্র

টর্ণেডো (Tornado)—অতি অল্প পরিসর স্থানে চাপমাত্রা খুব কমিয়া গেলে যে প্রচণ্ড ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয় তাহা টর্ণেডো নামে পরিচিত। ইহার ধ্বংসক্ষমতা অতীব ভয়াবহ, তবে ইহা অল্পক্ষণস্থায়ী।

স্থানীয় বায়ু

কোন কোন স্থানে স্থানীয় কারণ হেতু বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। এই সকল বায়ুপ্রবাহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। সাহারা মরুভূমি হইতে উত্তরদিকে উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি ও দক্ষিণ ইটালীতে একটি উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ু **সিরক্কো** (Sirocco) নামে পরিচিত। এই বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক তবে ভূমধ্যসাগরের



চিনুক (স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ)
৮৬নং চিত্র

উপর দিয়া ইহা যখন প্রবাহিত হয় তখন প্রচুর জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া লয়। তাই ইটালীতে এই বায়ু উত্তপ্ত ও আর্দ্র অবস্থায় পৌঁছে। বসন্তকালেই এই বায়ু প্রচণ্ড ভাবে প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালে ইহা কদাচিৎ প্রবাহিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ শীতকালে উত্তর ও উত্তরপূর্ব দিক হইতে আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে ও উত্তর ইটালীতে একটি শীতল ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহাকে **বোরা** (Bora) বলা হয়। রোণ উপত্যকায় প্রধানতঃ শীতকালে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে একটি শীতল ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহা **মিষ্ট্রাল** (Mistral) নামে অভিহিত হয়। দক্ষিণ স্পেনে কখন কখন পূর্বদিক হইতে প্রচণ্ড গতিতে একটি বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহাকে **সোলানো** (Solano) বলা হইয়া থাকে। মিশর দেশে দক্ষিণ দিক হইতে যে উত্তপ্ত শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাকে **খামসিন** (Khamsin) বলে। সাহারা হইতে যে উত্তপ্ত শুষ্ক বায়ু গিনি উপকূল ও পশ্চিম আফ্রিকায় প্রবাহিত হয় তাহা **হারমাট্টান** (Harmattan) নামে পরিচিত। সাহারা এবং আরবের মরুভূমিতে বিশেষতঃ বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যে উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাকে **সাইমুম্** (Simoom) বলে। ক্যানাডায় রকি পর্বত হইতে একটি উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহা **চিনুক** (Chinook) নামে অভিহিত হয়। আল্পসের পার্বত্য উপত্যকায় অনেক স্থানে পর্বতগাত্র বাহিয়া নীচের দিকে উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহা **ফন্** (Fohn) নামে পরিচিত। পশ্চিম ভারতে গ্রীষ্মকালে কখন কখন উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহাকে **'লু'** বলে।

বৃষ্টিপাত

সূর্যের উত্তাপে পৃথিবীর জলরাশির কতক অংশ বাষ্প হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়। জলীয় বাষ্প বায়ু অপেক্ষা হাল্কা। তাই জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু সাধারণ বায়ুর চেয়ে হাল্কা। বায়ু যত উষ্ণ হয় উহার জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা তত বাড়ে। শীতল হইলে জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা কমিয়া যায়। কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতার বায়ুর যতটা জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা আছে ঠিক ততটুকু জলীয় বাষ্প বায়ুতে থাকিলে তাহাকে **পরিপৃক্ত বায়ু** (Saturated air) বলা হয়।

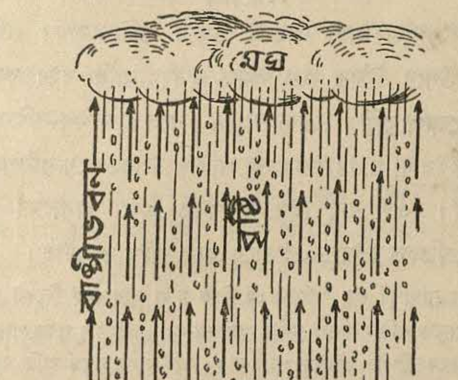
জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু হাল্কা, তাই উহা উপরে উঠিয়া যায়। উপরে বায়ুর চাপ কম, সেজন্য এই বায়ু প্রসারিত হইয়া পড়ে। উপরের বায়ু শীতল। এই সকল কারণে এই বায়ুও শীতল হইয়া পড়ে। তখন উহা আর জলীয় বাষ্পের সমস্তটা ধরিয়া রাখিতে পারে না। কিছুটা জলীয় বাষ্প তখন বিচ্ছিন্ন হইয়া সূক্ষ্ম জলকণার

আকারে বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে। ইহাকেই আমরা **মেঘের** আকারে দেখিতে পাই। মেঘ আরও শীতল হইলে জলকণাগুলি আরও শীতল হইয়া জলবিন্দুতে পরিণত হয়। এই জলবিন্দুই বৃষ্টির আকারে পতিত হয়। সকল মেঘ হইতেই বৃষ্টি হয় না। মেঘ কোন কারণে উত্তপ্ত হইলে জলকণাগুলি আবার বাষ্পে পরিণত হয়, তখন আকাশ হইতে মেঘ লোপ পায়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বৃষ্টিপাত তিনটি উপায়ের উপর নির্ভরশীল—প্রথমতঃ জলের বাষ্প হইয়া যাওয়া, দ্বিতীয়তঃ জলীয় বাষ্প ধারণ করিয়া বায়ুর পরিপৃক্ত হওয়া, এবং তৃতীয়তঃ এই পরিপৃক্ত বায়ুর শীতল হওয়া। এই পরিপৃক্ত বায়ু শীতল হইয়া প্রথমে মেঘের ও পরে বৃষ্টির সৃষ্টি করে।

বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ তিন প্রকারে হইয়া থাকে।

(১) জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু সাধারণ বায়ুর চেয়ে হাল্কা, তাই উহা সহজেই উপরে উঠিয়া যায়। উপরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এবং উপরে উঠিয়া প্রসারিত হওয়ার ফলে এই জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু শীতল হইয়া পড়ে। তাই ইহা সবটুকু



পরিচলন বৃষ্টি
৮৭নং চিত্র

জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না। কিছুটা জলীয় বাষ্প বিচ্ছিন্ন হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। এইরূপ বৃষ্টিকে **পরিচলন বৃষ্টি** (Convectional Rain) বলে।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যতাপ বেশী, জলভাগও বেশী। তাই সেখানকার জল অধিক পরিমাণে বাষ্পে পরিণত হয় এবং বাতাস ঊর্ধ্বগামী হয়। তাই এই অঞ্চলে সারা বৎসরই পরিচলন বৃষ্টি হইয়া থাকে।



শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি
৮৮নং চিত্র

(২) বায়ু পর্বতগাত্রে বাধা পাইলে উপরে উঠিয়া যায়। এই বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ হইলে উপরে উঠার জন্য শীতল হইয়া বারি বর্ষণ করে। এইরূপ বৃষ্টিকে **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি** (Relief Rain) বলে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধা পাইয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাহা শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি। এই বায়ু হিমালয় পর্বত এবং আসামের খাসিয়া, গারো প্রভৃতি পাহাড়ে প্রতিহত হইয়াও এইভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

উপরোক্ত জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু পর্বতের যে দিকে বাধা পায় সেই দিকেই বারি বর্ষণ করে। বারিপাতের পর ঐ বায়ুতে অতি সামান্যই জলীয় বাষ্প থাকে। এই বায়ু পর্বত পার হইয়া যখন অপর পার্শ্বে যায়, তখন সেখানে বৃষ্টিপাত ঘটাইতে পারে না। তাই অপর পার্শ্বে অতি অল্পই বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টি-বিরল এই অঞ্চলকে **বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল** (Rain-shadow area) বলে। দাক্ষিণাত্যের অনেক অংশ পশ্চিমঘাট পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে অবস্থিত। শিলং, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এখানে চেরাপুঞ্জির চেয়ে অনেক কম বৃষ্টিপাত হয়। পর্বতের যে পার্শ্বে বায়ু প্রতিহত হইয়া বৃষ্টিপাত ঘটায় তাহাকে **প্রতিবাত পার্শ্ব** (Windward side) এবং বিপরীত দিককে **অনুবাত পার্শ্ব** (Leeward side) বলে।

(৩) ঘূর্ণবাতের সময় অনেক সময় জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু উষ্ণ স্থান হইতে শীতল

স্থানে নীত হয়, কিম্বা উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। ইহার ফলে উহা শীতল হইয়া যায় এবং বৃষ্টিপাত ঘটে। ইহাকে **ঘূর্ণবাত বৃষ্টি** (Cyclonic Rain) বলে।



বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল
৮৯নং চিত্র

গাছপালা শিকড়ের সাহায্যে মাটি হইতে রস গ্রহণ করে এবং পাতার সাহায্যে জলীয় বাষ্প বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়। তাই বিশাল অরণ্য অঞ্চলে অনেক সময় বায়ু পরিপৃক্ত হইয়া পড়ে। এই বায়ু উপরে উঠিলে বা কোন কারণে শীতল হইলে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

রাত্রিতে ভূ-পৃষ্ঠ শীতল হইলে উহার সংস্পর্শে বায়ুস্তরও শীতল হয়। তখন বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুর আকারে ঘাস ও পাতায় লাগিয়া থাকে। ইহাই **শিশির** (Dew)। শীতপ্রধান দেশে শিশির জমাট বাঁধিয়া কঠিন হয়। ইহাকে **তুহিন** (Frost) বলে।

কখন কখন জলীয় বাষ্প ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী ভাসমান ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া ভূ-পৃষ্ঠের অতি নিকটে অল্প ঘনীভূত অবস্থায় ধোঁয়ার আকারে ভাসিয়া বেড়ায়। ইহাকে **কুয়াসা** (Mist) বলে। মেঘ ও কুয়াসায় পার্থক্য খুবই কম। মেঘ অতি উচ্চে ভাসমান ঘন কুয়াসা মাত্র। কুয়াসার জলকণাগুলি অতি সূক্ষ্ম হইলে ইংরাজীতে তাহাকে 'ফগ' (Fog) বলে। কখন কখন বৃষ্টিবিন্দু নীচে পড়িবার সময় অতিরিক্ত শৈত্য হেতু জমাট বাঁধিয়া যায়। ইহাকে **শিলা** বা **করকা** (Hail) বলে। শীতপ্রধান দেশে বা উচ্চ পর্বতে অনেক সময় জলকণা জমিয়া **তুষারে** (Snow) পরিণত হয়; তখন বৃষ্টিপাত না হইয়া **তুষারপাত** (Snowfall) হয়।

যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একই, সেই সকল স্থানকে মানচিত্রে যোগ করিলে যে রেখা পাওয়া যায় তাহাকে **সমবর্ষণরেখা** বা **সমবৃষ্টিরেখা** (Isohyet) বলে।

সপ্তম অধ্যায়

আবহাওয়া ও জলবায়ু

কোন স্থানের বায়ুর চাপ, বায়ুর আর্দ্রতা ও শুষ্কতা, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, সূর্যালোকের পরিমাণ এবং বায়ুপ্রবাহের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদির অল্প সময়ের সমষ্টিগত অবস্থাকে সেই স্থানের **আবহাওয়া** (Weather) বলা হয়। কোন স্থানের এই সকল অবস্থার ত্রিশ বা ততোধিক বৎসরের গড় ফলকে (Average) সেই স্থানের **জলবায়ু** (Climate) বলা হয়।

নিম্নলিখিত কয়েকটি অবস্থার উপর কোন স্থানের জলবায়ু নির্ভর করে :—

(১) **অক্ষাংশ**—অক্ষাংশ অনুসারে সূর্যকিরণ কোথাও সোজাভাবে কোথাও বা হেলিয়া পড়ে। তির্যক্ রশ্মির উত্তাপ-ক্ষমতা কম তাহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। নিরক্ষবৃত্ত হইতে যতদূরে যাওয়া যায় সূর্যরশ্মি তত তির্যক্‌ভাবে পতিত হয়। তাই যে স্থান নিরক্ষবৃত্ত হইতে যত দূরে সেই স্থান তত শীতল। সাধারণতঃ নিরক্ষবৃত্ত হইতে প্রতি এক ডিগ্রী দূরবর্তী স্থানে ½° ফাঃ উষ্ণতা কমিয়া যায়।

(২) **উচ্চতা**—উচ্চ স্থান নিম্ন স্থান অপেক্ষা শীতল। যতই উপরে উঠা যায় ততই শীত বাড়িতে থাকে। কেন এইরূপ হয় তাহা তোমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পড়িয়াছ। প্রতি ৩০০ ফুট উচ্চতায় ১° ফাঃ উষ্ণতা কম হয়। এইজন্য উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত হইলেও কোন স্থানে অধিক উচ্চতার জন্য জলবায়ু শীতল হইতে পারে। আফ্রিকা মহাদেশের কিলিমানজারো পর্বত নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত হইলেও উচ্চতার জন্য ইহার শিখরদেশে সব সময় বরফ জমিয়া থাকে। দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি প্রায় একই অক্ষরেখায় (ইহাদের অক্ষাংশের প্রভেদ মাত্র ১°) অবস্থিত; কিন্তু দার্জিলিং উচ্চে (৭০০১ ফুট) অবস্থিত বলিয়া উহার উষ্ণতা শিলিগুড়ি অপেক্ষা গড়ে প্রায় ২০° ফাঃ কম।

(৩) **সমুদ্র হইতে দূরত্ব**—জলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র-উপকূলবর্তী স্থানের জলবায়ু সমভাবাপন্ন থাকে। তাই সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। সমুদ্র হইতে যত দূরে যাওয়া যায় সমুদ্রের প্রভাব তত কমিতে

থাকে এবং জলবায়ু তত চরম-ভাবাপন্ন (extreme) হইতে থাকে। গয়া এবং করাচী প্রায় একই অক্ষরেখায় অবস্থিত; কিন্তু করাচী সমুদ্রতীরে বলিয়া গ্রীষ্মকালে ইহার উষ্ণতা গয়ার উষ্ণতা অপেক্ষা অনেক কম। বোম্বাই সমুদ্রতীরে অবস্থিত, লাহোর সমুদ্র হইতে প্রায় ৮০০ মাইল দূরে। তাই বোম্বাই নগরীর দৈনিক তাপের প্রসর (৬° ফাঃ হইতে ১০° ফাঃ) লাহোরের দৈনিক তাপের প্রসর (১৫° ফাঃ হইতে ২০° ফাঃ) অপেক্ষা অনেক কম।

(৪) **বায়ুপ্রবাহ**—বায়ুপ্রবাহ অনেক সময় জলবায়ুর পরিবর্তন সাধন করে। শীতল স্থানের উপর দিয়া উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইলে শীতের তীব্রতা কমিয়া যায়। আবার উষ্ণ স্থানের উপর দিয়া শীতল বায়ু প্রবাহিত হইলে সেই স্থানের উত্তাপ কমিয়া যায়, স্থানটি শীতল হয়। শীতকালে আল্পস্ পর্বতের উপত্যকায় "ফন" (Fohn) নামে এক প্রকার উষ্ণবায়ু প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে তুষারাচ্ছন্ন উপত্যকাগুলিতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪০° ফাঃ পর্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

(৫) **বৃষ্টিপাত**—বৃষ্টিপাত হইলে উত্তাপ কমে। ভারতবর্ষে জুলাই মাসে বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া জুন মাস অপেক্ষা জুলাই মাসের উষ্ণতা কম। বৃষ্টিপাত না হইলে জুলাই মাসেই তাপমান সর্বাধিক হইত। নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রতি দিনই পরিচলন বৃষ্টি হয়, তাই নিরক্ষীয় অঞ্চলে দৈনিক তাপমাত্রা খুব অধিক হয় না।

(৬) **সমুদ্রস্রোত**—সমুদ্র-উপকূলবর্তী স্থানের জলবায়ুর উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব খুব বেশী। উপকূলভাগে উষ্ণ সমুদ্রস্রোত বহিলে সেই অঞ্চলের উত্তাপ কতকটা বৃদ্ধি পায়, শীতল সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হইলে তাপের হ্রাস হয়। লাব্রাডোর উপদ্বীপের চেয়ে নরওয়ে উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত হইলেও শীতল স্রোতের প্রভাবে লাব্রাডোর উপকূলে বরফ জমে, কিন্তু উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক স্রোতের (North Atlantic Drift) প্রভাবে নরওয়ের উপকূল শীতকালেও তুষারমুক্ত থাকে।

(৭) **পর্বতশ্রেণীর অবস্থান**—পর্বত বায়ুপ্রবাহকে বাধা দিয়া জলবায়ুর পরিবর্তন সাধন করে। হিমালয় পর্বত থাকার জন্য মৌসুমীবায়ু উত্তর এবং পূর্ব ভারতে বৃষ্টিপাত ঘটাইতে সক্ষম হয়। বায়ুপ্রবাহ উচ্চ পর্বত অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। হিমালয় পর্বত থাকার জন্যই শীতকালে মধ্য এশিয়ার শীতল বায়ু ভারতে প্রবেশ করিতে পারে না। হিমালয় পর্বত না থাকিলে

ভারতবর্ষের জলবায়ু অন্যরূপ হইত। উপরোক্ত কারণের জন্য পর্বতের দুইদিকে দুই রকমের জলবায়ু দৃষ্ট হয়। এইজন্যই ভারতের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র, কিন্তু অপর পার্শ্বে তিব্বতের জলবায়ু শীতল ও শুষ্ক।

(৮) **ভূমির ঢাল**—যেখানে ভূমির ঢাল সূর্যের দিকে, সেখানে সূর্যকিরণ অধিক লম্বভাবে পড়ে, তাই উহা অধিক উষ্ণ হয়। ঢাল যদি সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে তবে সূর্যকিরণ তির্যকভাবে পতিত হয়, ইহাতে ভূমি খুব বেশী উত্তপ্ত হয় না। তাই যে জমির ঢাল সূর্যের দিকে তাহা অধিক উষ্ণ হয়।

(৯) **ভূমির প্রকৃতি**—মাটির উপাদানের উপরেও কোন স্থানের উষ্ণতা নির্ভর করে। মৃত্তিকাতে পাথরকুচি অথবা বালুকার পরিমাণ অধিক হইলে সেই ভূমি অতি শীঘ্র উত্তপ্ত ও শীতল হয়। পলিগঠিত এবং উদ্ভিদ্‌ময় মৃত্তিকা বেশী উত্তপ্ত বা বেশী শীতল হইতে পারে না। এইজন্যই মরুভূমিতে দিবাভাগে অত্যধিক গরম এবং রাত্রে শীত বোধ হয়। বঙ্গদেশ পলিগঠিত এবং গাছপালায় পূর্ণ, তাই আমরা দিনে খুব বেশী উত্তাপ কিম্বা রাত্রে শীত অনুভব করি না।

(১০) **অরণ্যের অবস্থান**—কোন স্থানে গভীর অরণ্য থাকিলে সেখানে জলীয় বাষ্প সহজে ঘনীভূত হইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য সেখানকার জলবায়ু আর্দ্র হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল

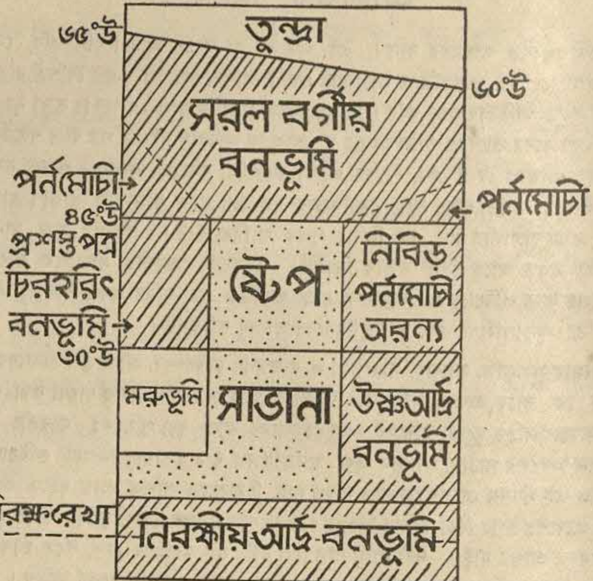
মৌসুমী অঞ্চলে আমাদের বাস। এই অঞ্চলের যে অংশে আমরা বাস করি, সেই অংশের, অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের, ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আমরা বছরে ছয়টি ঋতুর আবির্ভাব লক্ষ্য করি। বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির রূপই যে বদলায় তাহা নয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের ভাবেরও পরিবর্তন হয়। শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণের পর যখন শরতের রৌদ্রদীপ্ত উজ্জ্বল নির্মল আকাশ দেখা দেয়, শীতের জড়তা কাটাইয়া বসন্তের আগমনে শ্যামল নব পত্রোদ্গমে যখন পৃথিবী শ্যামল আভা ধারণ করে, কোকিলের কুহু রবে যখন বাঙ্গালার আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে, তখন বাঙ্গালীর মনে এক বিচিত্র পুলক জাগিয়া উঠে। প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের যে অতি নিবিড় সম্বন্ধ আছে ইহাই তাহার নিদর্শন। এইজন্যই বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে ঋতুবন্দনা এতটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলিয়াই আমরা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পূজাপার্বণের এবং বিভিন্ন উৎসবের প্রচলন করিয়াছি।

বাঙ্গালার ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, গাছপালা ও বাঙ্গালার কৃষিসম্পদ, জীবজন্তু তোমাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহা তোমাদের পক্ষে সম্যক ধারণা করা কঠিন। অন্য অঞ্চলের অবস্থার সহিত তুলনা করিলেই তাহা তোমাদের কাছে ধরা পড়িবে। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাঠান, পাখতুন এবং আফ্রিদিদের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে এই সীমান্ত দেশের কোথাও সাদৃশ্য নাই, হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্ত হইতে কয়েকটি পর্বত-শাখা এই প্রদেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পর্বতসঙ্কুল, বন্ধুর দেশ, বৃষ্টিহীন উষর ভূমি, কোথাও এতটুকু সমতল প্রান্তর নাই। নদী নালা খাল বিল নাই, শুষ্ক মরুপ্রায় দেশ, শীতে ভীষণ শীত, গ্রীষ্মে বেশ গরম, তাহার কৃষি-সম্পদও অতি সামান্য এবং তাহা বঙ্গদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকৃতির এই বিভিন্নতার জন্য পাঠান, পাখতুন বা আফ্রিদিদের বেশভূষা, চালচলন, রীতিনীতি, খাওয়াদাওয়া, এক কথায় জীবনযাত্রা-প্রণালী আমাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শুধু তাই নয়, রুক্ষ জলবায়ু, বন্ধুর পর্বতসঙ্কুল ভূপ্রকৃতি মানুষকে দুর্ধর্ষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাই খুন জখম, দাঙ্গা হাঙ্গামা তাহাদের জীবনে নিত্যদিনের ঘটনা। পারিবারিক কলহের জন্য ইহারা পুরুষানুক্রমে খুন জখম চালাইয়া যায়। এত প্রতিহিংসাপরায়ণ জাত পৃথিবীতে খুব কমই আছে। বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে ইহাদের জীবনের এই যে পার্থক্য তাহার মূলে আছে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা। মানুষের জীবনধারার উপর প্রকৃতির এই যে প্রভাব তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

নিরক্ষীয় মণ্ডল হইতে মেরুর দিকে চলিতে থাকিলে শুধু যে জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ এবং জীবজন্তুর বিভিন্নতাই লক্ষ্য করা যায় তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্মধারা, মানুষের জীবনযাত্রার মানও বিভিন্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবেষ্টন তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবেষ্টন হইতে যেমন সম্পূর্ণ পৃথক, তেমনি নিরক্ষীয় অঞ্চলের আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকার পিগ্‌মীদের জীবনধারা তুন্দ্রা অঞ্চলের এস্কিমো বা ল্যাপদের জীবনধারা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

নিরক্ষরেখা হইতে মেরুর দিকেই যে শুধু জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ এবং মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তাহা নয়, কোন বিশাল মহাদেশের পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেও এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষ্য করিতে পারিবে।

প্রাকৃতিক বিভাগ—জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ, ভূপ্রকৃতি, কৃষি প্রভৃতি যে প্রাকৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি করে সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার জন্যই

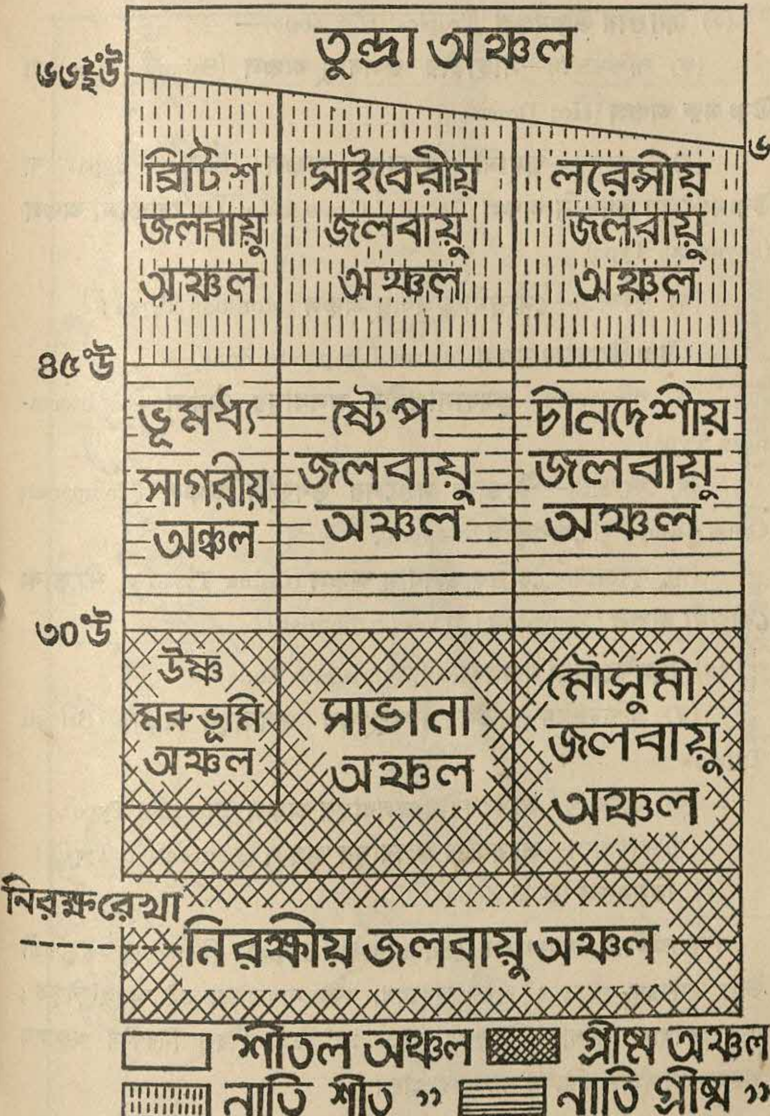


৯০নং চিত্র

মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হইয়া থাকে। যে অঞ্চলে এই সকল পরিবেশের সমষ্টিগত প্রভাব একইরূপ সেই অঞ্চলকে একটি প্রাকৃতিক বিভাগ (Natural Region) বলা হয়। একই প্রাকৃতিক বিভাগের সকল স্থানে মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী মোটামুটি একই ধরণের।

জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জই মানুষের জীবনধারাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত করে। তাই জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জের সমষ্টিগত প্রভাবের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীকে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে :—

(১) **নিরক্ষীয় অঞ্চল** (Equatorial Type)।



প্রাকৃতিক বিভাগ

৯১নং চিত্র

(২) **ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডল** (Tropical Hot Zone)—

(ক) পশ্চিমভাগে—**সাহারীয় জলবায়ু অঞ্চল** (Sahara Type) বা **উষ্ণ মরু অঞ্চল** (Hot Deserts),

(খ) মধ্যভাগে—**সুদানী জলবায়ু অঞ্চল** (Sudan Type) বা **উষ্ণমণ্ডলের তৃণভূমি অঞ্চল** (Tropical Grass Lands) বা **স্যাভানা অঞ্চল** (Savannah Type),

(গ) পূর্বভাগে—**মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল** (Monsoon Type)।

(৩) **উষ্ণ শীতোষ্ণ মণ্ডল** (Warm Temperate Zone)—

(ক) পশ্চিমভাগে—**ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চল** (Mediterranean Type),

(খ) মধ্যভাগে—**শীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি অঞ্চল** (Temperate Grass Lands) বা **স্তেপভূমি** (Steppes),

(গ) পূর্বভাগে—**চৈনিক জলবায়ু অঞ্চল** (China Type) বা **শীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চল** (Temperate Monsoon Lands)।

(৪) **হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল** (Cool Temperate Zone)—

(ক) পশ্চিমভাগে—**বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ুর অঞ্চল** (British Type),

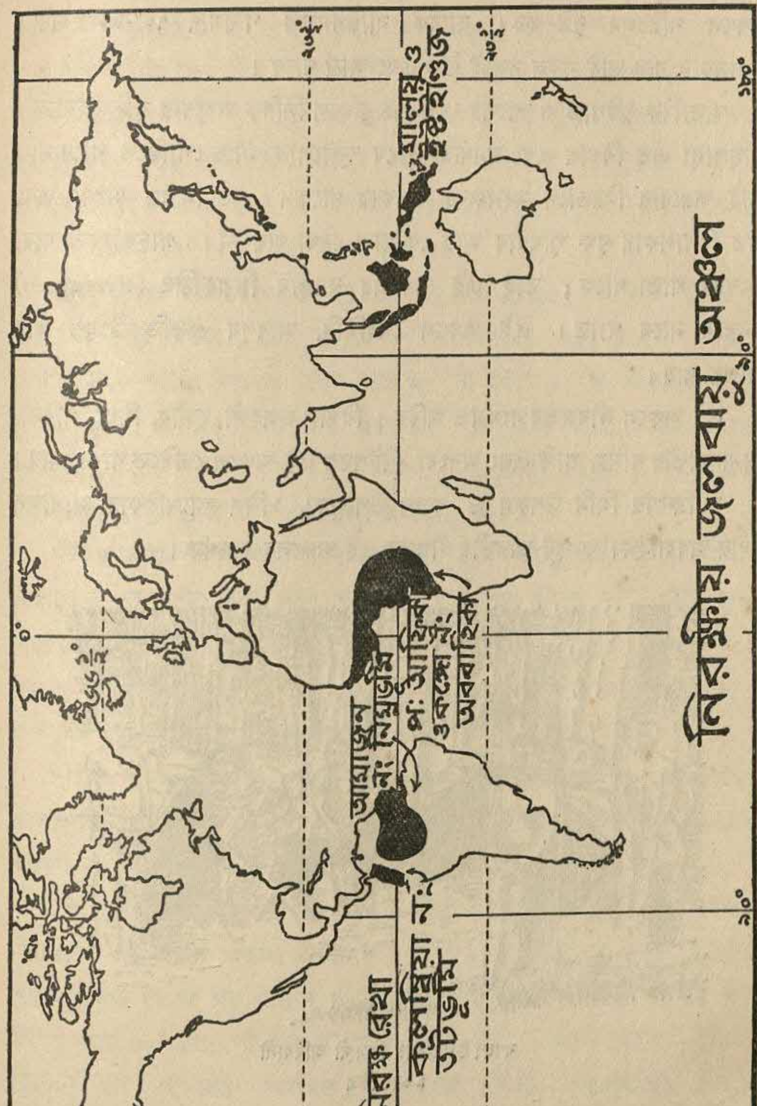
(খ) মধ্যভাগে—**সাইবেরীয় জলবায়ুর অঞ্চল** (Siberian Type),

(গ) পূর্বভাগে—**লরেন্সীয় জলবায়ুর অঞ্চল** (Laurentian Type)।

(৫) **হিমমণ্ডল** (Cold Zone)।

নিরক্ষীয় অঞ্চল (Equatorial Type)—নিরক্ষবৃত্তের ৫° ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা হইতে ৫° দক্ষিণ অক্ষরেখা পর্যন্ত সাধারণতঃ এই অঞ্চল বিস্তৃত; তবে কোথাও কোথাও নিরক্ষবৃত্ত হইতে ১০° ডিগ্রী দূরেও নিরক্ষীয় অঞ্চলের অনুরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

এখানে চিরগ্রীষ্ম বিরাজমান। সারা বৎসরই উত্তাপ অধিক থাকে। মাসিক গড় উত্তাপের পরিমাণ প্রায় ৮০° ফাঃ, বায়ুর উর্ধ্বগতির ফলে সারা বৎসরই এই



৯২নং চিত্র

অঞ্চলে পরিচলন বৃষ্টি হয়। বার্ষিক বারিপাতের পরিমাণ ৭০"-৮০" ইঞ্চি। এখানকার বায়ু তাই সকল সময়ই উষ্ণ এবং আর্দ্র থাকে।

অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও তাপের ফলে এই অঞ্চলে নিবিড় অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। গাছপালা এত বিশাল এবং ঘনসন্নিবিষ্ট যে সূর্যালোক নীচে পৌছিতে পারে না। তাই অরণ্যের নিম্নভাগে মধ্যাহ্নেও অন্ধকার থাকে। এত নিবিড় অরণ্য এবং এত বিশালকায় বৃক্ষ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। গাছগুলিতে সারা বৎসরই পাতা থাকে; তাই এই অঞ্চলের বনভূমি **চিরহরিৎ** (Evergreen) বনভূমি নামে খ্যাত। এই অঞ্চলে মেহগিনি, আবলুস প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলে জীবজন্তুর সংখ্যাও অধিক। বিশাল জলহস্তী, কুমীর, সিংহ, গরিলা, নানা জাতীয় বানর, পাখী এবং অসংখ্য কীটপতঙ্গ এই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

আফ্রিকার গিনি উপকূল ও কঙ্গো উপত্যকা, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকা ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।



কঙ্গো উপত্যকার পিগ্‌মী অধিবাসী
৯৩নং চিত্র

অত্যধিক উষ্ণতা ও আর্দ্রতার জন্য এবং কীটপতঙ্গ ও হিংস্র জন্তুসঙ্কুল হওয়ায় এই অঞ্চল মনুষ্যবাসের খুব উপযোগী নহে। নিরক্ষীয় আফ্রিকায় পিগ্‌মী, বাকুবা,

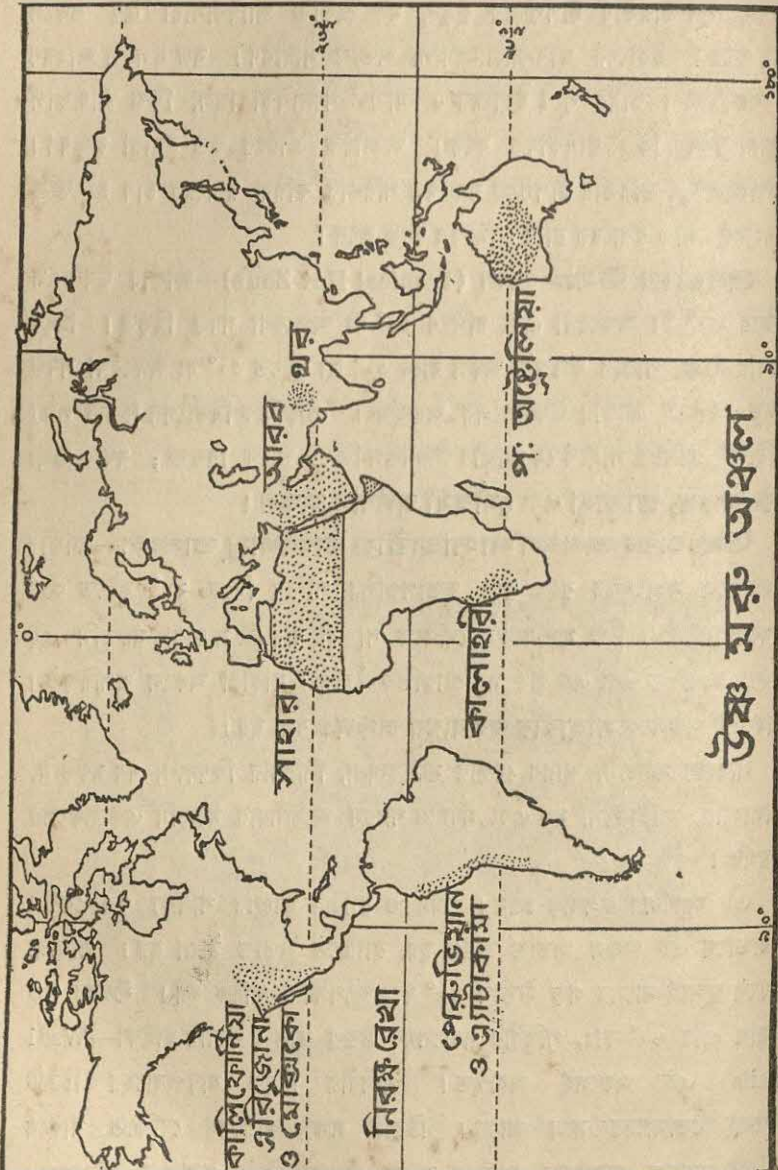
গাবুন, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কুবুস, মই প্রভৃতি আদিবাসীরা এই অঞ্চলে বাস করে। ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অত্যন্ত সাধারণ। বন্য ফলমূল আহরণ ও বন্য জন্তু শিকারই পূর্বে ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা ছিল, কিন্তু আজকাল ইহারা কিছু কিছু কৃষিকার্যও করে। অত্যধিক গ্রীষ্মের জন্য ইহারা কৃষ্ণবর্ণ। আজকাল পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া রবারের চাষ হইতেছে এবং বহু লোক রবারের চাষে শ্রমিকের কাজ করে।

ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডল (Tropical Hot Zone)—ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডল উত্তরে ৩০° উঃ অক্ষরেখা এবং দক্ষিণে ৩০° দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বের কতকটা অঞ্চল বাদে ৩০° উঃ হইতে ৩০° দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলই ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতিক বিভাগের চিত্রটি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডল তিনটি ভাগে বিভক্ত; যথা—**উষ্ণ মরু অঞ্চল, স্যাভানা** এবং **মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল।**

উষ্ণ মরু অঞ্চল বা সাহারীয় জলবায়ু অঞ্চল—ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলে মহাদেশীয় বৃহৎ বৃহৎ ভূভাগগুলির পশ্চিম দিকে ২০° হইতে ৩০° অক্ষরেখার মধ্যে উষ্ণ মরু অঞ্চল দেখিতে পাওয়া যায়। সাহারা মরুভূমি এই অঞ্চলে অবস্থিত এবং এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সাহারা অঞ্চলে সুপরিস্ফুট। তাই এই অঞ্চলকে **সাহারীয় জলবায়ুর অঞ্চল**ও বলা হয়।

সাহারা মরুভূমি, আরব দেশের মরু অঞ্চল, সিরিয়ার কিয়দংশ, থর মরুভূমি, কালাহারি, আটাকামা মরু এবং মধ্য ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

এই অঞ্চলের জলবায়ু চরম। দিন ও রাত্রির তাপের পার্থক্য খুব বেশী। দিবাভাগে এই অঞ্চল অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, রাত্রিতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়। সাহারা অঞ্চলে জুলাই মাসের গড় উত্তাপ ৯০° ফাঃ অপেক্ষাও অধিক হয়। শীতের গড় উত্তাপ প্রায় ৬০° ফাঃ, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত স্থান (ওয়াদি হাইফা—Wadi Haifa) এই অঞ্চলেই অবস্থিত। পৃথিবীর নিয়ত বায়ুপ্রবাহের চিত্রটি নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। চিত্রটি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে এই অঞ্চলে আয়নবায়ু স্থলভাগ হইতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইতেছে।


উষ্ণ মরু অঞ্চল
আরব
থর
সাহারা
কালাহারি
প: অষ্ট্রেলিয়া
কালিফোর্নিয়া
এরিজোনা
ও মেক্সিকো
নিরক্ষ রেখা
পেরুভিয়ান
ও আটাকামা

৯৪নং চিত্র

তাই এই অঞ্চল বৃষ্টি-বিরল শুষ্ক মরুভূমি। বৃষ্টিপাত কোথাও ১০" ইঞ্চির অধিক হয় না। অনেক স্থানে বার্ষিক বারিপাত ১" ইঞ্চিরও কম; আবার এমন স্থানও আছে যেখানে চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে হয়ত একবার অতি সামান্য বৃষ্টিপাত হয়।

এইরকম উষ্ণ এবং শুষ্ক অঞ্চলে গাছপালা কিছুই থাকিতে পারে না। উষ্ণ মরু অঞ্চলে ফণিমনসা জাতীয় কাঁটাগাছ এবং অন্যান্য কণ্টকাকীর্ণ গাছের ঝোপঝাড়ই প্রধান উদ্ভিজ্জ। তবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দিকে গুল্মজাতীয় উদ্ভিজ্জ এবং নিরক্ষরেখার দিকে অতি ক্ষুদ্র তৃণও জন্মিয়া থাকে। এছাড়া কোন কোন স্থানে বৃষ্টিপাত হওয়ার পর অল্পদিনস্থায়ী এক-প্রকার তৃণ জন্মায়। উষ্ণ মরুর উদ্ভিজ্জের রূপ সাধারণতঃ এই প্রকার, তবে মরূদ্যানের উদ্ভিজ্জ সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। ভূগর্ভস্থ জল যেখানে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত চলিয়া আসে সেখানেই মরূদ্যানের সৃষ্টি হয়। জলের আধিক্য হেতু মরূদ্যানগুলিই মরুভূমির একমাত্র উর্বর ক্ষেত্র। খেজুর গাছই এখানকার প্রধান উদ্ভিজ্জ। কোন কোন মরূদ্যানে তূলা, ধান, ইক্ষু, তামাক, টমেটো, মিলেট, আঙ্গুর ও অন্যান্য নানাপ্রকার ফলের চাষ হয়।



মরু উদ্ভিদ
৯৫নং চিত্র

উট মরুভূমির প্রধান জন্তু। ইহারা ভারবাহী পশু। জল পান না করিয়া অনায়াসে সপ্তাহের পর সপ্তাহ উত্তপ্ত বালির উপর দিয়া ইহারা মানুষ ও মালপত্রের বোঝা লইয়া চলিতে পারে। ইহা ছাড়া ছাগল, ভেড়া, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুও আছে।

উষ্ণ মরুর মত শুষ্ক ও উষ্ণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষিকার্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তাই এই অঞ্চলে লোকবসতি যে খুব বিরল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একমাত্র মরূদ্যানেই স্থায়ী লোকবসতি দেখা যায়। মরূদ্যানের লোকেরা চাষবাস করে। খেজুর, ইক্ষু, ধান, কার্পাস প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন করে এবং সেইসবের বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। মরূদ্যান ছাড়া কোথাও স্থায়ী বসবাস নাই। অন্যত্র যাযাবর জাতির বাস। ইহারা দল বাঁধিয়া ছাগল, ঘোড়া, উট প্রভৃতি লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। আরব দেশের বেদুইনরা এইরূপ যাযাবর জাতি। ইহারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ।



আরব বেদুইন

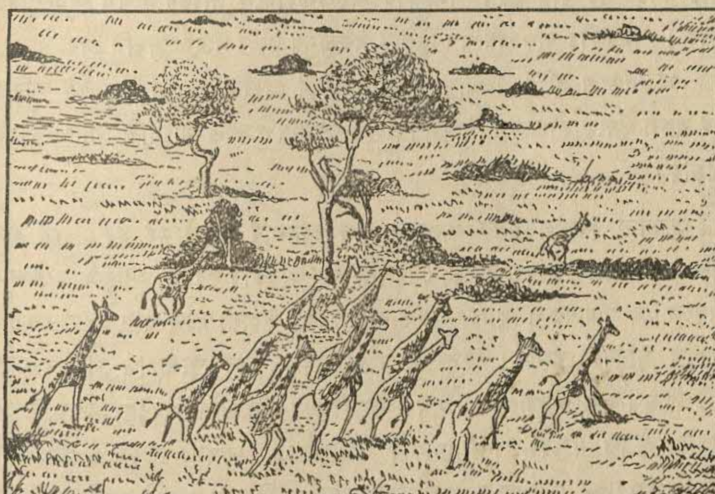
৯৬নং চিত্র

পশু হইতেই ইহাদের অধিকাংশ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান করিতে হয়। ইহারা সামান্য ব্যবসায়-বাণিজ্যও করে। তবে সুযোগ সুবিধা পাইলে ইহারা দস্যুতা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না ; অনেক যাযাবর দস্যুবৃত্তিকেই জীবনধারণের সহজ

বৃত্তি বলিয়া মনে করে। দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমিতে বুশ্‌ম্যান নামক এক অর্ধসভ্য আদিবাসী জাতি বাস করে। ইহারাও যাযাবর, তবে পশু-শিকারই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা।

দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলের যেসকল স্থানে খনিজদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই সমস্ত স্থানে বহুসংখ্যক লোক খনির কাজ করিতেছে। ইহারা বিদেশী, এবং ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অনেক উন্নত—যাযাবর বা মরূদ্যানবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ইহাদের জীবনযাত্রার কোন সামঞ্জস্য নাই।

ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলের তৃণভূমি অঞ্চল বা স্যাভানা অঞ্চল—ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলের মধ্যভাগে স্যাভানা অঞ্চল অবস্থিত। ইহার



স্যাভানা অঞ্চল
৯৭নং চিত্র

একদিকে নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনভূমি, অপরদিকে সাহারীয় অঞ্চল। অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড এবং নর্দার্ন টেরিটরির তৃণভূমি, আফ্রিকার সুদান, উগাণ্ডা, টাঙ্গানাইকা, রোডেশিয়া, অ্যাঙ্গোলার তৃণভূমি, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভেনেজুয়েলা এবং

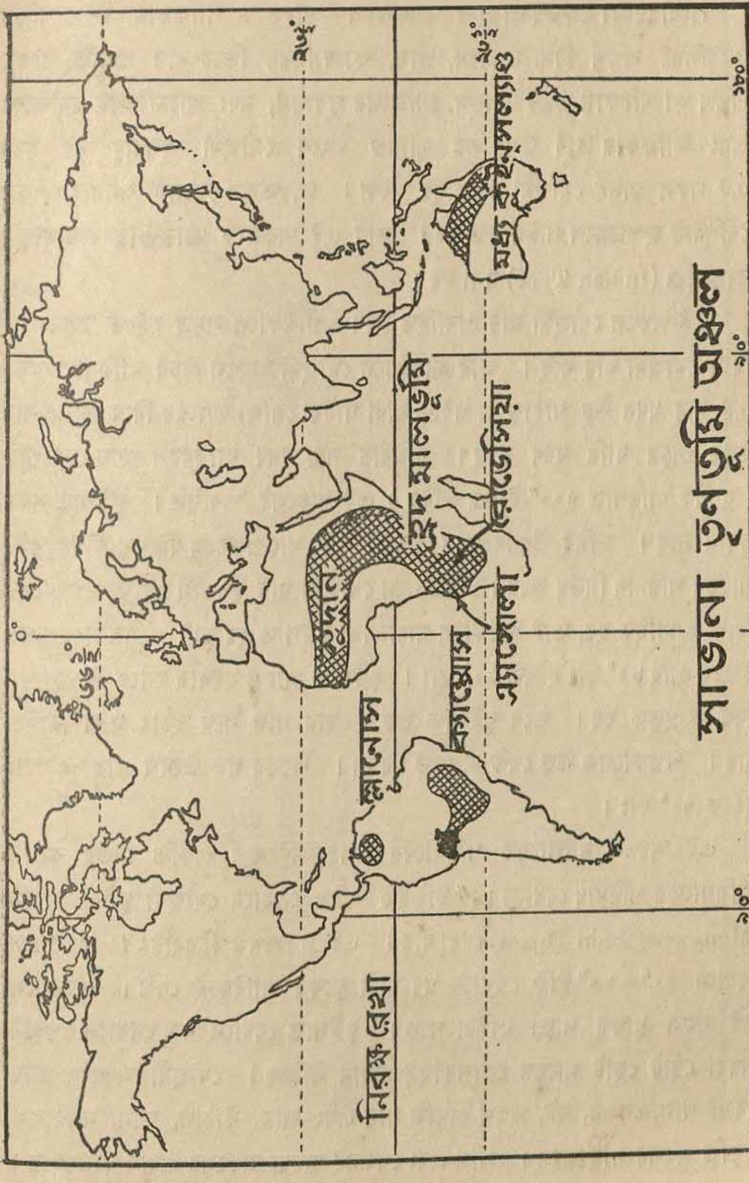
দক্ষিণ ব্রাজিলের তৃণভূমি স্যাভানা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই তৃণভূমি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। আফ্রিকায় ইহা **স্যাভানা,** ব্রাজিলে **ক্যাম্পো** (Campos), ভেনেজুয়েলাতে **ল্যানো** (Llanos) নামে পরিচিত।

এই অঞ্চল গ্রীষ্মকালে অধিক উত্তপ্ত হয়। গ্রীষ্মের গড় উত্তাপ ৮০° ফাঃ হইতে ৯০° ফাঃ। শীতকালও এই অঞ্চলে বেশ গরম—শীতের গড় উত্তাপ প্রায় ৭০° ফাঃ। তাই বার্ষিক তাপের প্রসর অধিক নয়। এই অঞ্চলে বার্ষিক বারিপাত প্রায় ২০" হইতে ২৫"। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়, শীতকাল শুষ্ক।

তৃণ এই অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিজ্জ হইলেও সর্বত্র একই রকম তৃণভূমি দৃষ্ট হয় না। মরু অঞ্চলের দিকে হ্রস্ব তৃণ ও কাঁটাজাতীয় গাছের আধিক্যই বেশী। অন্যত্র দীর্ঘ তৃণভূমি আছে। ইহার মধ্যে আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৃক্ষও দেখা যায়। তৃণ প্রায় ৮।১০ ফুট দীর্ঘ হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের খুব নিকটে বনভূমির মধ্যে মধ্যে তৃণভূমি দেখা যায়।

এই অঞ্চলে হরিণ, জিরাফ, জেব্রা, ঘোড়া প্রভৃতি তৃণভোজী জন্তুই অধিক। এই সকল তৃণভোজী জন্তুর পিছনে সিংহ, চিতাবাঘ প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীও ঘুরিয়া বেড়ায়।

স্যাভানা অঞ্চলে বৃষ্টির অল্পতার জন্য কৃষিকার্য খুব কমই হয়। যে সকল অঞ্চলে জলসেচের সুবিধা আছে, সেখানেই শুধু কৃষিকার্য হয়। আফ্রিকার স্যাভানা অঞ্চলে এক যাযাবর পশুপালক জাতি বাস করে। ইহারা গরুর পাল লইয়া স্যাভানা অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল কৃষির কাজও করিতেছে। অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার স্যাভানা অঞ্চলে ইউরোপীয়দের প্রভাবে উন্নত ধরণের পশুপালনকার্য চলিতেছে। ছাগল, ভেড়া ও গরু প্রধান পশু। পশুপালন ও পশুজাত দ্রব্য উৎপন্ন করা ও বিদেশে রপ্তানী করাই এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা। অষ্ট্রেলিয়ার স্যাভানা অঞ্চলে একপ্রকার কৃষ্ণকায় আদিবাসীও বাস করে। পশুশিকারই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। স্যাভানা অঞ্চলেও লোকবসতি বেশী নহে। অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার স্যাভানা অঞ্চল হইতে প্রচুর দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। অষ্ট্রেলিয়াজাত মাখন ও জমাট দুগ্ধ তোমরা বাজারে দেখিয়া থাকিবে।

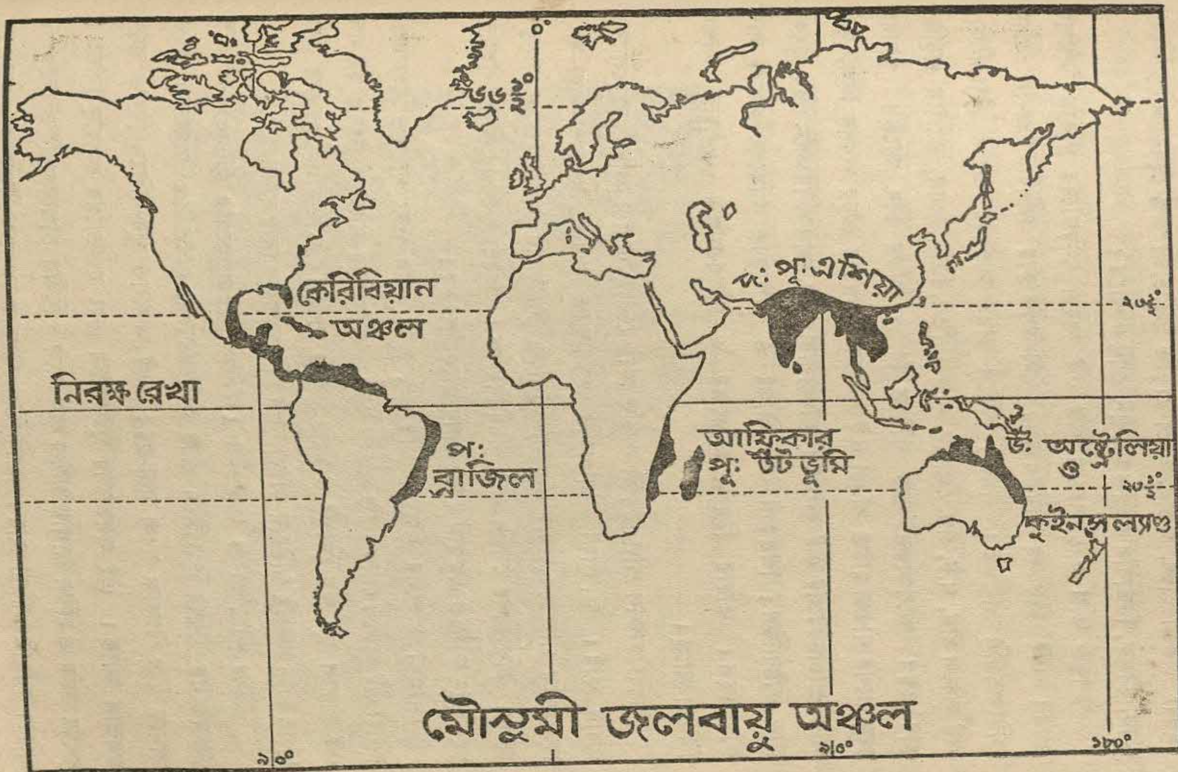

সাভানা তৃণভূমি অঞ্চল
নিরক্ষ রেখা
ল্লানোস
ক্যাম্পোস
এ্যাঙ্গোলা
সুদান
হ্রদ মালভূমি
রোডেসিয়া
মধ্য কুইন্সল্যাণ্ড

চিত্র ৯৫

মৌসুমী জলবায়ুর অঞ্চল—ভারত ও পাকিস্তান, উত্তর-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ চীন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি রাজ্য, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূল, ব্রাজিলের পূর্বভাগ, মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের সামান্য অংশে মৌসুমী জলবায়ু দৃষ্ট হয়। এই সকল স্থানই মৌসুমী জলবায়ুর অঞ্চল। ভারতবর্ষে মৌসুমী জলবায়ুর সকল বৈশিষ্ট্যই সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। তাই এই অঞ্চলকে **ভারতীয় জলবায়ুর অঞ্চলও** (Indian Type) বলা হয়।

এই অঞ্চলে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালে সমুদ্র হইতে স্থলভাগের দিকে মৌসুমী বায়ু বহে। তাই গ্রীষ্মকালে মৌসুমী অঞ্চলে প্রচুর বারিপাত হয়। এই বায়ু যখন উঁচু পাহাড় বা পর্বতে বাধা পাইয়া সোজা উপরের দিকে উঠিয়া যায় তখন প্রচুর বারি বর্ষণ করে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বারিবহুল স্থান চেরাপুঞ্জি (বার্ষিক বারিপাত ৪০০" ইঞ্চির অধিক) এই অঞ্চলেই অবস্থিত। বৃষ্টিপাত সর্বত্র সমান নহে। ভূমির উচ্চাবচতা (Relief) এবং বায়ুপ্রবাহের দিকের উপর বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ নির্ভর করে। শীতকালে মৌসুমী বায়ু স্থলভাগ হইতে জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়, তাই শীতকালে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত হয় না। গ্রীষ্মকালের গড় উত্তাপ প্রায় ৮০° ফাঃ হইতে ৯০° ফাঃ। বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইবার আগে উত্তাপ খুব বেশী অনুভূত হয়। তবে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তাপ কমিয়া যায়। শীতকালেও শীত বেশী অনুভূত হয় না। শীতের গড় উত্তাপ প্রায় ৬৫° ফাঃ হইতে ৭০° ফাঃ।

এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি নির্ভর করে। বারিপাতের পরিমাণ যেখানে ৮০" ইঞ্চিরও অধিক সেখানে মৌসুমী বৃষ্টির বনভূমি (Monsoonal Rain Forest) দেখা যায়। এই বনভূমিও চিরহরিৎ। বারিপাত যেখানে ৪০"–৮০" ইঞ্চি সেখানে পর্ণমোচী বৃক্ষের আধিক্যই বেশী। শীতকালে এই সকল বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া পড়ে। বৃষ্টিপাত যেখানে কম সেখানে তৃণভূমি অথবা ছোট ছোট গাছের ঝোপঝাড়ই প্রধান উদ্ভিজ্জ। মৌসুমী অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই শাল, সেগুন, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছ এবং আম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছ জন্মে। শাল এবং সেগুনই অরণ্য অঞ্চলের প্রধান কাষ্ঠসম্পদ।


কেরিবিয়ান অঞ্চল
নিরক্ষ রেখা
দ: পূ: এশিয়া
পূ: ব্রাজিল
আফ্রিকার পূ: উচ্চ ভূমি
উ: অস্ট্রেলিয়া ও কুইনসল্যাণ্ড
মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল

৯৯নং চিত্র

অরণ্য অঞ্চলে হরিণ, গণ্ডার, হাতী প্রভৃতি তৃণভোজী জন্তু যেমন আছে তেমনি বাঘ, ভালুক, চিতাবাঘ প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীও আছে।

উপযুক্ত তাপ ও বৃষ্টিপাতের জন্য এই অঞ্চল কৃষিকার্যের অত্যন্ত উপযোগী স্থান। এই অঞ্চলের সমতলভূমির নদী-উপত্যকায় পৃথিবীর প্রধান প্রধান কৃষিক্ষেত্রগুলি অবস্থিত। সমতল অঞ্চলে কৃষিই মানুষের প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চলে ধান, পাট, গম, জোয়ার, বাজরা, তিল, তিসি, আখ, কার্পাস প্রভৃতির চাষ হয়। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে চা ও কফির চাষ আছে। খাদ্যশস্য অল্পায়াসেই পাওয়া যাইত বলিয়া এই অঞ্চলের মানুষের প্রচুর অবসর ছিল, তাই অতি প্রাচীনকালেই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দর্শন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; শিল্পকলা এবং ভাস্কর্য ও স্থাপত্যেও সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। তাহার নিদর্শন ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় আজও টিকিয়া আছে।

অরণ্য অঞ্চলে শাল, সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠ চেরাই এবং চালান করা লোকের প্রধান কার্য। তা'ছাড়া নানাপ্রকার অরণ্যজাত দ্রব্যও আহরণ করা হয়। হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে, আসামে, ব্রহ্মদেশের অরণ্যে প্রচুর শালবৃক্ষ জন্মে। ব্রহ্মদেশের সেগুন কাঠ পৃথিবীবিখ্যাত। অরণ্য অঞ্চলে হাতীর সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড একস্থান হইতে অপর স্থানে নীত হয়।

মৌসুমী অঞ্চলের জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ, ভূমি উর্বর এবং খাদ্যশস্য সহজলভ্য বলিয়া এই অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। তাই প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইলেও এই অঞ্চলে খুব কম দেশেই খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত থাকে। আজকাল ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ চীনে বনভূমি পরিষ্কার করিয়া নূতন কৃষিক্ষেত্রের আবাদ হইতেছে।

উষ্ণ শীতোষ্ণ মণ্ডল (Warm Temperate Zone)—ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলের উত্তরে ও দক্ষিণে প্রায় ৩০° অক্ষরেখা হইতে ৪৫° অক্ষরেখা পর্যন্ত স্থানকে উষ্ণ শীতোষ্ণ মণ্ডল বলা হয়। এই অঞ্চলেও পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বৃহৎ স্থলভাগ আছে। এই স্থলভাগের পূর্ব-পশ্চিম এবং মধ্যভাগের জলবায়ু বিভিন্ন। সূর্যের উত্তর ও দক্ষিণ আপাত গতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চাপবলয়গুলিও উত্তর ও দক্ষিণে সামান্য সরিয়া যায়। তাই উষ্ণ শীতোষ্ণ মণ্ডলে শীতকালে প্রত্যায়ন

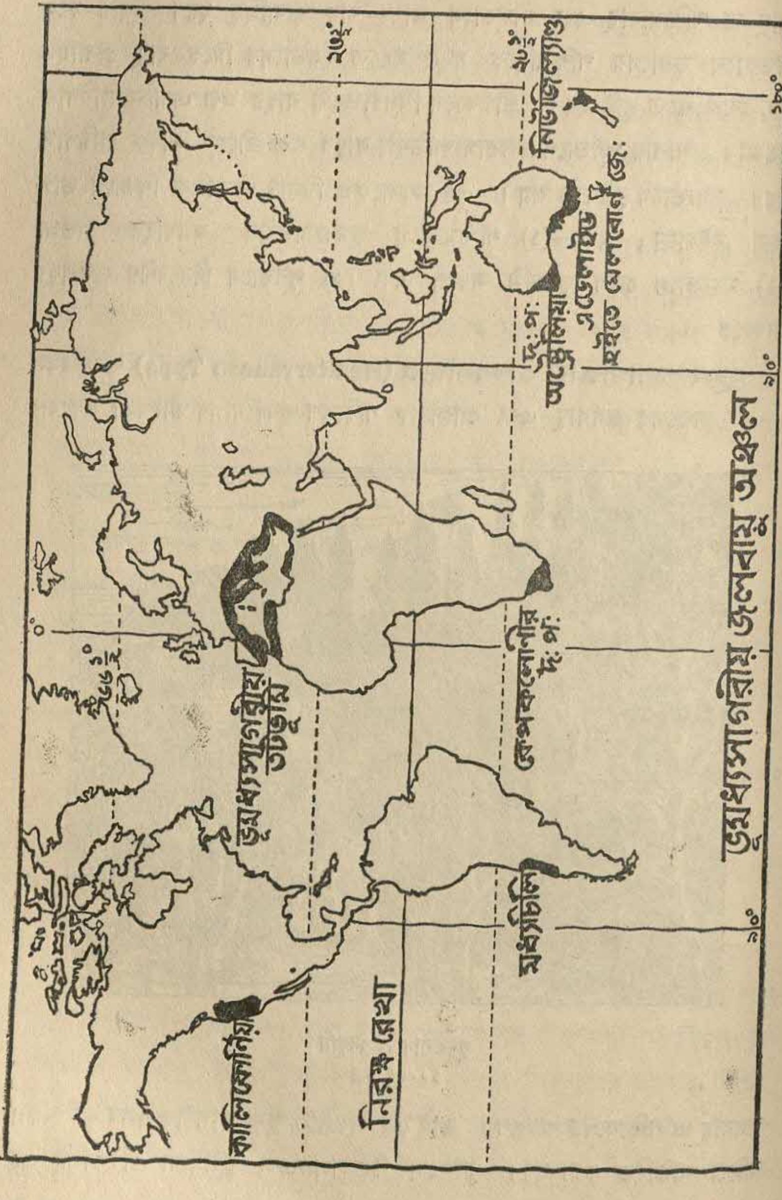
বায়ু বা পশ্চিমাবায়ু এবং গ্রীষ্মকালে আয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে শীতকালে ভূভাগের পশ্চিমদিকে সমুদ্র হইতে স্থলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাই শীতে বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে বিপরীতমুখী বায়ুর জন্য এখানে বারিপাত হয় না। আবার পূর্বভাগে স্থলভাগ-অভিমুখী বায়ুর জন্য গ্রীষ্মেই অধিক বারিপাত হয়। মধ্যভাগে বৃষ্টিপাত অল্প। এই অঞ্চলকেও তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে; যথা—(১) পশ্চিমভাগে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চল, (২) মধ্যভাগে স্তেপ তৃণভূমি অঞ্চল, এবং (৩) পূর্বভাগে চীনদেশীয় জলবায়ুর অঞ্চল।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর (Mediterranean Type) অঞ্চল —এই অঞ্চলের জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী অঞ্চলের



ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি
১০০নং চিত্র

জলবায়ু ও পরিবেশের অনুরূপ। তাই এই অঞ্চলকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চল বলিয়া অভিহিত করা হয়। বৃষ্টিবহুল শীতকাল এবং বৃষ্টিবিরল গ্রীষ্মকালই এই


কালিফোর্নিয়া
নিরক্ষ রেখা
মধ্যচিলি
ভূমধ্যসাগরীয় তটভূমি
কেপকলোনীর দঃ পঃ
অস্ট্রেলিয়া দঃ পঃ
এডেলাইড হইতে মেলবোর্ণ
নিউজিল্যান্ড
ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল

১০১নং চিত্র

অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। হিম শীতোষ্ণ মণ্ডলের দিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বারিপাতের পরিমাণ প্রায় ৩০" ইঞ্চি। উষ্ণ মরু অঞ্চলের দিকে বৃষ্টিপাত ক্রমশঃ কমিতে থাকে। মরু অঞ্চলের নিকটে বারিপাত প্রায় ১০" ইঞ্চি। উষ্ণ শীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্যান্য স্থানের তুলনায় এই অঞ্চলের শীতঋতু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। শীতের গড় উষ্ণতা ৫০° ফাঃ-র চেয়েও অধিক। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় না বলিলেই চলে। গ্রীষ্মকাল শুষ্ক, তখন আকাশ মেঘমুক্ত থাকে; তাই গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলে প্রচুর রৌদ্র পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালের গড় উষ্ণতা ৭০° ফাঃ-৮০° ফাঃ।

এই অঞ্চলে প্রশস্তপত্র চিরহরিৎ বনভূমি দেখা যায়। যেখানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম সেখানে ঝোপঝাড় বেশী। গ্রীষ্মকাল শুষ্ক বলিয়া এ অঞ্চলের বৃক্ষগুলি নানা উপায়ে গ্রীষ্মকালের জন্য রস সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং নানাভাবে বৃক্ষদেহ হইতে বাষ্পীভবনের হ্রাস ঘটায়। এ অঞ্চল বিভিন্ন জাতীয় ফলের জন্য বিখ্যাত। জলপাই, আঙ্গুর, কমলালেবু, ডুমুর, পীচ, প্লাম, ন্যাসপাতি, লেবু, পেয়ারা, আপেল, ডালিম প্রভৃতি ফলের গাছ সর্বত্র দেখা যায়। গম, যব এখানকার প্রধান শস্য। তুঁতগাছের চাষও প্রচুর হয়।

ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত ক্যালিফোর্নিয়া, চিলির মধ্যভাগ, দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তরীপ প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ, দক্ষিণ-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া এবং ভিক্টোরিয়া প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ভাগও এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

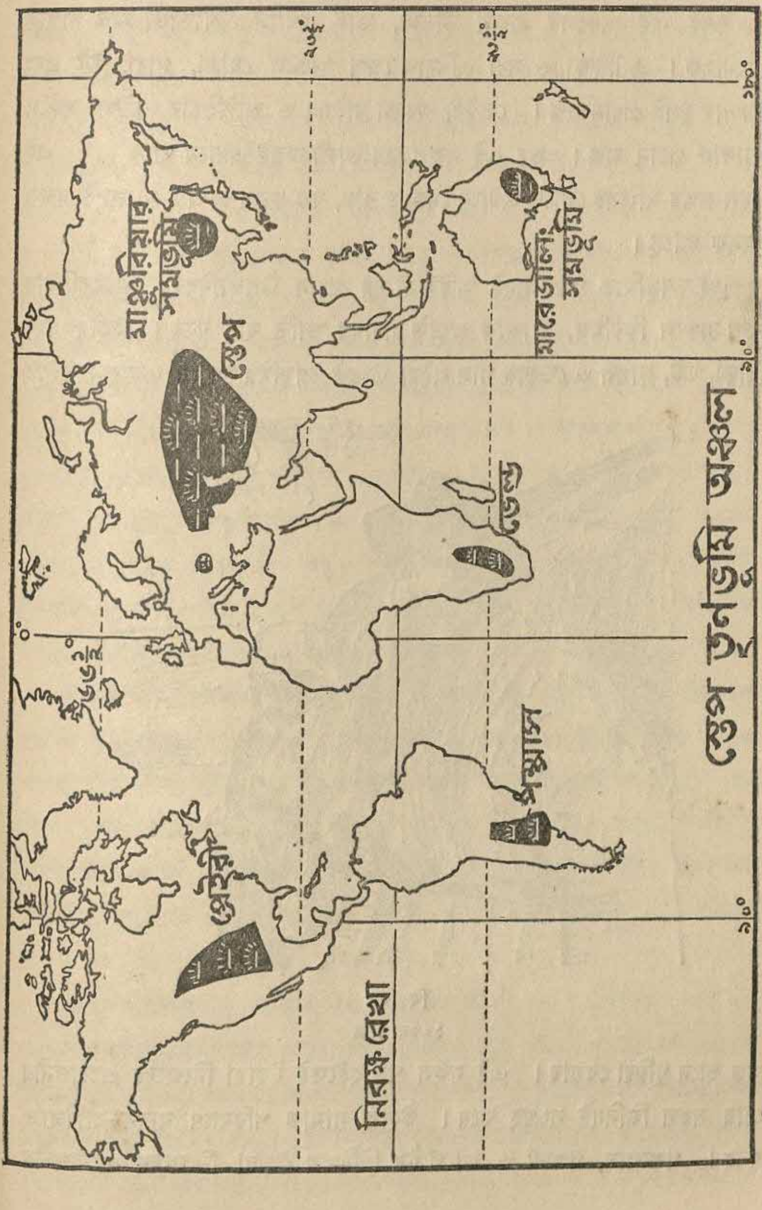
কৃষিই এই অঞ্চলের লোকের প্রধান অবলম্বন। তৃণভূমির অভাবে এই স্থানে গোপালনের সুবিধাও নাই। তবে ছাগল ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পর্বতগাত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ খাইয়া বাঁচিতে পারে, তাই এ অঞ্চলে ছাগল ভেড়াও প্রতিপালিত হয়। পশ্চিম ইউরোপের মত শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলের নিকটবর্তী হইলেও কয়লার অভাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পশ্চিম ইউরোপের মত শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। তবে ছোটখাটো কৃষিজাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন, জলপাই হইতে তৈল (Olive Oil); আঙ্গুর হইতে মদ; ভেড়ার লোম হইতে পশমী কাপড় এবং তুঁতগাছের গুটিপোকা হইতে রেশম। গম ও যবের খামার এবং ফলের বাগানের কাজই অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা। কিছু লোক উপরোক্ত শিল্পকার্যেও নিযুক্ত আছে। যে সকল অঞ্চলে খনিজদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তথায় বহু লোক খনির

কাজ করে। ক্যালিফোর্নিয়ার পেট্রোলিয়ম খনিতে ও তৈল শোধনাগারে কাজ করিয়া বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করে।

স্তেপভূমি বা উষ্ণ শীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি অঞ্চল (Steppes or Warm Temperate Grass Lands)—ইউরেশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি বৃহৎ ভূভাগের যে অংশ উষ্ণ শীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত সেই অংশগুলির মধ্যভাগ লইয়াই স্তেপভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চল সমুদ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত।

সমুদ্রবায়ুর কোন প্রভাবই এখানে পৌছিতে পারে না। তাই এখানকার জলবায়ু চরম। শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নামিয়া যায়, আবার গ্রীষ্মকালে গরমও বেশ পড়ে। গ্রীষ্মের গড় তাপমাত্রা ৮০° ফাঃ হইতে ৮৫° ফাঃ পর্যন্ত উঠে। তাই বাৎসরিক তাপের প্রসর খুব বেশী হয়। সমুদ্র হইতে জলীয়-বাষ্পপূর্ণ বায়ু এখানে পৌছিতে পৌছিতেই তাহার জলীয়বাষ্প প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। এইজন্য এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। বার্ষিক বারিপাতের পরিমাণ ১০" হইতে ১৫", তবে স্খাভানা অঞ্চল বা ক্রান্তীয় অঞ্চলের মত এখানে এত অধিক বাষ্পীভবন হয় না। এজন্য যেসব অঞ্চলে বারিপাত ১০" সেখানেও তৃণভূমি দেখা যায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে এত অল্প বারিপাত হইলে মরুসদৃশ ভূমিরই উৎপত্তি হইত।

যে সকল অঞ্চলে জলবায়ু চরম, গ্রীষ্মে উত্তাপও অধিক এবং বারিপাত কম, তথায় একমাত্র তৃণজাতীয় উদ্ভিজ্জই ভালভাবে জন্মিতে পারে। তাই এখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া তোমরা তৃণভূমিই দেখিতে পাইবে। গাছপালা বড় বিশেষ চোখে পড়ে না। আবার সর্বত্র একইরূপ তৃণভূমিও দেখা যায় না। তৃণ কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা, কোথাও বড়, কোথাও বা ছোট। এই তৃণভূমি বিভিন্ন ভূখণ্ডে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। উত্তর আমেরিকায় ইহার নাম **প্রেইরী** (Prairy), দক্ষিণ আমেরিকায় **প্যাম্পাস** (Pampas), দক্ষিণ আফ্রিকায় **ভেল্ড্** (Veldt), অষ্ট্রেলিয়ায় **ডাউন্স্** (Downs) নামে পরিচিত। রাশিয়ায় ইহাকে **স্তেপস্** (Steppes) বলা হয়। তাই এই প্রাকৃতিক অঞ্চলের নাম স্তেপভূমি দেওয়া হইয়াছে। এই স্তেপভূমি ইউরোপীয় রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশ হইতে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।


স্তেপ তৃণভূমি অঞ্চল
নিরক্ষ রেখা
প্রেইরী
প্যম্পাস
ভেল্ড
স্তেপ
মাঞ্চুরিয়ার সমভূমি
মারেডার্লিং সমভূমি
৬৬½°
২৩½°
০°
৯০°
১৮০°

১০২নং চিত্র

তৃণই এই অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিজ্জ, তাই এখানে তৃণভোজী জন্তু থাকাই স্বাভাবিক। আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার স্তেপ অঞ্চলে ঘোড়া, গাধা, উট এবং কৃষ্ণসার মৃগই প্রধান জন্তু। প্রেইরী অঞ্চলে বাইসন ও অষ্ট্রেলিয়ার ডাউন্স্ অঞ্চলে ক্যাঙ্গারু প্রধান জন্তু। শুধু এই সকল তৃণভোজী জন্তুই এখানে থাকে না। এই সকল জন্তুর মাংসের লোভে এখানে নেকড়ে বাঘ, বন্য কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুও অনেক আছে।

এই তৃণভূমিতে পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। ইউরেশিয়ার স্তেপ অঞ্চলে কিরঘিজ, কাজাক প্রভৃতি যাযাবর জাতি বাস করে। ইহারা গরু, ঘোড়া, উট, ছাগল ও ভেড়ার পাল লইয়া উৎকৃষ্ট তৃণভূমির সন্ধানে একস্থান হইতে



কিরঘিজ
১০৩নং চিত্র

অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সকল পশু হইতেই ইহারা নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল জিনিসই সংগ্রহ করে। ইহারা সামান্য পরিমাণে ব্যবসা-বাণিজ্যও করে। পশুলোম, পশুচর্ম ও কার্পেটের বিনিময়ে ইহারা নিজেদের প্রয়োজনীয়

কোন কোন জিনিস সংগ্রহ করে। সোভিয়েট সরকারের প্রচেষ্টার ফলে আজকাল জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়া স্তেপ অঞ্চলে চাষ আবাদ আরম্ভ করা হইয়াছে। সোভিয়েট সরকার এই সকল যাযাবর জাতিকে স্থায়ী কৃষক গোষ্ঠীতে পরিণত করার চেষ্টা করিতেছেন। রাশিয়ার স্তেপ অঞ্চলে আজকাল স্থায়ীভাবে অনেক গরু ও ভেড়া প্রতিপালিত হইতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয় রাশিয়ায় বিশেষতঃ কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলে কৃত্রিম সেচের ব্যবস্থার ফলে আজকাল প্রচুর গম, রাই প্রভৃতির চাষ হইতেছে। উত্তর আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলে প্রচুর গরু ও ভেড়া প্রতিপালিত হয়। ভেড়ার লোম এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। গরু ও ভেড়াগুলিকে সিকাগো প্রভৃতি অঞ্চলের কসাইখানায় প্রেরণ করা হয় এবং সেখান হইতে এই পশুমাংস প্রচুর পরিমাণে বিদেশে চালান যায়। আজকাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেইরী অঞ্চলের পূর্বাংশে জলসেচের সাহায্যে গমের চাষ হইতেছে। দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার এই স্তেপ জাতীয় তৃণভূমি অঞ্চলেও প্রচুর মেষ ও গরু প্রতিপালিত হয়। তাই কাঁচা পশম, এবং জমাট দুধ, মাখন ইত্যাদি এইসকল অঞ্চল হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান যায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পশুপালনই এই অঞ্চলগুলির বৈশিষ্ট্য।

উষ্ণ শীতোষ্ণ মণ্ডলের মরুপ্রায় ভূমি—উষ্ণ শীতোষ্ণ মণ্ডলের ভূভাগগুলির মধ্যভাগে কোন কোন অঞ্চল, বিশেষতঃ মধ্য এশিয়ার অনেক অঞ্চল পর্বতবেষ্টিত বলিয়া তথায় স্তেপভূমি অপেক্ষাও বারিপাত কম হয়। এই সকল অঞ্চল অনেকটা মরুভূমির মত। তারিম উপত্যকা, গোবি মরুভূমি, তুর্কিস্থানের মরু অঞ্চল, তিব্বতের মালভূমি এবং ইরাণ ও আনাতলিয়ার মালভূমির অভ্যন্তর ভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এছাড়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেও এইরূপ পরিবেশ পাওয়া যায়।

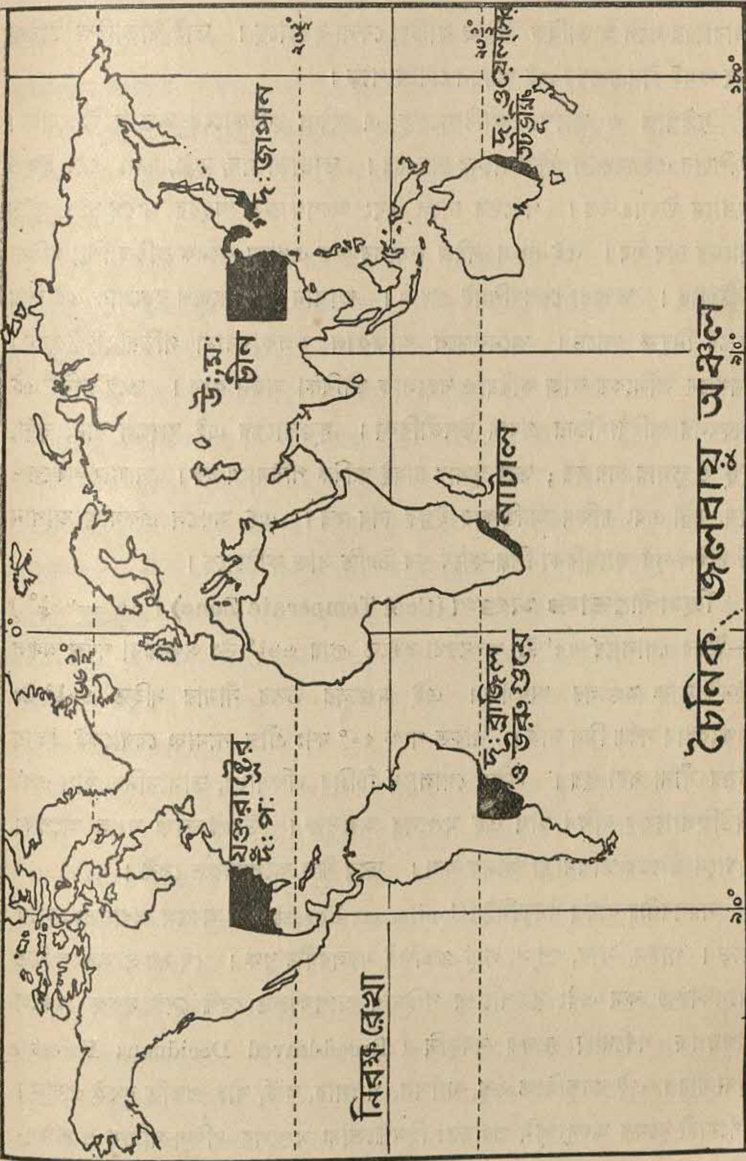
এখানে গ্রীষ্মকাল অত্যন্ত উষ্ণ, শীতকালে শীত খুব প্রচণ্ড। বৃষ্টিপাত খুবই কম। এ অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত সামান্য একটু বেশী সেখানে তৃণ জন্মে। সেই সকল স্থানে পশুপালন করা হয়। এ অঞ্চলে বসতি খুব কম। আজকাল অনেক স্থানে জল-সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে কোথাও কোথাও গম, ভুট্টা, যব, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ হইতেছে। তবে পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা।

চৈনিক জলবায়ুর অঞ্চল বা শীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চল—উষ্ণ শীতোষ্ণ মণ্ডলে বৃহৎ বৃহৎ ভূখণ্ডের পূর্ব ভাগ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। এই প্রাকৃতিক বিভাগের বৈশিষ্ট্য চীনদেশের পূর্বাংশের অঞ্চলগুলিতে অত্যন্ত পরিস্ফুট, তাই এই বিভাগকে চৈনিক জলবায়ুর অঞ্চল বলা হয়। আবার এই অঞ্চলে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহা শীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চল নামেও পরিচিত।

উত্তর ও মধ্যচীন, কোরিয়া উপদ্বীপের পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, ব্রাজিলের দক্ষিণাংশ, উরুগুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভারত মহাসাগর তীরবর্তী অঞ্চল, অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ কুইন্সল্যাণ্ড ও নিউ সাউথ ওয়েলসের পূর্ব উপকূল শীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। মোটামুটিভাবে ২৫° হইতে ৪০° অক্ষরেখার মধ্যবর্তী স্থান লইয়াই ইহা গঠিত বলা যাইতে পারে।

এই অঞ্চলে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় একথা আগেই বলা হইয়াছে। এই বায়ু প্রবাহের ফলে এই অঞ্চলে প্রচুর বারিপাত হয়। শীতকালে খুব অল্প বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালেই অধিক বৃষ্টিপাত হয়। চীনদেশে গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ু অপেক্ষা শীতের মৌসুমী বায়ু প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হয়। ইহা আমাদের দেশের মৌসুমী বায়ুর ঠিক বিপরীত। আমাদের দেশে গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ু প্রবল, শীতের মৌসুমী বায়ু মৃদু। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। পাহাড় পর্বতের অবস্থানের উপর বারিপাতের পরিমাণ অনেকখানি নির্ভর করে। জানুয়ারী মাসের গড় তাপমাত্রা কখনও হিমাঙ্কের নীচে নামে না। গ্রীষ্মকালেও অত্যধিক গরম পড়ে না। শীত ও গ্রীষ্মের তাপ-বৈষম্য প্রায় ২৫° ফাঃ হইতে ৩০° ফাঃ। শীতকালে যখন উত্তরের হিমশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে তখন উত্তর চীনে কখন কখনও দৈনিক সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নামিয়া যায়।

তাপ ও বারিপাতের আধিক্য হেতু প্রশস্তপত্র চিরহরিৎ বৃক্ষই এখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ। তুঁতগাছ, সেডার, ম্যাগনোলিয়া প্রভৃতি বৃক্ষ এই অঞ্চলে দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়াতে এই সকল অঞ্চলে তোমরা অনেক ইউকেলিপটাস বৃক্ষ দেখিতে পাইবে। তাছাড়া ফার্ণ জাতীয় বৃক্ষও অনেক আছে। চীনদেশে প্রচুর বাঁশবনও দেখা যায়। তবে অনেক স্থানে বিশেষতঃ চীনদেশে বহুযুগব্যাপী চাষ



১০৪নং চিত্র

আবাদের ফলে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। তাই স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ খুব কমই চীন দেশের এই অঞ্চলে চোখে পড়ে।

বৃষ্টিপাত ও তাপের আধিক্যহেতু এ অঞ্চল কৃষিকার্যের অত্যন্ত উপযোগী। এশিয়ার এই অঞ্চলে প্রচুর ধানের চাষ হয়। তাছাড়া গম, ভুট্টা, তূলা এবং ইক্ষুও এখানে উৎপন্ন হয়। পর্বতের ঢালে এবং অপেক্ষাকৃত অনুর্বর অংশে চা ও তুঁত গাছের চাষ হয়। এই সকল কৃষিজ ফসলের জন্য এখানে অনেক কৃষিজ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে রেশমশিল্পই প্রধান। জাপান ও চীনদেশে বহুলোক এই শিল্প কার্যে নিযুক্ত আছে। অনেকস্থলে আজকাল কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। সেখানে শ্রমিকের কাজ করিয়াও বহুলোক জীবিকা অর্জন করে। তবে কৃষিই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। যুক্তরাষ্ট্রের এই অঞ্চলে ধান, ভুট্টা, ইক্ষু ও তূলার চাষ হয়; তবে তূলার চাষই অধিক পরিমাণে হয়। অন্যান্য অঞ্চলেও গম, ভুট্টা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ইক্ষুর চাষ হয়। এই অঞ্চলে একমাত্র জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকা শিল্প-কার্যে খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে।

হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল (Cool Temperate Zone) (৪৫°—৬৬½°) —উত্তর গোলার্ধে ৪৫°উঃ অক্ষরেখা হইতে প্রায় ৬৬½° উঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত অঞ্চল হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত। এই মণ্ডলের উত্তর সীমার সহিত ৬৬½° উঃ অক্ষরেখার সর্বত্র মিল নাই। প্রকৃত পক্ষে ৫০° ফাঃ গ্রীষ্ম সমোষ্ণ রেখাকেই ইহার উত্তর সীমা ধরা হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে চিলির দক্ষিণাংশ, তাসমেনিয়া দ্বীপ এবং নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপ এই মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডল অপেক্ষা এখানে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা অনেক কম। তবে শীত অপেক্ষাকৃত বেশী।

সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমিই (Coniferous Forest) এ অঞ্চলে প্রধানতঃ চোখে পড়ে। পাইন, ফার, স্প্রুস্, লার্চ্ প্রভৃতিই সরলবর্গীয় বৃক্ষ। যে সকল অঞ্চলে শীত অপেক্ষাকৃত কম এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী সেই সকল অঞ্চলে প্রশস্তপত্র পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি (Broad-leaved Deciduous Forest) দেখা যায়। এই বনভূমিতে ওক্, ম্যাপল, পপলার, বার্চ, বীচ প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান। পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যভূমি প্রধানতঃ হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলের দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তেই দেখা যায়। হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলকে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ

করা হইয়াছে :— (ক) পশ্চিমভাগে—বৃটিশ জলবায়ুর অঞ্চল, (খ) মধ্যভাগে—সাইবেরীয় জলবায়ুর অঞ্চল, এবং (গ) পূর্বভাগে—লরেন্সীয় জলবায়ুর অঞ্চল।

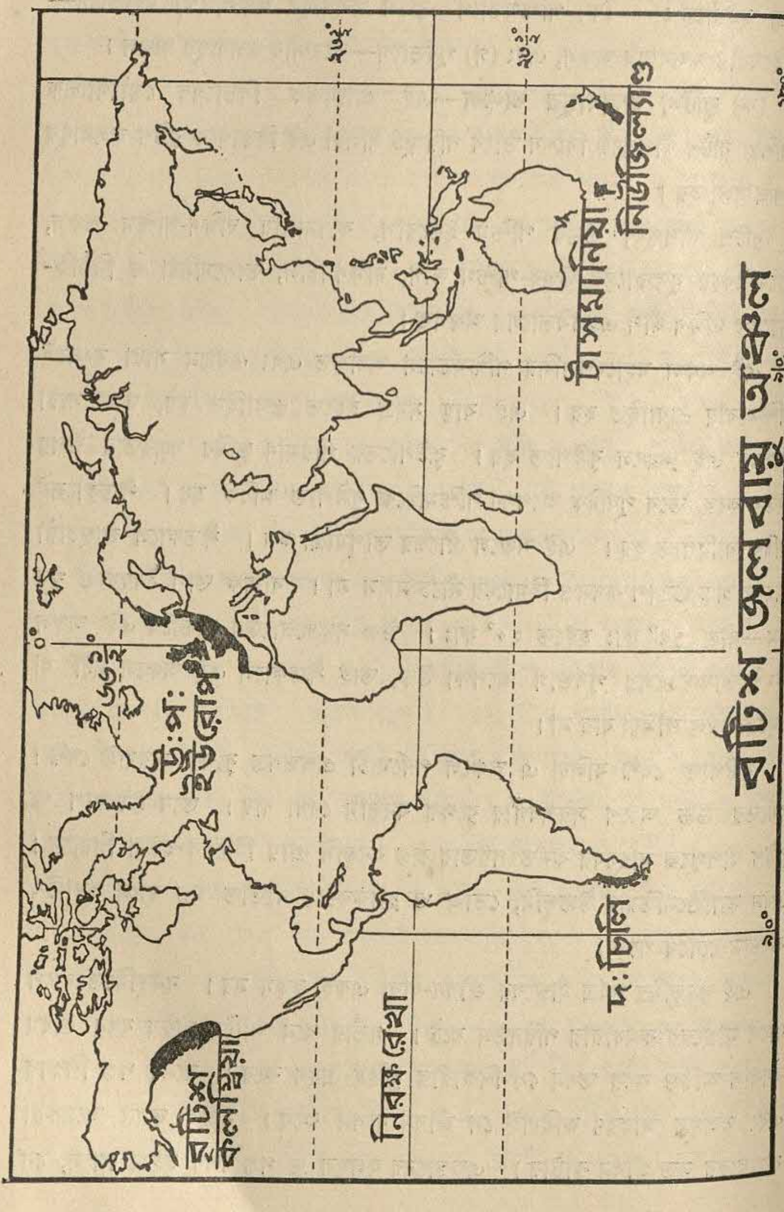
(ক) **বৃটিশ জলবায়ুর অঞ্চল**—এই প্রাকৃতিক বিভাগের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট বলিয়া এই বিভাগকে বৃটিশ জলবায়ুর অঞ্চল বলা হয়।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর পশ্চিম ইউরোপ, ক্যানাডার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম ভাগ, দক্ষিণ চিলি, তাসমেনিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপ এই বিভাগের অন্তর্গত।

এই অঞ্চল মহাদেশগুলির পশ্চিমভাগে অবস্থিত এবং এখানে সারা বৎসরই পশ্চিমাবায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ু সমুদ্র হইতে প্রবাহিত হয়, তাই সারা বৎসরই এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ভূমির বন্ধুরতার উপর নির্ভর করে, তবে পূর্বদিক অপেক্ষা পশ্চিমদিকে বৃষ্টিপাত অধিক হয়। শীতকালেই অধিক বারিপাত হয়। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা কম। শীতকালে জানুয়ারী মাসের গড় উত্তাপ কখনও হিমাঙ্কের নীচে নামে না। বার্ষিক তাপ বৈষম্যও খুব কম—মাত্র ১৫° ফাঃ হইতে ২০° ফাঃ। উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে এই অঞ্চল হিমশীতোষ্ণমণ্ডলের পূর্বভাগ অপেক্ষা উষ্ণ, তাই শীতকালে এই অঞ্চলে নদী বা সমুদ্রের জল জমিয়া যায় না।

বৃষ্টিপাত বেশী বলিয়া এ অঞ্চলে পর্ণমোচী প্রশস্তপত্র বৃক্ষের অরণ্যই বেশী। পর্বতের উচ্চ অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। তবে ইউরোপ ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে মানুষের কর্মতৎপরতার জন্য বনভূমি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এখন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উচ্চভূমি, ভোজ ও ব্ল্যাকফরেষ্ট ব্যতীত অন্য স্থানে কদাচিৎ বনভূমি চোখে পড়ে।

এই বনভূমির সর্বত্র মানুষের জীবন-ধারা একই রকম নয়। বনভূমিতে ধাপে ধাপে মানুষের কর্মধারার পরিবর্তন ঘটে। গভীর বনে আদিম মানুষ যখন প্রথম বসবাস আরম্ভ করে তখন সে শিকারীর বৃত্তিই গ্রহণ করে। বনের পশু শিকার এবং ফলমূল আহরণ করিয়াই সে জীবন যাপন করে। মানুষ তখন অনেকটা যাযাবরের মত জীবন কাটায়। একস্থানের ফলমূল ও পশু শেষ হইয়া গেলে, সে


বৃটিশ জলবায়ু অঞ্চল
বৃটিশ কলম্বিয়া
উ:প: ইউরোপ
নিরক্ষ রেখা
দ:চিলি
টাসমানিয়া
নিউজিল্যাণ্ড
৬৬½°
২৩½°
২৩½°
০°
৯০°
৯০°
১৮০°

১০৫নং চিত্র

এইসবের সন্ধানে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এইভাবে অরণ্যভূমিতে মানুষ শিকারীর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাযাবরের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। সভ্যতার কিছুটা বিকাশ ঘটিলে মানুষ কাঠুরিয়ার বৃত্তি অবলম্বন করে। তখন সে কাঠ কাটে ও ঐগুলি বিক্রয় করে এবং সামান্য ব্যবসা বাণিজ্যও আরম্ভ করে। সভ্যতার আরও কিছুটা উন্নতি হইলে মানুষ বনভূমি পরিষ্কার করিয়া চাষ আবাদ আরম্ভ করে। তখন সে কৃষকের বৃত্তি অবলম্বন করে। তারপর জ্ঞান বিজ্ঞানে



ক্যানাডার কাষ্ঠ-চেরাই কারখানা
১০৬নং চিত্র

সভ্য হইয়া উঠিলে এবং কোন শক্তির (কয়লা, জলবিদ্যুৎ, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি) সন্ধান পাইলে মানুষ উহার সাহায্যে বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া তোলে। অরণ্যভূমিতে মানুষের কর্মধারার ক্রমবিবর্তন এইভাবেই সংঘটিত হয়। এই জন্যই বৃটিশ জলবায়ু অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে মানুষের কর্মধারা বিভিন্ন।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের বাস।

ইহারা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে এবং যান্ত্রিক সভ্যতায় অনেক উন্নত। খনিজ কয়লাও এখানে প্রচুর আছে, লৌহও অনেক পাওয়া যায়। তাই এখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শিল্পাঞ্চল। কলকারখানার শ্রমিক ও মজুরের কাজই একানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিকার্য করিয়াও কিছু সংখ্যক লোক জীবিকা অর্জন করে। ব্যবসা বাণিজ্যেও বহু লোক নিযুক্ত আছে।

চিলি, তাসমেনিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপে বনভূমি পরিষ্কার করিয়া চাষ-আবাদ এবং পশুচারণ হইতেছে। কৃষিকার্য, মেষ ও গো-পালন এখানকার অধিবাসীদের প্রধান কাজ। মেষ হইতে পশম ও গোদুগ্ধ হইতে ঘি, মাখন ও জমাট দুধ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াও বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

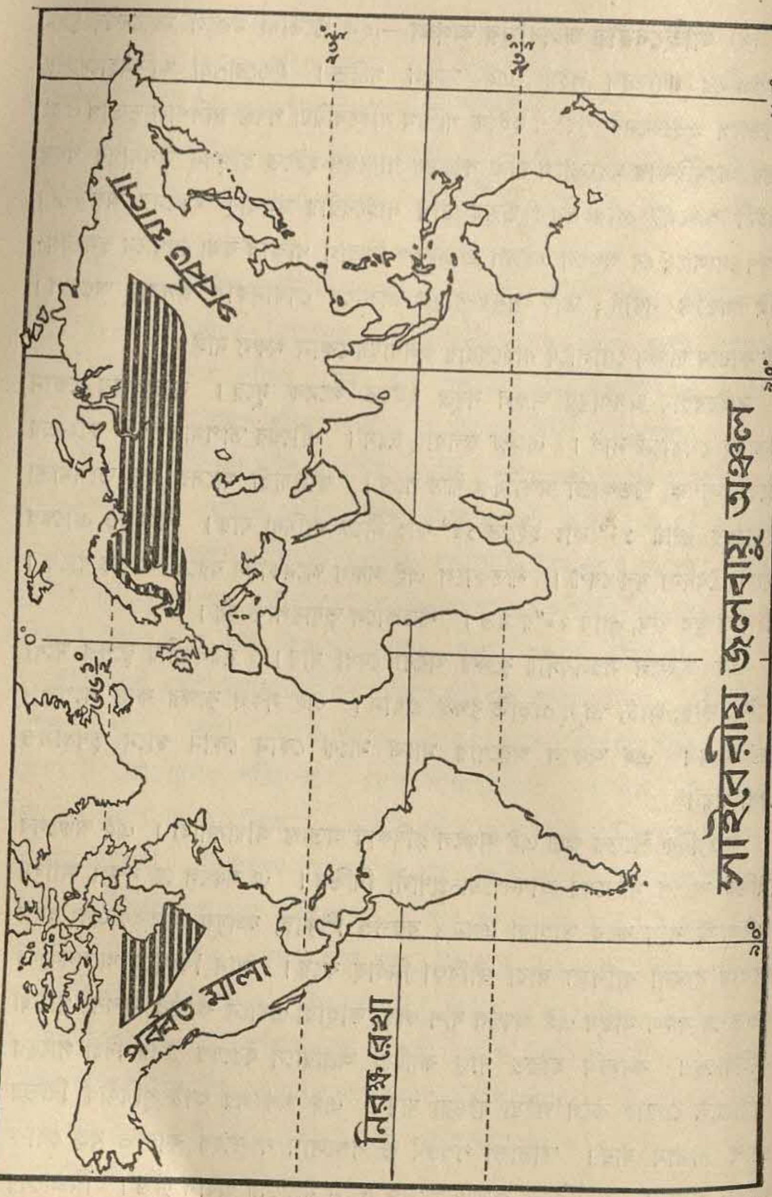
উত্তর আমেরিকার বৃটিশ কলাম্বিয়া প্রভৃতি অঞ্চলও এই প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। এই স্থানের অধিবাসীদের জীবন-প্রণালী অন্য রকম। এখানকার হুটকা, হাইডা প্রভৃতি আদিবাসীরা এখনও সভ্যতার প্রথম স্তরে আছে। ইহারা নদীর মাছ, বনের পশু শিকার এবং বন্য ফলমূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানে অনুন্নত, তাই ইহাদের জীবনধারা এইরূপ। অন্যদিকে এই একই অঞ্চলে যে সকল শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী আছে তাহাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ পৃথক। তাহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত। তাই তাহারা নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী ভৌগোলিক পরিবেশকে কাজে লাগাইয়াছে। তাহারা এই অঞ্চলে কাঠের ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়াছে ও বনভূমি হইতে কাঠ কাটিয়া পৃথিবীর বিভিন্নদেশে চালান দিতেছে। উপকূলের সমুদ্রে কড্, হেরিং, স্যামন্ প্রভৃতি মৎস্য প্রচুর পাওয়া যায়। নদীগুলিতেও প্রচুর মৎস্য আছে। তাই বহু শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত আছে। ইহারা কাঁচা মাছ, টিনে-বদ্ধ মাছ এবং মাছের তেলের ব্যবসাও গড়িয়া তুলিয়াছে। বৃটিশ জলবায়ুর অঞ্চলে মানুষের জীবন-প্রণালীর এই বিভিন্নতার আরও একটি কারণ আছে। শুধু মাত্র ভৌগোলিক পরিবেশের উপরই কোন স্থানের মানুষের কর্মধারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে না। তাহার জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর অর্থাৎ পরিবেশকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতার উপরও তাহার জীবনধারা অনেকখানি নির্ভর করে।

(খ) **সাইবেরীয় জলবায়ুর অঞ্চল**—হিম শীতোষ্ণ মণ্ডলে মহাদেশীয় বৃহৎ ভূখণ্ডগুলির মধ্যভাগ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। ইউরেশিয়া অতিমহাদেশের মধ্যভাগে সুইডেনের পূর্বাংশ হইতে পশ্চিম সাইবেরিয়া পর্যন্ত সুবিশাল ভূভাগ এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগে রকি পর্বতের পাদদেশ হইতে হাড্‌সন্ উপসাগর পর্যন্ত প্রেইরী অঞ্চলের প্রায় সমগ্র উত্তর ভাগ সাইবেরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ গোলার্ধে যে অঞ্চলে এইরূপ প্রাকৃতিক বিভাগ থাকার কথা সেখানে স্থলভাগ-গুলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; তাই সমুদ্র-বায়ুর প্রভাবে সেখানকার জলবায়ু অন্যরূপ। এই কারণে দক্ষিণ গোলার্ধে সাইবেরীয় জলবায়ুর কোন অঞ্চল নাই।

সাইবেরীয় জলবায়ুর অঞ্চল সমুদ্র হইতে অনেক দূরে। সমুদ্রবায়ুর কোন প্রভাবই সেখানে নাই। এজন্য জলবায়ু চরম। গ্রীষ্মের তাপমাত্রা ৭০° ফাঃ-এর চেয়েও অধিক, শীতকালে অত্যধিক শীত পড়ে। জানুয়ারী মাসের গড় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের প্রায় ১০° ফাঃ হইতে ১৫° ফাঃ নীচে নামিয়া যায়। শীত ও গ্রীষ্মের তাপের বৈষম্য খুব বেশী। শীতকালে এই অঞ্চল অনেকদিন বরফে আবৃত থাকে। বৃষ্টিপাত খুব কম, প্রায় ২০"র মত। শীতকালে তুষারপাত হয়।

এই অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। সরলবর্গীয় বৃক্ষের মধ্যে পাইন, ফার, লার্চ, স্প্রুস্ প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান। এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ অপেক্ষা-কৃত নরম। এই অঞ্চলে অরণ্যের মাঝে মাঝে কোন কোন স্থানে তৃণভূমিও দেখা যায়।

অত্যধিক শীতের জন্য এই অঞ্চলে কৃষিকার্য অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিভিন্ন। এ অঞ্চলে যে সকল আদিম অধিবাসী বাস করে তাহারা এখনও বন্যপশু শিকার, ফলমূল আহরণ এবং বনজ দ্রব্যের ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। জ্ঞান বিজ্ঞানে অপেক্ষাকৃত উন্নত যে সকল মানুষ এই অঞ্চলে বাস করে, তাহারা এখানে কাঠের ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়াছে। বনভূমি হইতে গাছ কাটিয়া অল্পায়াসে বরফের উপর দিয়া গাছের গুঁড়িগুলি চেরাই কলে লইয়া যাওয়া যায়। এই অঞ্চলের কাঠ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান যায়। তাছাড়া পশুচর্ম ও পশুলোম সংগ্রহের কার্যেও বহু লোক নিযুক্ত আছে। কাঠুরিয়ার কাজই অনেক স্থানে মানুষের প্রধান বৃত্তি। বিজ্ঞানের



১০৭নং চিত্র

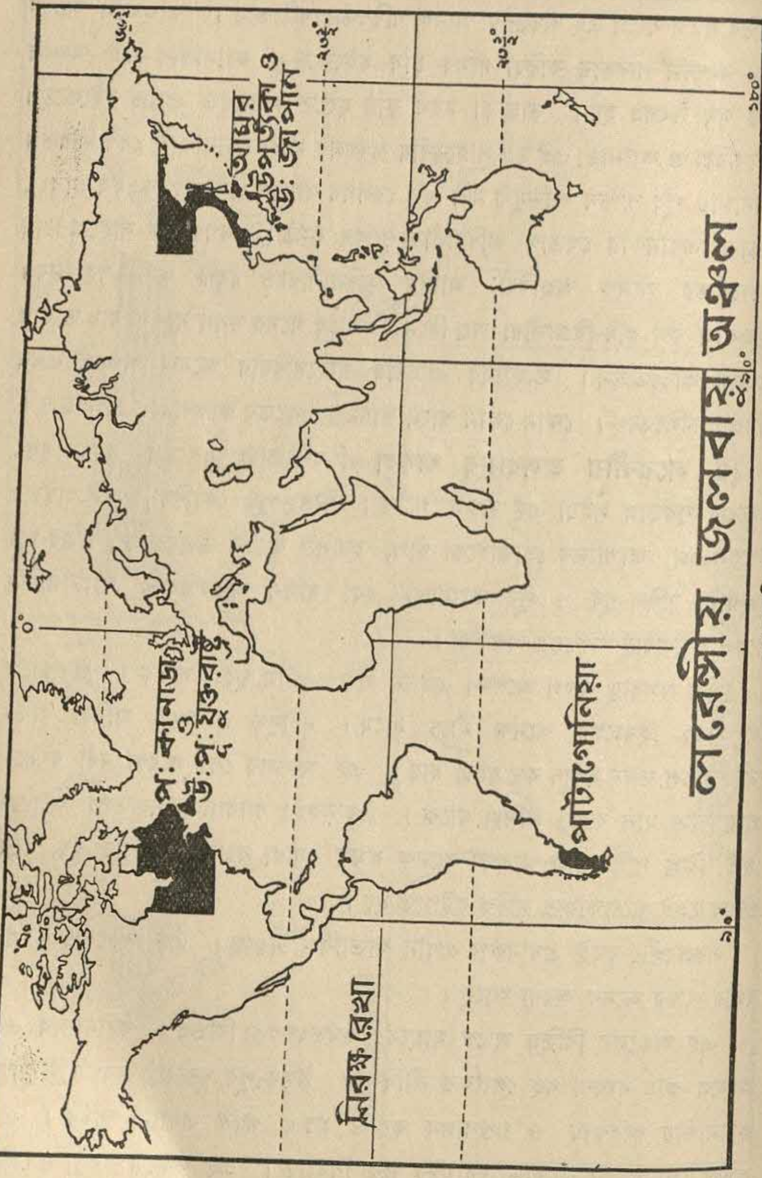
উন্নতির সংগে সংগে এই অঞ্চলের অনেক পরিবর্তন ঘটিতেছে। আজকাল অনেক স্থানে বনভূমি পরিষ্কার করিয়া গমের চাষ হইতেছে। ক্যানাডার এই অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। তাছাড়া নরম কাষ্ঠ হইতে কাষ্ঠমণ্ডও প্রস্তুত হইতেছে। সাইবেরিয়া ও ক্যানাডা এই দুই সাইবেরীয় অঞ্চলের মধ্যে ক্যানাডাই বেশী উন্নত। ক্যানাডায় পূর্ব-পশ্চিম অভিমুখী নদী এবং রেলপথ থাকায় যাতায়াতের খুব সুবিধা, তাছাড়া এখানকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরাও খুব কর্মঠ। অপরপক্ষে সাইবেরিয়ায় যাতায়াতের অনেক অসুবিধা, আদিম অধিবাসীরাও বেশী কর্মতৎপর নয়। আজকাল রুশ কৃষি-বিজ্ঞানীরা অল্প দিনে কিভাবে গমের ফসল পাওয়া যায় তাহার গবেষণা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় সাইবেরিয়ার অনেক অঞ্চলে এখন কৃষিকার্য চলিতেছে। কোন কোন স্থানে কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুতের কারখানাও চলিতেছে।

(গ) **লরেন্সীয় জলবায়ুর অঞ্চল**—হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলের বৃহৎ বৃহৎ ভূখণ্ডের পূর্বভাগ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। উত্তর-পূর্ব কোরিয়া, সাইবেরিয়ার উপকূলভাগ, জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপ, হনসিউ দ্বীপের উত্তরভাগ; উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব ক্যানাডা এবং দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগনিয়া লরেন্সীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

বৃটিশ জলবায়ু অঞ্চল অপেক্ষা এখানে শীত ও গ্রীষ্ম দুইই অধিক। শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে নামে। নদীমুখ ও সমুদ্র জমিয়া যায়। নৌ-চলাচল তখন সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। এই অঞ্চলের সেণ্ট্ লরেন্স নদী বৎসরে প্রায় সাত মাস বরফে জমিয়া থাকে। এখানকার বারিপাত মধ্যভাগ অপেক্ষা বেশী, কিন্তু পশ্চিমভাগ অপেক্ষা অনেক কম। সারা বৎসরই বৃষ্টিপাত হয়, তবে গ্রীষ্মকালেই অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টিপাত হয়।

সরলবর্গীয় বৃক্ষই এখানকার প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ। এই অঞ্চলেও সরল-বর্গীয় বৃক্ষের অনেক অরণ্য আছে।

এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে মানুষের কর্মতৎপরতা বিভিন্ন। ক্যানাডার এই অঞ্চলে কাষ্ঠ ব্যবসা বহু লোকের জীবিকা। উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ-পূর্ব ক্যানাডায় কৃষিকার্য ও পশুপালন করাও হয়। গরুই এখানে অধিক। এই অঞ্চল গো-দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির জন্য বিখ্যাত। এই অঞ্চলে কয়লা ও লৌহ


লরেন্সীয় জলবায়ু অঞ্চল
আমুর উপত্যকা ও উঃ জাপান
পঃ কানাডা ও উঃ পঃ যুক্তরাষ্ট্র
পাটাগোনিয়া
নিরক্ষ রেখা

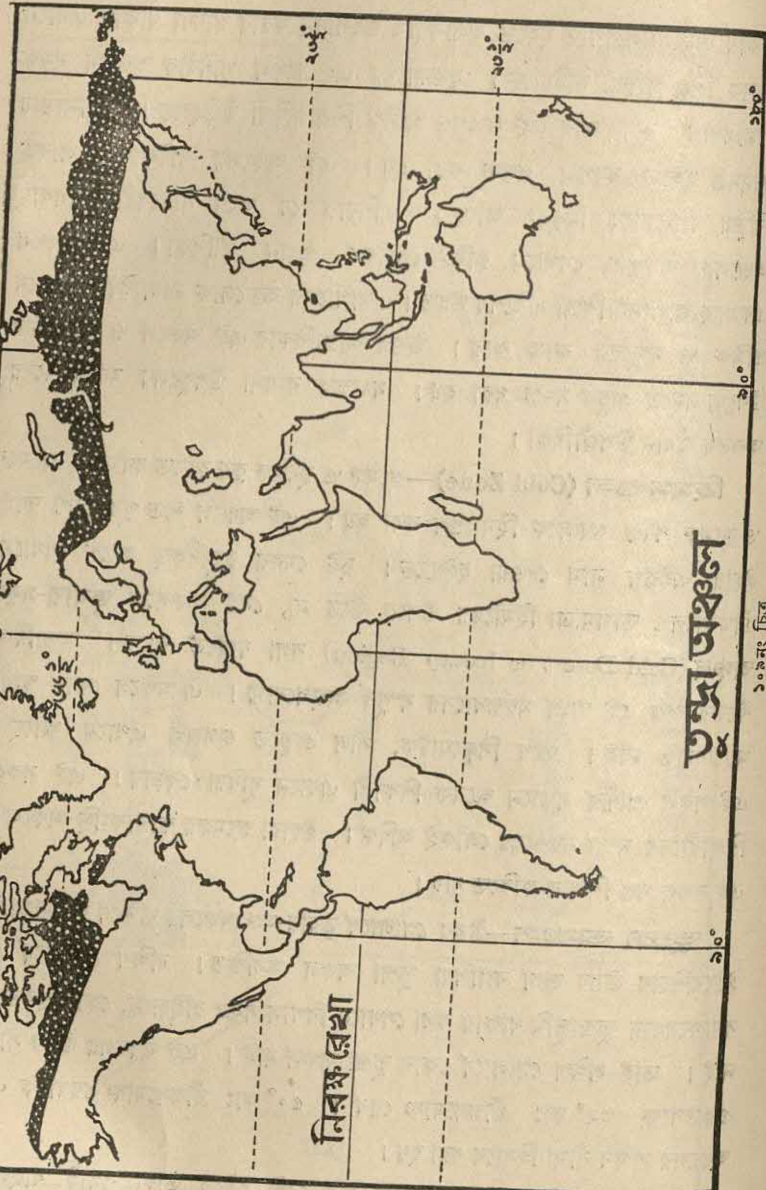
চিত্র নং ১০৮

থাকায় এবং জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার সুবিধা থাকায় এখানে অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল। ক্যানাডার এই অংশেও অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্যানাডায় কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করা হয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই বিভিন্ন শিল্পকার্যে নিযুক্ত আছে। এশিয়ার যে অংশ সাইবেরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত, সেখানে কৃষিই লোকের প্রধান জীবিকা। এই অঞ্চলে একমাত্র জাপানই শিল্পে সবিশেষ উন্নত। জাপানের বহু লোক নানাবিধ শিল্পকার্যে শ্রমিক ও মজুরের কাজ করে। উত্তর আমেরিকার এই অঞ্চলে ও জাপানের উপকূল সমুদ্রে প্রচুর মৎস্য ধরা হয়। মৎস্যের ব্যবসা উপকূলের অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা।

হিমমণ্ডল (Cold Zone)—সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত হইতে যথাক্রমে সুমেরু ও কুমেরু পর্যন্ত অঞ্চলকে হিমমণ্ডল বলা হয়। এই অঞ্চলে শীত খুব বেশী তাই ইহার এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে। দুই মেরুর চতুর্দিকস্থ অংশে যেখানে গ্রীষ্মকালেও তাপমাত্রা হিমাঙ্কের উপরে উঠে না, সেই অঞ্চলকে **তুষার-মরু অঞ্চল** (Cold Desert or Icecap Region) বলা যাইতে পারে। অত্যধিক শীতের জন্য এই অংশ মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এ অঞ্চলে কোন স্থায়ী মনুষ্যবসতি নাই। তবে সিন্ধুঘোটক, সীল প্রভৃতি জলজন্তু এখানে আছে। এই সকল প্রাণীর সন্ধানে অনেক শিকারী এখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সকল শিকারীদের মধ্যে নরওয়ের লোকই অধিক। ইহারা সুমেরুর কাছাকাছি অঞ্চলেও এই সকল পশু শিকার করিতে যায়।

তুন্দ্রা অঞ্চল—উত্তর গোলার্ধে তুষার-মরু অঞ্চলের দক্ষিণে ক্যানাডা ও ইউরেশিয়ার উত্তর ভাগ ব্যাপিয়া তুন্দ্রা অঞ্চল অবস্থিত। দক্ষিণ গোলার্ধে যে সমাক্ষরেখায় তুন্দ্রাভূমি থাকার কথা সেখানে বিশাল সমুদ্র রহিয়াছে, কোন স্থলভাগ নাই। তাই দক্ষিণ গোলার্ধে কোন তুন্দ্রা অঞ্চল নাই। এই অঞ্চলের উত্তর সীমা প্রকৃতপক্ষে ৩২° ফাঃ গ্রীষ্মসমোষ্ণ রেখা। ৫০° ফাঃ গ্রীষ্মসমোষ্ণ রেখাকে এই অঞ্চলের দক্ষিণ সীমা হিসাবে ধরা হয়।

এই অঞ্চলে শীতের প্রকোপ যে খুব বেশী হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।



১০৪নং চিত্র

বৎসরের অধিকাংশ সময়ই এই অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। গ্রীষ্মকালেই বেশী বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে খুব তুষারপাত হয়। বাৎসরিক বৃষ্টি ও তুষারের পরিমাণ ১০"-র অধিক হয় না।

অত্যধিক শীতের জন্য এখানে কোন বৃক্ষ জন্মে না। তবে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যখন বরফ গলিতে আরম্ভ করে তখন নানাজাতীয় শৈবাল, ছোট ছোট গুল্ম ও চারা গাছের ঝোপ ও লিচেন (Lichen) নামক একপ্রকার শৈবাল জন্মে।

এই অঞ্চলের সমুদ্রে তিমি, সীল, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি অনেক জলজন্তু আছে। স্থলচর প্রাণীর মধ্যে ইউরেশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে বল্গা হরিণ এবং ক্যানাডার তুন্দ্রা অঞ্চলে ক্যারিবুই প্রধান। বল্গা হরিণ ইউরেশিয়ার তুন্দ্রাবাসীদের গৃহপালিত জন্তু। এছাড়া তুন্দ্রাবাসীরা সকলেই কুকুর পুষিয়া থাকে। শ্বেত ভল্লুক, নেকড়ে, নকুল প্রভৃতি জন্তু সর্বত্রই আছে।

তুন্দ্রা অঞ্চলের সর্বত্র একই জাতির মানুষ বাস করে না। সকল স্থানে তুন্দ্রাবাসীদের জীবনধারণ প্রণালীও একরূপ নহে। ইউরোপের তুন্দ্রাভূমির ল্যাপ্ল্যাণ্ড দেশে **ল্যাপ্**, ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়ায় **ফিন্** এবং সাইবেরিয়ায় **সাময়েদ্** ও **ইয়াকুত্** প্রভৃতি জাতি বাস করে। ক্যানাডার তুন্দ্রা ভূমিতে **এস্কিমো** জাতির বাস। ইহারা সাধারণতঃ সমুদ্র উপকূলেই বাস করে, কারণ সমুদ্র হইতেই ইহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অধিকাংশ সংগ্রহ করিতে হয়।

এই বরফের দেশে কৃষিকার্য সম্ভব নয় তাহা তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ। এখানে গাছপালা নাই। তাই বন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়া যে জীবিকা নির্বাহ করিবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। তাই জল ও স্থলের জীবজন্তুর উপর নির্ভর করা ছাড়া ইহাদের আর কোন উপায় নাই।

ইউরেশিয়ার তুন্দ্রাবাসীরা বল্গা হরিণ পালন করে। এই বল্গা হরিণ হইতেই ইহারা জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক প্রায় সব জিনিসই সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহারা বল্গা হরিণের মাংস খায়, চামড়া হইতে পোষাক, তাঁবুর আচ্ছাদন প্রভৃতি তৈয়ারী করে। নাড়ীগুলি শুকাইয়া দড়ির কাজে লাগায়। হাড় দিয়া ছোট ছোট তাঁবুর কাঠামো ও স্লেজগাড়ীর কাঠামো তৈয়ারী করে। এইখানেই শেষ নয়। বল্গা হরিণকে ইহারা ভারবাহী পশুর কাজেও নিযুক্ত করে। এই

বল্গা হরিণই বরফের উপর দিয়া স্লেজগাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। ইউরেশিয়ার এই তুন্দ্রাবাসীরা কোন এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। ইহারা অনেকটা যাযাবর প্রকৃতির। লিচেন, শৈবাল, গুল্মাদি বল্গা হরিণের খাদ্য। এই খাদ্যের সন্ধানেই এই তুন্দ্রাবাসীরা পশুপাল লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

এস্কিমোরা বল্গা হরিণ পালন করে না। কুকুরই ইহাদের একমাত্র গৃহপালিত জন্তু। কুকুরই বরফের উপর দিয়া ইহাদের স্লেজগাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। শিকারই এস্কিমোদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা সমুদ্রে সীল মাছ, তিমি ও সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি প্রাণী এবং স্থলভাগে শ্বেতভল্লুক, ক্যারিবু প্রভৃতি শিকার করে। এস্কিমোরা এই সব প্রাণীর মাংস খায়, দুর্দিনের জন্য অনেক সময় সঞ্চয় করিয়াও রাখে। ক্যারিবুর চামড়া হইতে ইহারা পোষাক, শয্যাদ্রব্য, তাঁবুর আচ্ছাদন এবং শিরা ও নাড়ী দিয়া দড়ি এবং হাড় দিয়া অস্ত্র তৈয়ারী করে। সীল মাছের হাড় দিয়া ইহারা তাঁবু, নৌকা ও স্লেজগাড়ীর কাঠামো তৈয়ারী করে। এই এস্কিমোরাও বেশী দিন এক স্থানে থাকিতে পারে না। সমুদ্র ও স্থলভাগের প্রাণীর সংখ্যা কমিয়া আসিলেই ইহারা ভাল শিকারের প্রত্যাশায় অন্যত্র চলিয়া যায়, এইভাবে ইহারাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য

ধান—ধান মৌসুমী অঞ্চলের সর্বপ্রধান কৃষিজ দ্রব্য। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্য ভাত। মৌসুমী অঞ্চলে অনেক প্রকার ধান উৎপন্ন হয়। একমাত্র ভারতবর্ষেই প্রায় পাঁচ হাজার রকমের ধানের চাষ হয়।

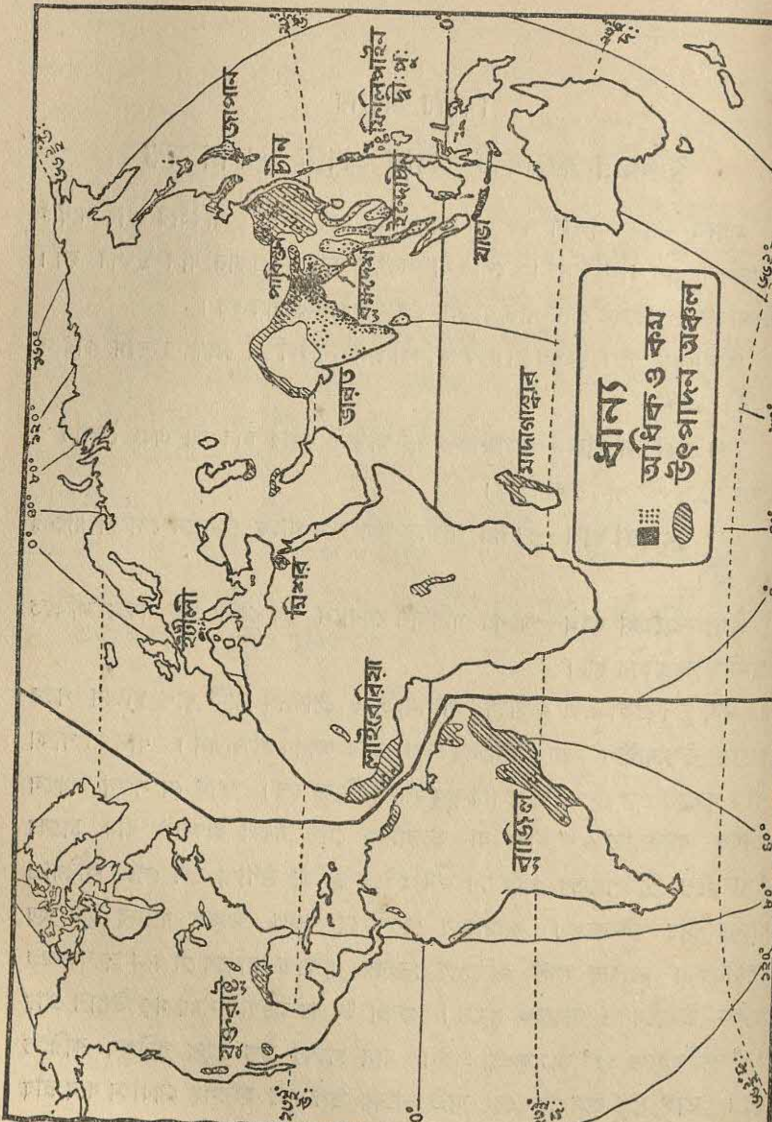
আমাদের দেশে উৎপন্ন ধান্যকে আমরা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। যেমন—

(ক) **আউস ধান**—অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে ইহার চাষ হয় এবং বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ধান বোনা হয়।

(খ) **বোরো ধান**—যে সব জমিতে জল কম থাকে সেখানে বোরো ধানের চাষ হয়।

(গ) **আমন ধান**—জলের পরিমাণ যেখানে খুব বেশী সেই সকল জমিতে আমন ধানের চাষ হয়।

নদী উপত্যকা এবং ব-দ্বীপের পলিমাটি ও দোআঁশ মাটি ধান্য চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। ভাল ফসলের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন। ধান না পাকা পর্যন্ত গাছের গোড়া জলের তলায় ডুবাইয়া রাখিতে হয়। তাই যে সকল অঞ্চলে বার্ষিক বারিপাত ৪০" ইঞ্চি বা ততোধিক সেই সকল অঞ্চলই ধান চাষের উপযোগী। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হইলে কৃত্রিম উপায়ে জল সেচন করিয়াও ধানের চাষ হইতেছে। আমাদের দেশে যে সকল অঞ্চলে ধানের চাষ হয় সেখানকার জলবায়ু লক্ষ্য করিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে ধান চাষের জন্য অধিক উত্তাপেরও আবশ্যক আছে। ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় গড় উত্তাপ প্রায় ৭০° ফাঃ হইতে ৭৫° ফাঃ হওয়া চাই। ধান চাষের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়। তাই শুধু জলবায়ু এবং মাটি চাষের উপযোগী হইলেই সেখানে ধান চাষ লাভজনক নাও হইতে পারে। তার জন্য অল্প পারিশ্রমিকে প্রচুর শ্রমিক চাই।


ধান
অধিক ও কম
উৎপাদন অঞ্চল
জাপান
চীন
ভারত
জাভা
মাদাগাস্কার
মিশর
ইতালী
ব্রাজিল
যুক্তরাষ্ট্র

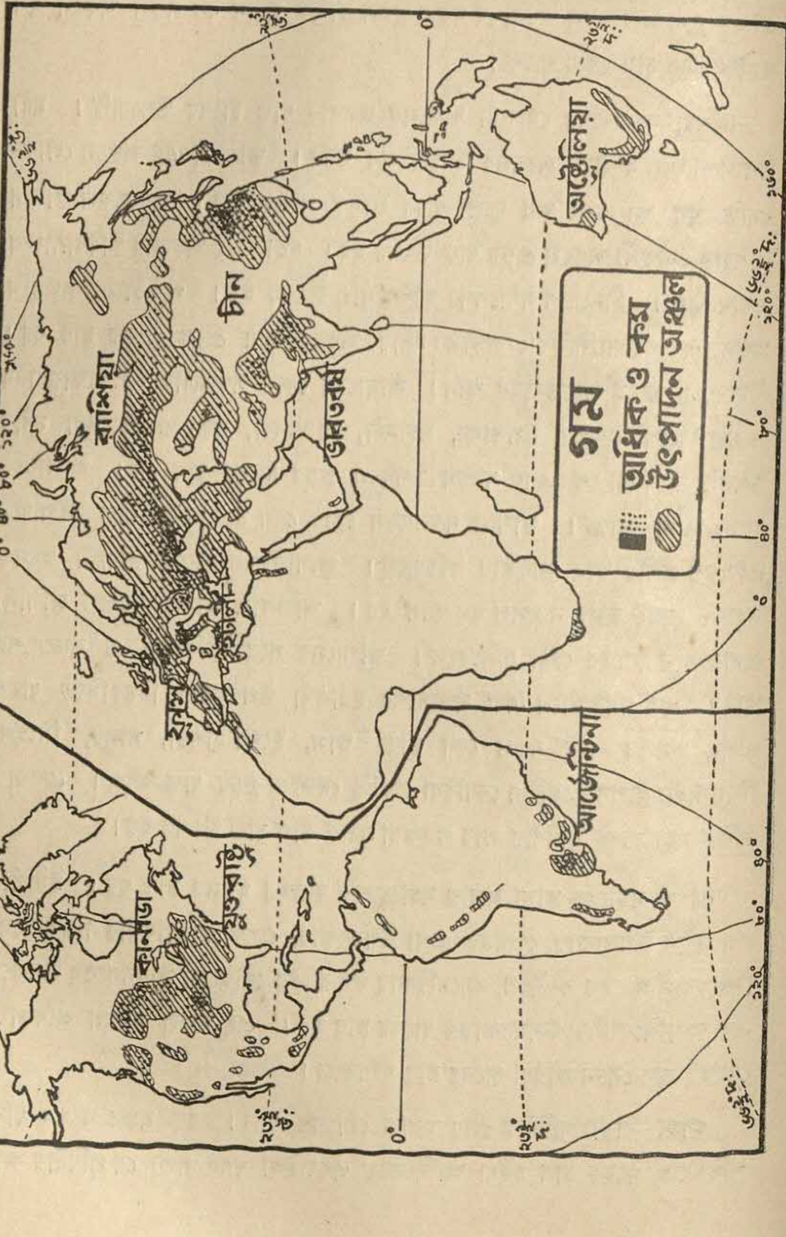
১১০নং চিত্র

এইজন্য জনবিরল স্থানে অথবা যে সকল স্থানে শ্রমিক মহার্ঘ সে সকল অঞ্চলে খুব কমই ধানের চাষ হইয়া থাকে।

এশিয়া মহাদেশের মৌসুমী অঞ্চলের জলবায়ু ধান্য চাষের উপযোগী। নদী উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলের মাটিও খুব উর্বর। তাছাড়া এই অঞ্চলে লোক-বসতি খুব ঘন এবং অল্প মূল্যে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়। এই সকল কারণে এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চলে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। ইহাই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। চীনদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক ধান্য উৎপন্ন হয়। পূর্ব-চীনের সমভূমি অঞ্চল এবং ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতি নদীর অববাহিকায় প্রচুর ধানের চাষ হয়। চীনদেশের পরেই ভারতবর্ষের স্থান। আমাদের দেশে গঙ্গানদীর উপত্যকার নিম্ন ও মধ্য অংশে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর উপত্যকার নিম্নাংশে এবং পশ্চিম উপকূলে প্রচুর ধানের চাষ হয়। জাপানেও ধানের চাষ আছে। জাপান পর্বতসঙ্কুল ছোট দেশ বটে, কিন্তু ধান্য উৎপাদনে এই দেশ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। জাপানীদের চাষের প্রণালী অনেক উন্নত। তাই জাপানে ফসল খুব ভাল হয়। আজকাল আমাদের দেশে জাপানী প্রথায় ধান চাষের চেষ্টা চলিতেছে। জাপানের পরে পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশের স্থান। পূর্ব পাকিস্তানে এবং ব্রহ্মদেশের ইরাবতী উপত্যকার নিম্নভূমিতে ধানই প্রধান ফসল। এই সকল দেশ ছাড়া শ্যাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, সিংহল, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশেও প্রচুর ধান্য জন্মে। একমাত্র এশিয়া মহাদেশেই পৃথিবীর প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ ধান্য উৎপন্ন হয়।

এশিয়া মহাদেশ ছাড়া অন্যান্য মহাদেশেও অল্পস্বল্প ধানের চাষ হয়। ইটালীর পো নদীর উপত্যকায়, স্পেনের এব্রো উপত্যকায়, চেকোশ্লোভাকিয়ার নিম্নভূমিতে, মিশরের নীলনদের ব-দ্বীপে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলে এবং ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকায়ও ধানের চাষ হয়। এই সকল অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জল সেচন করিয়া ধানের চাষ হইতেছে।

গম—গমও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের খাদ্য। বহু সহস্র বৎসর যাবৎ পৃথিবীতে গমের চাষ হইয়া আসিতেছে এবং ইহা খুবই সত্য যে পৃথিবীর আদি


গম
অধিক ও কম
উৎপাদন অঞ্চল
রাশিয়া
চীন
ভারতবর্ষ
অষ্ট্রেলিয়া
আর্জেন্টিনা
কানাডা
যুক্তরাষ্ট্র

১১১নং চিত্র

কৃষকেরা গমের চাষ জানিত। ধানের মত বিভিন্ন ধরণের অসংখ্য প্রকার গমের চাষ হইয়া থাকে।

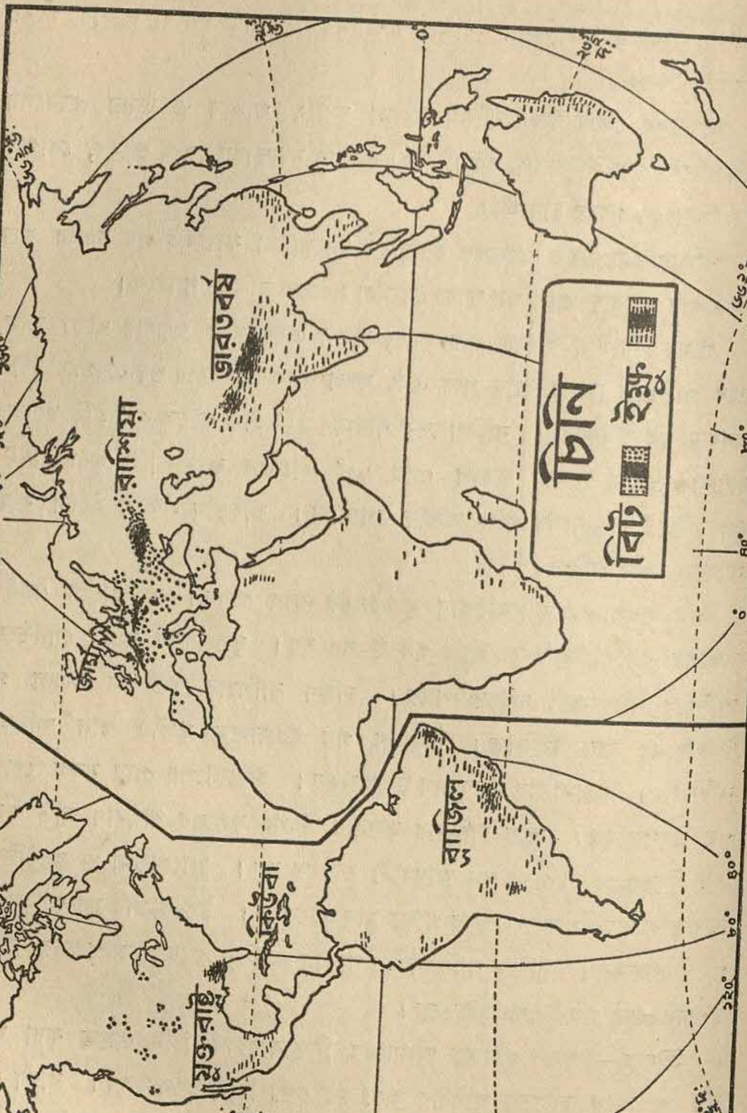
আমাদের দেশে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অর্থাৎ পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত মধ্যভারত, অন্ধ্র প্রদেশ, বোম্বাই এবং বিহারেও গমের চাষ আছে।

পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশের জলবায়ুর আলোচনা করিলেই গম চাষের জন্য কি প্রকার জলবায়ু প্রয়োজন তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিবে।

গমের চারাগাছ বড় হওয়ার সময়ে শীতল এবং আর্দ্র জলবায়ু থাকা ভাল, তবে গাছগুলি বড় হওয়ার পরে এবং ফসল পাকিবার সময়ে শুষ্ক এবং রৌদ্রদীপ্ত জলবায়ু খুব উপকারী। বারিপাতের পরিমাণ ২০" ইঞ্চি হইতে ৩০" ইঞ্চি হইলেই যথেষ্ট। চাষের সময়ে উত্তাপ প্রায় ৬০° ফাঃ-এর কাছাকাছি হওয়া চাই। কৃষ্ণ মৃত্তিকা গম চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। কৃষিভূমি সমতল হইলে যন্ত্রের সাহায্যে কৃষির সুবিধা হয়।

গম উৎপাদনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরী অঞ্চলের কালো মাটিতে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পরেই সোভিয়েট রাশিয়ার নাম করা যাইতে পারে। দক্ষিণ রাশিয়ার ইউক্রেন অঞ্চল গম উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। চীনদেশ গম উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ক্যানাডায় প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই গম উৎপন্ন হয়। তবে চাহিদার তুলনায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অতি অল্প। তাই বিদেশ হইতে প্রচুর গম আমদানী করিতে হয়। আর্জেন্টিনা ও অষ্ট্রেলিয়ায় আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর গমের চাষ হইতেছে। ইউরোপের ফ্রান্সেই অধিক গম উৎপন্ন হর। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে জলসেচের সুবিধা হওয়ায় প্রচুর গম উৎপন্ন হইতেছে।

ইক্ষু—ইক্ষুরস হইতেই আমাদের নিত্যব্যবহার্য চিনি প্রস্তুত করা হয়। ইক্ষু বা আখ হইতেই পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী চিনি উৎপন্ন হয়। বাকী প্রায় অর্ধেক বীট হইতে প্রস্তুত হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বীট এবং উষ্ণ অঞ্চলে আখের চাষ হয়।



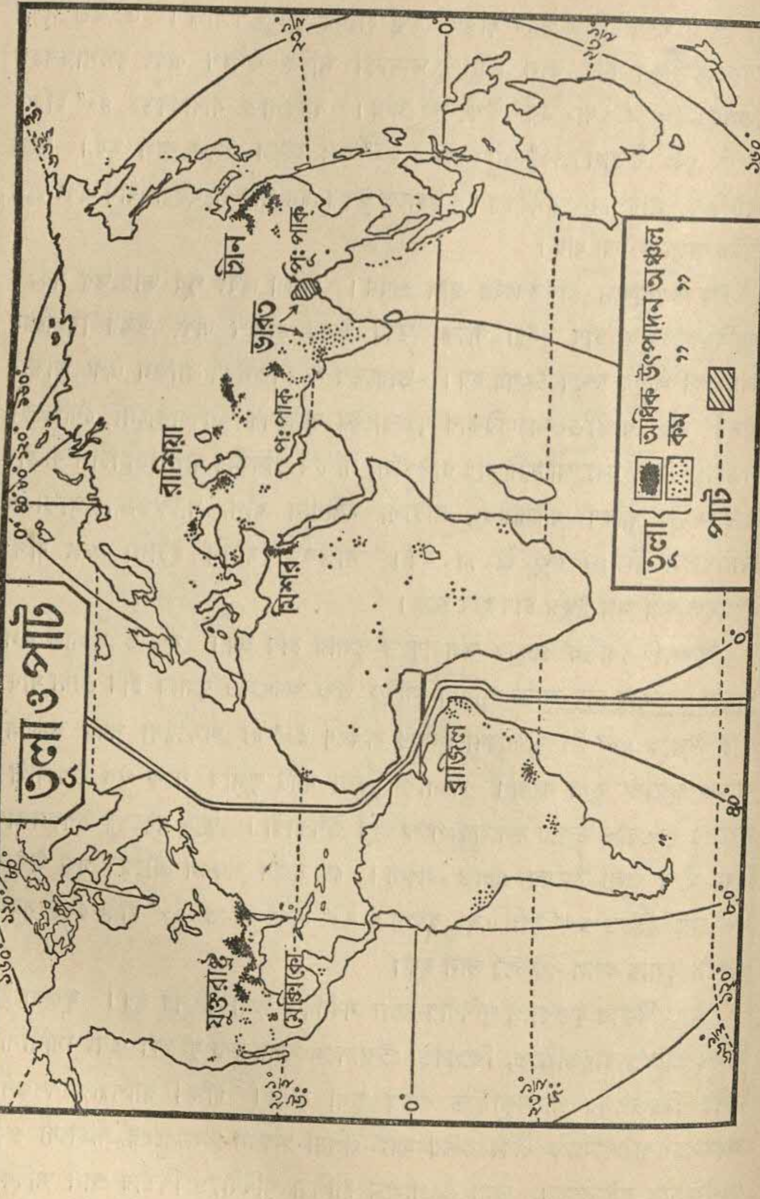
১১২নং চিত্র

চূণ ও লবণমিশ্রিত উর্বর মৃত্তিকা ইক্ষু চাষের খুব উপযোগী। এইজন্য সমুদ্র উপকূলে ইক্ষুর চাষ ভাল হয়। তাছাড়া অধিক উত্তাপ এবং বৃষ্টিপাতবহুল অঞ্চলই ইক্ষু উৎপাদনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। বারিপাত সাধারণতঃ ৪০" ইঞ্চির অধিক এবং উত্তাপ ৭৫° ফাঃ হইতে ৮০° ফাঃ হইলে ফসল ভাল হয়। তবে অতিরিক্ত বারিপাত অনিষ্টকর। ইহাতে ইক্ষুর রস পাতলা হইয়া যায় এবং রসে চিনির অংশ কমিয়া যায়।

ইক্ষু উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান প্রথম। দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতের সর্বত্রই অল্পবিস্তর ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে, তবে উত্তর প্রদেশ এবং উত্তর বিহারেই সর্বাপেক্ষা অধিক ফসল উৎপন্ন হয়। ভারতের পরে কিউবা, ব্রাজিল এবং জাভার স্থান। ইহা ব্যতীত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের উপকূলভাগে, মেক্সিকো, হাওয়াই দ্বীপ, মধ্য আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চিলি ব্যতীত প্রায় সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা, নাটাল, মরিসাস দ্বীপ, পাকিস্তান, জাভা ও ফিলিপাইন দ্বীপেও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। আজকাল দক্ষিণ ইটালী এবং দক্ষিণ স্পেনেও অল্প অল্প ইক্ষুর চাষ হইতেছে।

তুলা—বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে তুলার চাষ হয়। মন্দ-উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতেও তুলার চাষ আছে আবার অধিক উষ্ণ অঞ্চলেও তুলার চাষ দেখা যায়। তাই উত্তরে ৪০° উঃ অক্ষরেখা হইতে দক্ষিণে ৩০° দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত অঞ্চলের অনেক স্থানেই তূলা জন্মে। লবণাক্ত ভিজা মাটি তূলার পক্ষে খুব উপযোগী। সমুদ্রের হাওয়াও তূলার ফসলের পক্ষে খুব উপকারী। তাই সমুদ্রের উপকূলভাগ এবং দ্বীপ তূলা চাষের প্রশস্ত অঞ্চল। যে সকল অঞ্চলে গ্রীষ্মের গড় উত্তাপ ৮০° ফাঃ হইতে ৯০° ফাঃ এবং বৃষ্টিপাত ২০" ইঞ্চি হইতে ৪০" ইঞ্চি সেই সকল অঞ্চলে তূলার ফসল সবচেয়ে ভাল হয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক তূলা উৎপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগের রাষ্ট্রগুলিতে, বিশেষতঃ টেক্সাস অঞ্চলের কৃষ্ণ মৃত্তিকা এবং মিসিসিপি নদীর নিম্নভাগের প্লাবনভূমিতে প্রচুর তূলা জন্মে। দক্ষিণ রাশিয়ার ককেসীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে এবং রুশীয় মধ্য এশিয়া অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে প্রচুর তূলার চাষ হইতেছে। তূলা উৎপাদনে রাশিয়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার


তুলা ও পাট
যুক্তরাষ্ট্র
মেক্সিকো
ব্রাজিল
মিশর
রাশিয়া
পঃ পাক
ভারত
পূঃ পাক
চীন
তুলা
অধিক উৎপাদন অঞ্চল
কম " "
পাট

১১৩নং চিত্র

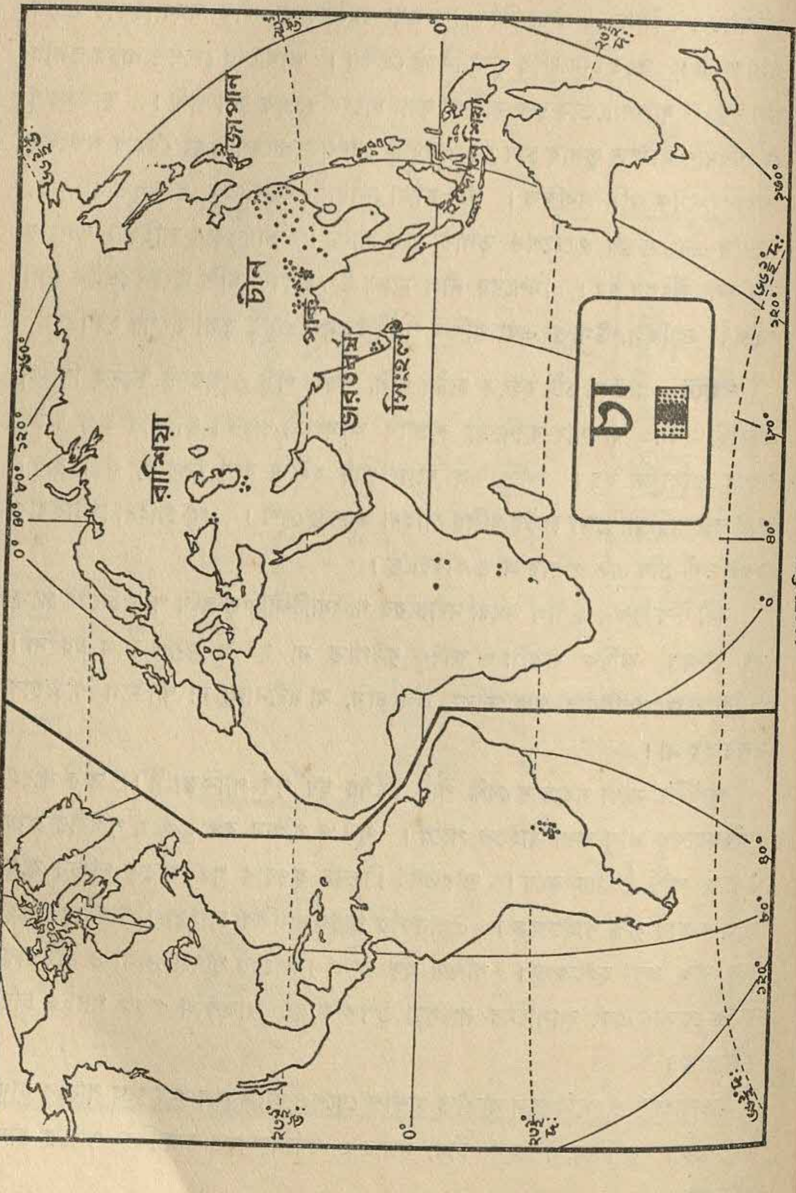
করিয়াছে। চীনদেশে ইয়াংসিকিয়াং এবং হোয়াংহো নদীর অববাহিকায় প্রচুর তূলা জন্মে। তবে চীনদেশীয় তূলা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। আমাদের দেশেও প্রচুর তূলার চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা তূলা চাষের অত্যন্ত উপযোগী। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জমিতে তূলার চাষ হয় একমাত্র বোম্বাই প্রদেশ এবং বেরার অঞ্চলেই তাহার অর্ধেক জমি অবস্থিত। ইহা ছাড়া সৌরাষ্ট্র, মধ্যভারত, রাজপুতানা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ এবং উত্তর প্রদেশেও তূলার চাষ আছে। ভারতবর্ষে চাহিদার তুলনায় কম তূলা উৎপন্ন হয়। মিশরের নীল নদের উপত্যকায় অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তূলা জন্মে। ব্রাজিল, উগাণ্ডা এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও প্রচুর তূলা উৎপন্ন হয়।

পাট—পাট বা চট হইতে চটের থলি, বস্তা, দড়ি ও অন্যান্য অনেক জিনিস তৈয়ারী হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যে শস্যাদি আমদানী-রপ্তানী করিবার জন্য চটের বস্তার প্রয়োজন হয়। অতি অল্প মূল্যে পাট হইতে বস্তা তৈয়ারী করা যায়। তাই ব্যবসায়-বাণিজ্যে চটের থলির চাহিদা অত্যন্ত বেশী। এই চাহিদা মিটাইবার জন্যই পাট চাষ এত প্রসার লাভ করিয়াছে।

নদী উপত্যকা, ব-দ্বীপ অথবা নদীচরের পলিমাটি-সঞ্চিত ভূমি পাট চাষের পক্ষে খুব ভাল। অধিক উত্তাপ ও অধিক বৃষ্টিপাত না হইলে ফসল ভাল হয় না। পাটগাছকে পচাইবার জন্য ডোবা, জলাভূমি, বা নদীনালা না থাকিলে পাট চাষ সম্ভব হয় না।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হয় পূর্ব পাকিস্তানে। তার পরেই পশ্চিমবঙ্গের নাম করা যাইতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ একত্রে পৃথিবীর প্রায় $\frac{৭}{৮}$ ভাগ পাট উৎপন্ন করে। ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর হইতে পশ্চিম বঙ্গে পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানকার পাটকলগুলির চাহিদা মিটাইবার জন্যই চাষ বৃদ্ধি করা হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া বিহারের পূর্ণিয়া জেলা ও উড়িষ্যার কটক জেলায় এবং আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও আজকাল প্রচুর পাটের চাষ হইতেছে।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান ব্যতীত অন্যান্য দেশেও আজকাল অল্প অল্প পাটের চাষ হইতেছে। ব্রাজিল, সিংহল, চীন, মালয় ও ফরমোজাতে অল্পাধিক পাটের চাষ হইতেছে।



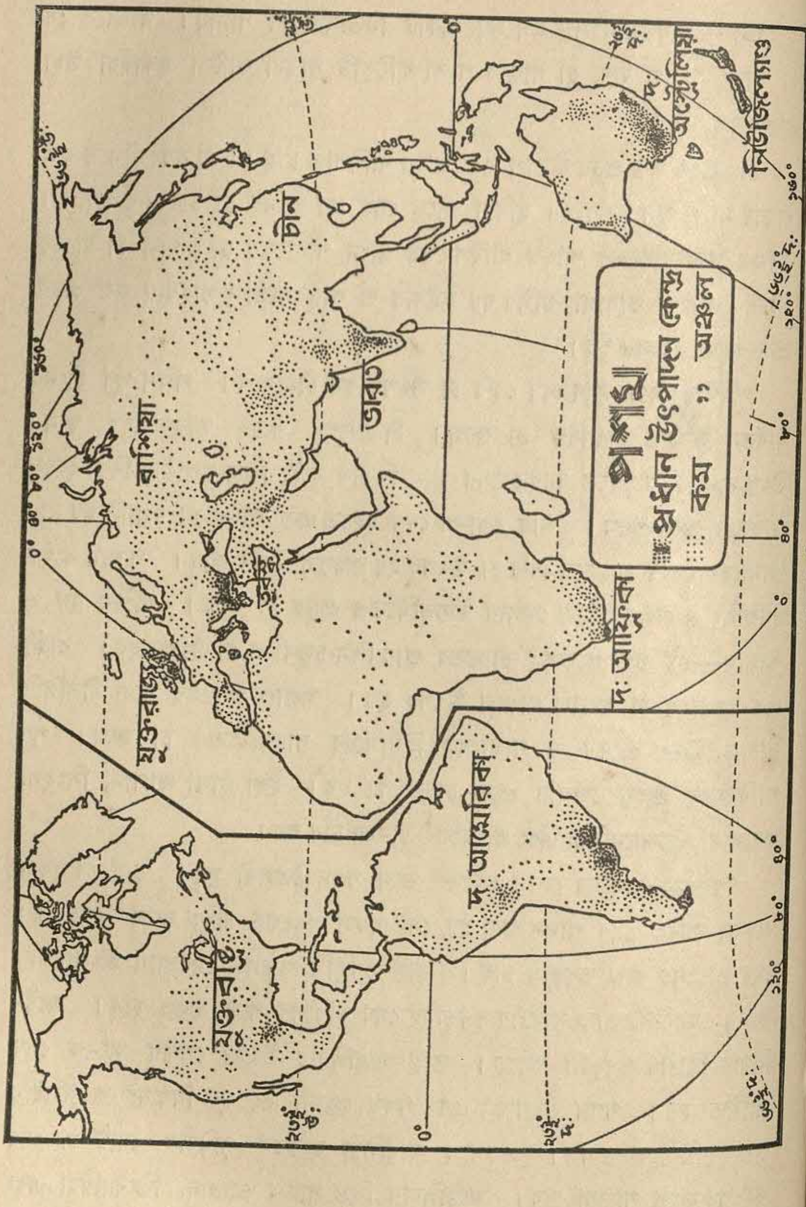
১১৪নং চিত্র

চা—চা বর্তমান সভ্যজগতের একটি নিত্যব্যবহার্য পানীয়। বাজারে যে চা পাতা পাওয়া যায়, চা গাছের পাতা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া উহা প্রস্তুত করা হয়।

চা চাষের জন্য প্রচুর উত্তাপ এবং প্রচুর বারিপাত চাই। যে সব জমিতে জল দাঁড়ায় না ও জল নিকাশের সুবিধা আছে সেই সব জমিই চা চাষের উপযোগী। এইজন্য উষ্ণ অঞ্চলের অধিক বারিপাতের স্থানে পাহাড়ের ঢালু গাত্র চা চাষের আদর্শ ক্ষেত্র। চারাগাছগুলির যত্ন লইবার ও কচি পাতা কুড়াইবার জন্য প্রচুর শ্রমিকেরও দরকার হয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী চা উৎপন্ন হয় চীনদেশে। দক্ষিণ-পূর্ব চীনের পার্বত্য ভূমিতে সর্বাধিক চা জন্মে। চীনদেশের পরেই ভারতবর্ষের স্থান। উৎপাদনের দিক হইতে ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয় বটে, কিন্তু রপ্তানীর দিক হইতে ভারতের স্থান প্রথম। আর কোনও দেশ হইতে এত অধিক চা রপ্তানী হয় না। আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী চা উৎপন্ন হয় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। পশ্চিম বঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার উচ্চভূমিতেও প্রচুর চা জন্মে। পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম—এই দুই প্রদেশেই ভারতের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ চা উৎপন্ন হয়। বাকী এক-চতুর্থাংশ চা অন্যান্য অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে নীলগিরি পাহাড়, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের হিমালয়ের পাদভূমিতেও চা জন্মে। পূর্ব পাকিস্তানে শ্রীহট্ট জেলায় প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া জাপান, সিংহল, ফরমোসা, ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রাজিলেও চা-এর চাষ হয়।

পশম—মেষের লোম হইতেই ভাল পশম তৈয়ারী হয়। তাই যে সকল অঞ্চলে অধিক মেষ পালন করা হয়, সেই সকল অঞ্চলেই অধিক পশম উৎপন্ন হয়। মেষ চারণের জন্য তৃণভূমি চাই। তাই তৃণভূমি অঞ্চলই মেষলোম উৎপাদনের স্থান। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমিই মেষ চারণের পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান। অষ্ট্রেলিয়ায় বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আছে। তাই অষ্ট্রেলিয়ায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অনেক মেষ পালিত হয়। পশম উৎপাদন এবং পশম রপ্তানী এই দুই বিষয়েই অষ্ট্রেলিয়ার স্থান পৃথিবীতে প্রথম। একমাত্র অষ্ট্রেলিয়া হইতেই পৃথিবীর মোট পশমের দুই-পঞ্চমাংশ পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্, ভিক্টোরিয়া এবং



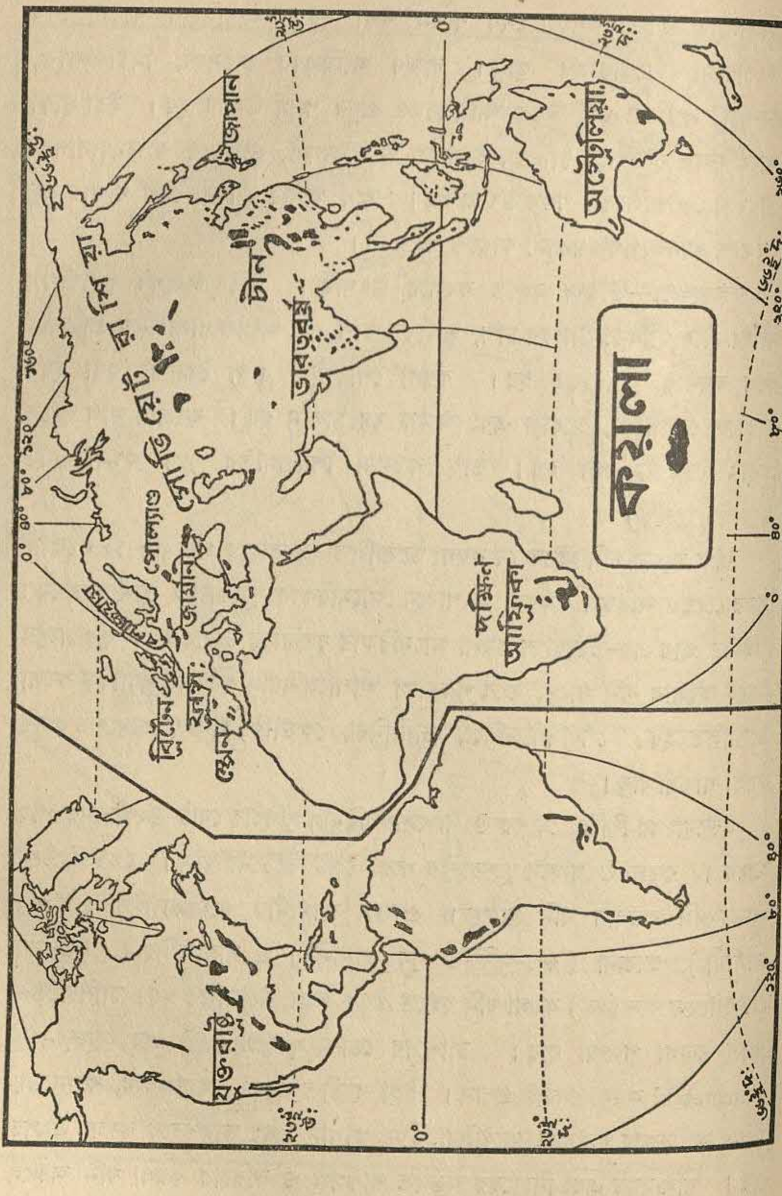
১১৫নং চিত্র

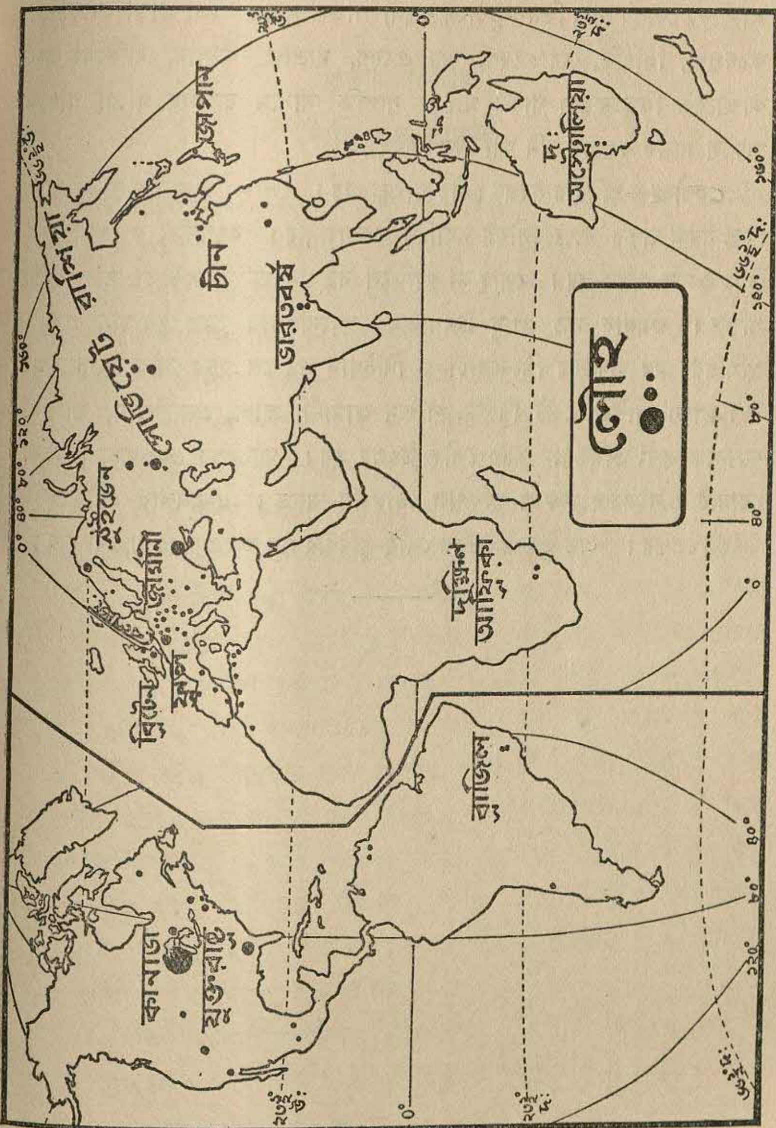
কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যে অসংখ্য মেষ পালন করা হয়। অষ্ট্রেলিয়ার পরেই পশম উৎপাদনে আর্জেন্টিনার স্থান। দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রসঙ্ঘ, নিউজিল্যাণ্ড, উরুগুয়ে, ব্রাজিল এবং উত্তর আফ্রিকায়ও প্রচুর পশম উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ ও ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী দেশগুলিতেও পশম উৎপন্ন হয়। তবে স্থানীয় চাহিদা বেশী থাকায় এই সব দেশ অধিক পশম রপ্তানী করিতে পারে না।

কয়লা—উদ্ভিজ্জ হইতে কয়লার উৎপত্তি। উদ্ভিদ্-অবশেষ সুদীর্ঘকাল মাটির নীচে থাকিয়া উপরের চাপ, ভূস্তরের তাপ এবং অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। কয়লা পোড়াইয়া বাষ্প তৈয়ারী করা হয়। তাহাতে রেলগাড়ী, জাহাজ এবং অনেক যন্ত্র চালান হয়। কয়লার তাপ হইতে বিদ্যুৎ তৈয়ারী করা হয়। তাই বর্তমান শিল্পপ্রগতির যুগে কয়লা অতি প্রয়োজনীয় বস্তু।

প্রতি বৎসর খনি হইতে যে কয়লা উত্তোলিত হয় তাহার পরিমাণ ১৫০ কোটি টনের চেয়েও অধিক। কয়লা উৎপাদনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্বপ্রথম। পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কয়লা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই কয়লার খনি আছে, তবে পূর্বভাগে আপালেসিয়ান অঞ্চলেই সর্বাধিক কয়লা উত্তোলিত হয়। পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া, ভার্জিনিয়া, কেণ্টাকি, ইল্লিনই প্রদেশেও প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক। কয়লা উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই গ্রেট ব্রিটেনের স্থান। গ্রেট ব্রিটেনে অনেকগুলি কয়লার খনি আছে। প্রাক্তন জার্মানীর ওয়েষ্টফ্যালিয়া (পশ্চিম জার্মানী), স্যাক্সনী (রুশ-অধিকৃত পূর্ব জার্মানী) ও সাইলেসিয়ার (বর্তমানে পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত) কয়লা খনি হইতে প্রচুর কয়লা উত্তোলিত হয়। রাশিয়াতেও প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। রাশিয়ার ডোনেৎস্ (Donetz) এবং কুজ্‌নেৎস্ক (Kuznetsk) কয়লা ক্ষেত্রই প্রধান। ইহা ব্যতীত ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রসঙ্ঘ, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান এবং ভারতবর্ষে কয়লা উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের অন্তর্গত রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা খনি অঞ্চলে


কয়লা
যুক্তরাষ্ট্র
ব্রিটেন
ফ্রান্স
স্পেন
জার্মানী
পোল্যাণ্ড
সোভিয়েট রাশিয়া
ভারতবর্ষ
চীন
জাপান
অস্ট্রেলিয়া
দক্ষিণ আফ্রিকা


লৌহ
কানাডা
যুক্তরাষ্ট্র
ব্রাজিল
দক্ষিণ আফ্রিকা
ব্রিটেন
ফ্রান্স
জার্মানী
সুইডেন
সোভিয়েট
রাশিয়া
চীন
জাপান
ভারতবর্ষ
অস্ট্রেলিয়া

১১৭নং চিত্র

আমাদের দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কয়লা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বোকারো, করণপুরা, গিরিডি, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, মাদ্রাজ, আসাম, দার্জিলিং এবং কাশ্মীরেও কিছু কয়লা পাওয়া যায়। সম্প্রতি আসাম রাজ্যের গারো পাহাড় অঞ্চলে অনেক কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

লৌহ—পৃথিবীর সর্বত্রই লৌহ পাওয়া যায়। লৌহ মূল্যবান ধাতু নয় বটে, কিন্তু সকল ধাতুর মধ্যে লৌহই সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। যন্ত্রপাতি, কলকব্জা সবই লৌহ হইতে প্রস্তুত হয়। লৌহ না থাকিলে বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা অচল হইয়া পড়িত। কয়লার মত লৌহ উৎপাদনেও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম। সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চলের মিনেসোটা ও মিচিগান প্রদেশে প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান, ক্যানাডা এবং ভারতবর্ষে প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। ভারতের কেওঞ্ঝড়, সিংভূম, বোনাই ও ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে সুবিশাল লৌহখনি আছে। এখানকার লৌহ অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ পৃথিবীর খুব কম স্থানেই পাওয়া যায়।

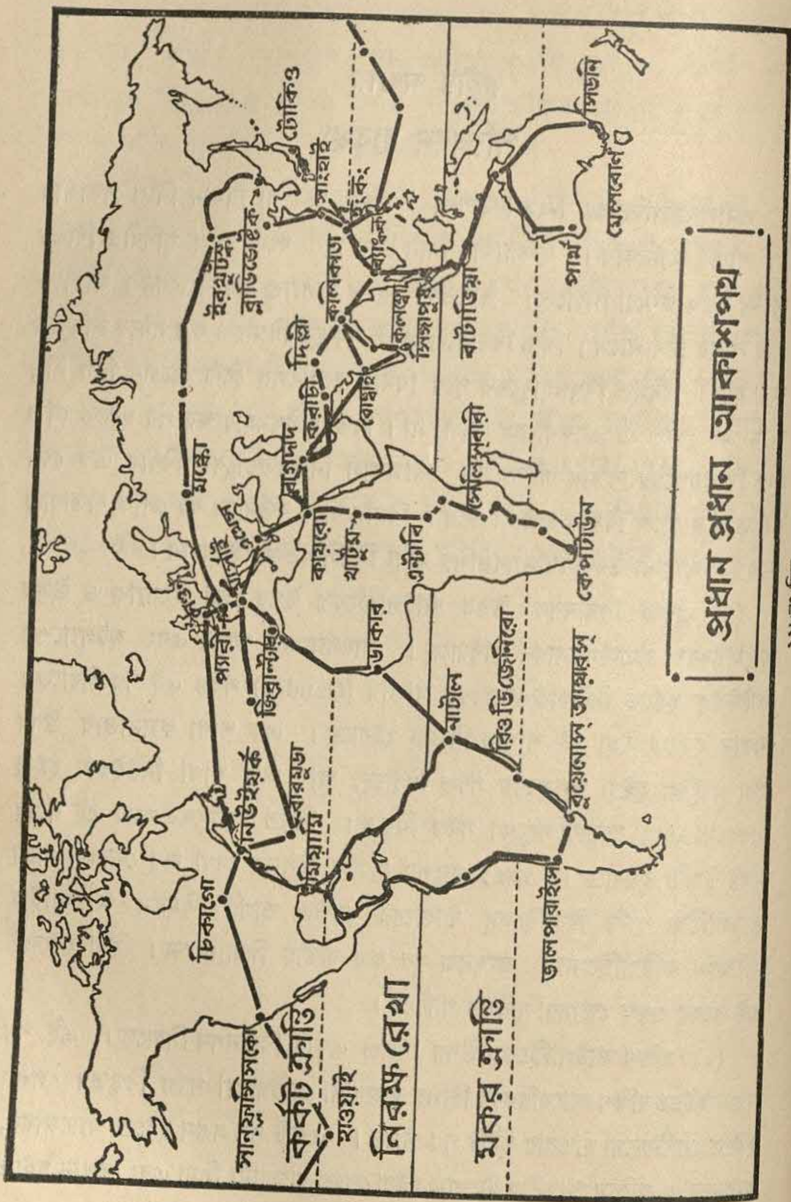
তৃতীয় অধ্যায়

পরিবহন ব্যবস্থা

আন্তর্জাতিক বিমানপথ—আকাশ-যান বা বিমান বিংশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য আবিষ্কার। দ্রুতগামী বিমান চলাচলের ফলে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে ইংল্যাণ্ড যাইতে এখনও জাহাজে প্রায় পনের দিন লাগে; কিন্তু বিমানযোগে ঐ পথ দুই দিনেরও কম সময়ে অতিক্রম করা যায়। বিগত বিশ্বমহাযুদ্ধের পূর্বে বিমান চলাচলের বেশী প্রচলন ছিল না; আমাদের দেশে ত একেবারেই ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর হইতে অতি দ্রুত বিমানপথের বিস্তার ঘটিতেছে। আজকাল নিয়মিতভাবে পৃথিবীর এক দেশ হইতে অন্য দেশে বিমান চলাচল করে। বিমানযোগে বর্তমানে বহু লোক যাতায়াত করে। আন্তর্জাতিক বিমানপথগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

(১) একটি বিমানপথ উত্তর আটলান্টিকের উপর দিয়া ইংল্যাণ্ড ও উত্তর আমেরিকার সংযোগ সাধন করিয়াছে। আয়র্ল্যাণ্ডের শ্যানন এবং স্কটল্যাণ্ডের প্রেষ্টউইক্ হইতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের গাণ্ডার (Gander) পর্যন্ত এই পথ গিয়াছে। সেখান হইতে উহা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা ক্যানাডার উপর দিয়া মণ্ট্রীল হইয়া ভ্যাঙ্কুভার পর্যন্ত গিয়াছে, আর অন্য শাখা নিউইয়র্ক হইয়া সিকাগো এবং সানফ্রান্সিস্কো পর্যন্ত বিস্তৃত। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই পথের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ১৯৫১ সালের যাত্রীর হিসাবে দেখা যায় যেসকল যাত্রী আটলান্টিক পাড়ি দিয়াছিলেন তাঁহাদের বেশীর ভাগই বিমানে আটলান্টিক অতিক্রম করিয়াছিলেন। জাহাজে খুব কম যাত্রীই গিয়াছিলেন। ইহা হইতেই এই পথের গুরুত্ব তোমরা বুঝিতে পারিবে।

(২) দক্ষিণ আটলান্টিকের উপর দিয়াও একটি বিমানপথ গিয়াছে। এই পথ লণ্ডন হইতে দক্ষিণ আমেরিকার চিলির রাজধানী সেন্টিয়াগো পর্যন্ত বিস্তৃত। লণ্ডন হইতে সেন্টিয়াগো যাওয়ার দুইটি পথ আছে। একটি পথ লণ্ডন হইতে অ্যাজোরস্, বারমুডা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইয়া পেরুর রাজধানী লিমা এবং সেখান হইতে


প্রধান প্রধান আকাশপথ
কর্কট ক্রান্তি
নিরক্ষ রেখা
মকর ক্রান্তি
সানফ্রান্সিসকো
হাওয়াই
চিকাগো
নিউইয়র্ক
বারমুডা
মিয়ামি
জিব্রাল্টার
প্যারী
মস্কো
কায়রো
খার্টুম
এন্টাবি
ডাকার
নাটাল
রিওডিজেনিরো
বুয়েনোস আয়ারস্
ভালপারাইসো
কেপটাউন
সেলিসবারী
বাগদাদ
করাচী
বোম্বাই
দিল্লী
কলিকাতা
কলম্বো
সিঙ্গাপুর
ব্যাংকক
হংকং
সাংহাই
টোকিও
ভ্লাডিভোষ্টক
বাটাভিয়া
পার্থ
মেলবোর্ণ
সিডনি

চিত্র নং ৮১

সোজা সেন্টিয়াগো পর্যন্ত গিয়াছে। অন্য পথ লণ্ডন হইতে লিসবন, ডাকার (পশ্চিম আফ্রিকা), নাটাল (ব্রাজিল) হইয়া রিওডিজেনেরো পর্যন্ত গিয়াছে। সেখান হইতে বুয়েনোস্ আয়ার্স্ হইয়া আণ্ডিজ পর্বত অতিক্রম করিয়া সেন্টিয়াগো পর্যন্ত গিয়াছে। এই পথে লণ্ডন হইতে সেন্টিয়াগো যাইতে প্রায় ৫০ ঘণ্টা সময় লাগে।

(৩) ইউরোপের প্রধান প্রধান শহরগুলির প্রায় সবই বিমান পথ দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। লণ্ডন, প্যারিস, ব্রুসেলস্, আমষ্টার্ডাম, প্রাগ, রোম এবং এথেন্স সবই বিমানপথ দ্বারা যুক্ত। পশ্চিম ইউরোপ হইতে রাশিয়া পর্যন্ত সোজাসুজি কোন বিমানপথ নাই। তবে মস্কো হইতে কতকগুলি বিমানপথ বিভিন্ন দিকে গিয়াছে। মস্কো হইতে একটি পথ কাবুল, অন্যপথ মাঞ্চুরিয়া হইয়া চীনদেশের সাংহাই পর্যন্ত গিয়াছে।

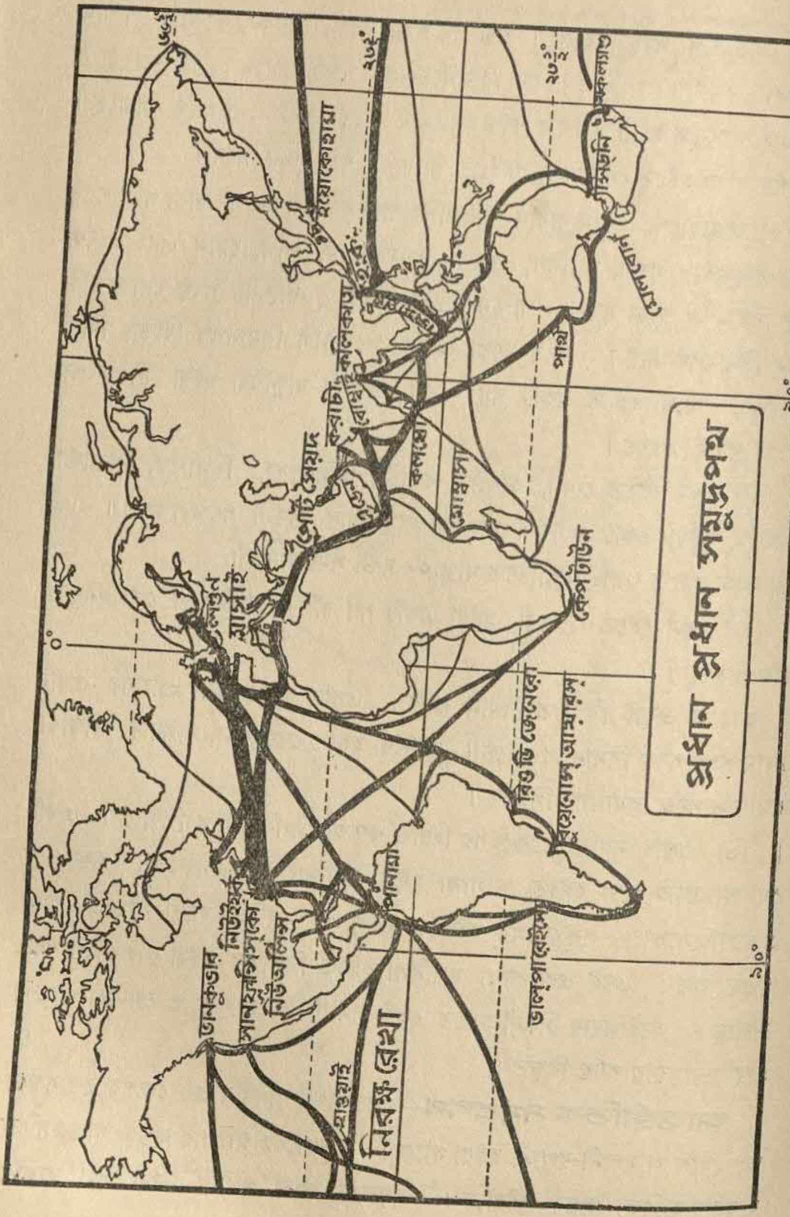
(৪) লণ্ডন হইতে রোম, কায়রো, করাচী, কলিকাতা, সিঙ্গাপুর, জাকার্তা, ডারউইন হইয়া একটি সুদীর্ঘ বিমানপথ অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথে লণ্ডন হইতে করাচী পৌছিতে মাত্র ৩০ ঘণ্টা সময় লাগে।

(৫) লণ্ডন হইতে কায়রো হইয়া একটি পথ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেনস্‌বুর্গ পর্যন্ত গিয়াছে।

কায়রো একটি বিখ্যাত বিমান বন্দর। এখান হইতে মধ্য প্রাচ্যের প্রধান প্রধান শহর পর্যন্ত বিমানপথ আছে। কায়রো হইতে তেহেরান্, বাগদাদ্, আঙ্কারা, দামাস্কাস্ পর্যন্ত বিমানপথ গিয়াছে।

(৬) প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়াও কতকগুলি বিমানপথ গিয়াছে। একটি পথ স্যানফ্রান্সিস্‌কো হইতে আলাস্কা হইয়া টোকিও পর্যন্ত গিয়াছে। অন্য পথে স্যানফ্রান্সিস্‌কো ও লস্‌এঞ্জেলস্ হইতে হনলুলু ও ম্যানিলা হইয়া সাংহাই পর্যন্ত যাওয়া যায়। এরই এক শাখা ম্যানিলা হইতে সিঙ্গাপুর হইয়া কলিকাতা পর্যন্ত গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী হইতে একটি পথ ফিজি, হনলুলু ও স্যানফ্রান্সিস্‌কো হইয়া ভ্যাঙ্কুবার পর্যন্ত বিস্তৃত।

আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ—সমুদ্রপথেই পৃথিবীর এক দেশের দ্রব্যসম্ভার অন্য দেশে আমদানী-রপ্তানী হইয়া থাকে। সমুদ্রপথের সুবিধার জন্যই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্ভব হইয়াছে। সমুদ্রের সকল স্থানের উপর দিয়া জাহাজ


প্রধান প্রধান সমুদ্রপথ
ভানকুভার
নিউইয়র্ক
সানফ্রান্সিস্কো
নিউঅর্লিন্স
হাওয়াই
নিরক্ষ রেখা
পানামা
ভাল্পারেইসো
রিওডি জেনেরো
বুয়েনোস্ আয়ারস্
কেপটাউন
লণ্ডন
মার্সাই
পোর্ট সৈয়দ
এডেন
করাচী
বোম্বাই
কলিকাতা
কলম্বো
মোম্বাসা
হংকং
ইয়োকোহামা
পার্থ
মেলবোর্ন
সিডনি
অকল্যাণ্ড
২৩½°
০°
৯০°
১৮০°

১১৯নং চিত্র

চলাচল করে না। এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাওয়ার নির্দিষ্ট সমুদ্রপথ আছে। পৃথিবীতে যে কয়টি আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ আছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত-গুলিই প্রধান।

(১) **উত্তর আটলান্টিক পথ**—এই পথ ইউরোপের পশ্চিম উপকূল ও আমেরিকার পূর্ব উপকূলের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে। এই দুই উপকূলকে পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল বলা যাইতে পারে। এই দুই অঞ্চলের মধ্যে মালপত্রের আদান-প্রদানও খুব বেশী। তাই উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্রপথ। এই পথে যত জাহাজ যাতায়াত করে অন্য কোন পথে তত করে না। এত অধিক পরিমাণ মালপত্রও অন্য কোন পথে চালান হয় না। যাত্রীর সংখ্যাও এই পথেই সর্বাধিক, কারণ এই পথ পৃথিবীর অতি সমৃদ্ধ এবং ঘনবসতিপূর্ণ দুইটি অঞ্চলকে সংযুক্ত করিয়াছে।

(২) **সুয়েজ খাল পথ**—সুয়েজ খাল কাটার পর ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়া যাতায়াতের পথ সুগম হইয়াছে। মালপত্রের পরিমাণ, জাহাজ এবং যাত্রীর সংখ্যা হিসাবে উত্তর আটলান্টিক পথের পরই সুয়েজ খাল পথের স্থান। এই পথটি বেশ দীর্ঘ এবং বিভিন্ন দেশের নিকট দিয়া গিয়াছে। এই পথের জন্য ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে। এই পথে জাহাজ জিব্রাল্টার, মাল্টা, পোর্ট সৈয়দ, এডেন ও কলম্বো প্রভৃতি বন্দর হইতে কয়লা বোঝাই করে।

(৩) **অন্তরীপ পথ**—ইউরোপ হইতে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া একটি সমুদ্রপথ অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত গিয়াছে। এই পথে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে জাহাজকে কয়লা লইতে হয়। এই পথে মালের চেয়ে যাত্রীর পরিমাণই বেশী। ফিরিবার পথে অষ্ট্রেলিয়া হইতে জাহাজগুলি একই পথে ফেরে না। প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জাহাজ সুয়েজ খাল হইয়া ইউরোপে ফিরিয়া আসে। কতকগুলি হর্ন অন্তরীপ হইয়া আটলান্টিক অতিক্রম করিয়া ইউরোপে আসে। কিছুসংখ্যক জাহাজ একটু উত্তর দিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা হইয়া ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করে। সমুদ্রস্রোত এবং নিয়ত বায়ুপ্রবাহের জন্যই এই সকল ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

(৪) **পানামা খাল পথ**—১৯১৪ সালে পানামা খাল দিয়া জাহাজ চলাচল আরম্ভ হয়। পানামা খাল আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে এবং পশ্চিম ও পূর্ব আমেরিকার মধ্যে যাতায়াতের পথও সুগম করিয়াছে। পূর্বে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল হইতে পশ্চিম উপকূলে যাইতে হইলে দক্ষিণ আমেরিকা পরিক্রমা করিয়া যাইতে হইত। এই সমুদ্রপথের সুবিধার জন্য আমেরিকার পূর্ব উপকূলের সহিত পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমেরিকার জনবহুল শিল্পপ্রধান পূর্বাঞ্চলের সহিত দক্ষিণ আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড ও পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াতের সুবিধাও হইয়াছে।

(৫) **প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ**—এই পথ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের সহিত পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের যোগ সাধন করিয়াছে। আমেরিকা হইতে বহু জিনিস এই পথে এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়াতে রপ্তানী হয়।

(৬) **দক্ষিণ আটলান্টিক পথ**—এই পথ পশ্চিম ইউরোপের সহিত দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের যোগ সাধন করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতেও এই পথে জাহাজ ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার উপকূলভাগ পর্যন্ত যাতায়াত করে।

তৃতীয় খণ্ড

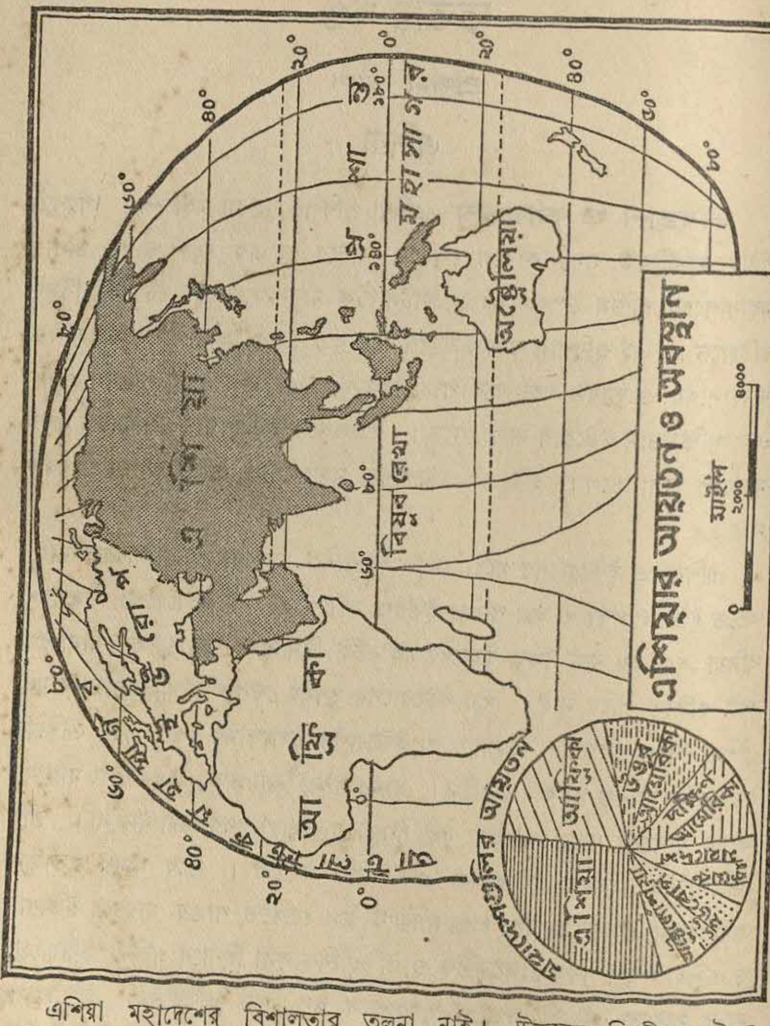
প্রথম ভাগ

এশিয়া

অবস্থান ও আয়তন—এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। পরবর্তী পৃষ্ঠার মানচিত্রটি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে এক বৃহৎ ভূ-খণ্ড প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূল হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব তট পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সুবিশাল ভূ-খণ্ড উত্তরে বরফাবৃত উত্তর মহাসাগর হইতে দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ভূ-খণ্ডেরই পূর্বভাগ এশিয়া এবং পশ্চিমভাগ ইউরোপ নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ ও এশিয়াকে একই মহাদেশ বলা চলে। ইউরোপ ইউরেশিয়া মহাদেশেরই একটি বিশাল উপদ্বীপ মাত্র।

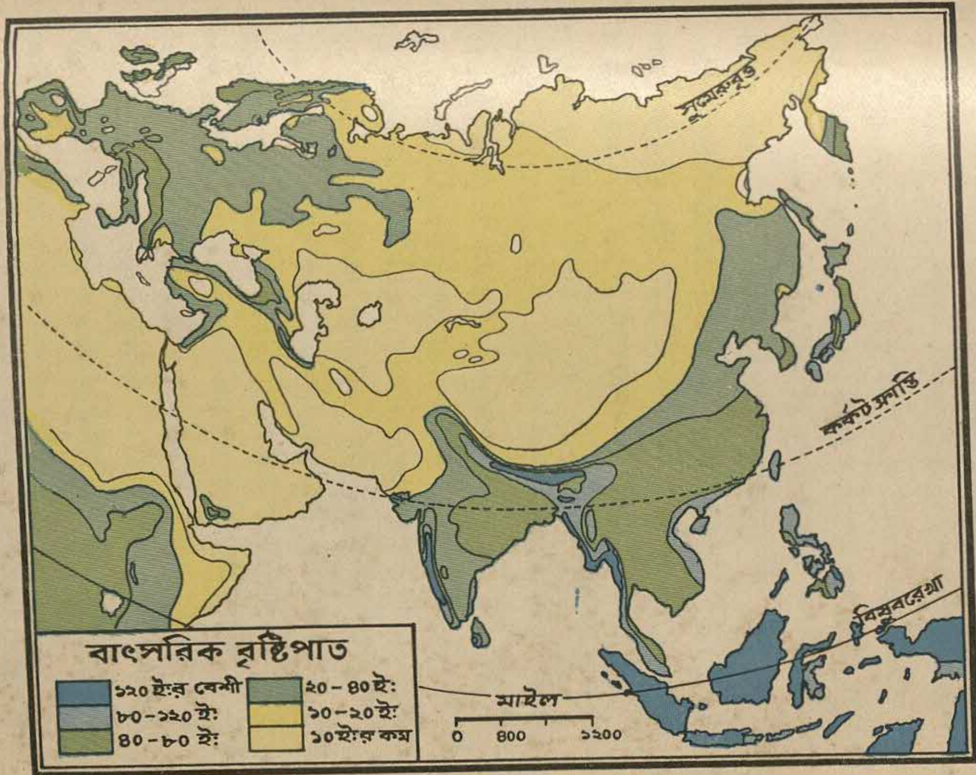
এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে কোন স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমারেখা নাই। অনুচ্চ ইউরাল পর্বত ও অল্প-পরিসর ইউরাল নদীকে এই দুই মহাদেশের সীমারেখা বলিয়া ধরা হয় বটে কিন্তু ইহাদের কোনটিই হিমালয়ের মত দুর্লঙ্ঘ্য সীমারেখা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। পূর্ব ইউরোপের তৃণময় স্তেপভূমি অবিচ্ছিন্নভাবে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। কোথায় যে ইউরোপীয় স্তেপভূমির শেষ এবং এশিয়ার স্তেপভূমির আরম্ভ তা বলা সুকঠিন। ভূমির গঠন, উচ্চাবচতা, উদ্ভিদ এবং মানুষের জীবন যাপনের ধারা কোনটাই এই সীমারেখার দ্বারা পৃথক করা যায় না। তাই ভৌগোলিক হিসাবে ইউরেশিয়া এক অখণ্ড মহাদেশ। তবে মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তন এবং ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইউরোপ ও এশিয়া সম্পূর্ণ পৃথক রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক সত্তা হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। মানব সভ্যতা এই দুই ভূভাগে পৃথকভাবে রূপ লাভ করিয়াছে। ইউরোপের সভ্যতা, ইউরোপের কৃষ্টি এশিয়ার সভ্যতা ও কৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইউরোপীয় সভ্যতা নবীন, এশিয়ার সভ্যতা প্রাচীন। এই দুই ভূখণ্ড পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও

ইহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ পৃথকভাগে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই ইউরোপ ও এশিয়া সম্পূর্ণ পৃথক মহাদেশ।



১২০নং চিত্র

এশিয়া মহাদেশের বিশালতার তুলনা নাই। উত্তরের হিমশীতল উত্তর মহাসাগরের উপকূল (প্রায় ৮০° উঃ অক্ষরেখা) হইতে দক্ষিণে ভূ-বিষুবরেখা পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। আবার পূর্ব-পশ্চিমেও ইহা ভূ-পরিধির প্রায় অর্ধেক স্থান ব্যাপিয়া



বাৎসরিক বৃষ্টিপাত
১২০ ইঃর বেশী
৮০-১২০ ইঃ
৪০-৮০ ইঃ
২০-৪০ ইঃ
১০-২০ ইঃ
১০ ইঃর কম
মাইল
০
৪০০
১২০০
সুমেরুবৃত্ত
কর্কট ক্রান্তি
বিষুবরেখা

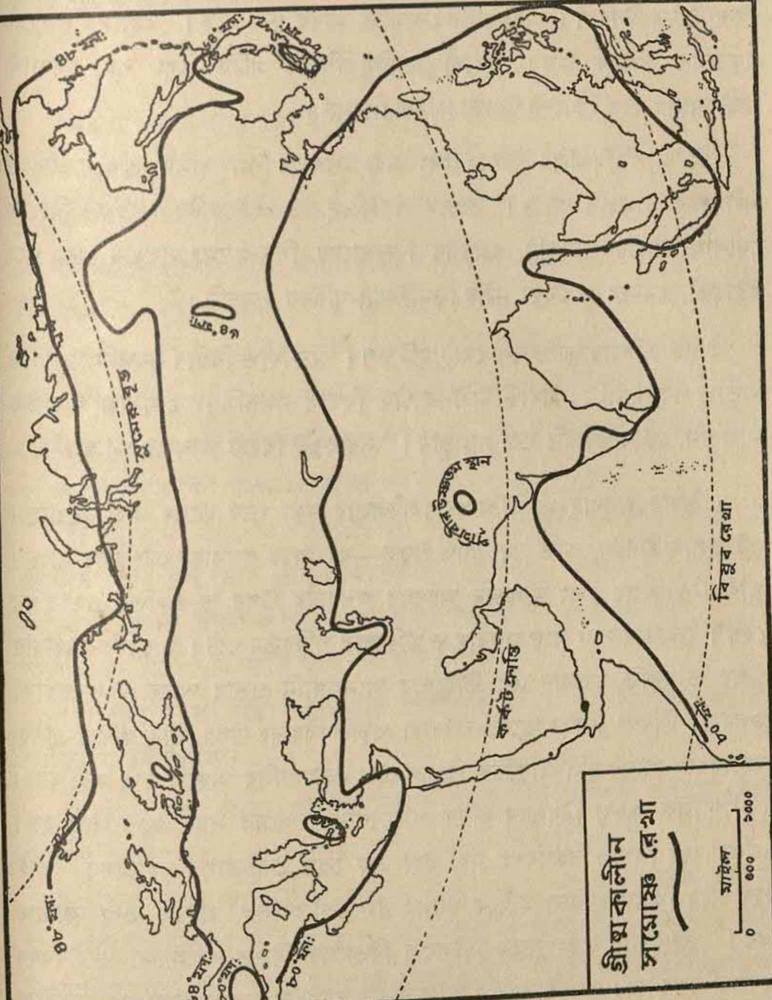
আছে। তুরস্কের পশ্চিম সীমা হইতে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত প্রায় ১৬৫° দ্রাঘিমার ব্যবধান। এশিয়া মহাদেশের আয়তন প্রায় ১ কোটি ৭৩ লক্ষ বর্গমাইল। এই মহাদেশটি যে কত বিশাল অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এশিয়া আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় দেড়গুণ এবং উত্তর আমেরিকার প্রায় দ্বিগুণ স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত। ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এশিয়া মহাদেশ ইউরোপ অপেক্ষা প্রায় সাড়ে চার গুণ এবং অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা পাঁচ গুণ বড়। আমাদের ভারতের মত চৌদ্দটি দেশ পাশাপাশি একত্র করিলে তবে এশিয়া মহাদেশের আয়তনের সমান হইবে।

এশিয়ার বৈচিত্র্য—আয়তনের বিশালতাই শুধু এশিয়ার বিশেষত্ব নয়, এশিয়ার প্রধান বিশেষত্ব তাহার বৈচিত্র্য। শিলা-প্রকৃতি, ভূমির উচ্চাবচতা, জীবজন্তু, উদ্ভিজ্জ, মানব সভ্যতা, লোকবসতি, ধন-সম্পদ সবকিছুরই চরম বৈচিত্র্য এই মহাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে যেমন প্রাচীন শিলা-গঠিত দাক্ষিণাত্য ও আরবের মালভূমি রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি নবীন শিলা-গঠিত ভূমিরও অভাব নাই। ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস-বিধৌত সমভূমি, গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি ও ইরাবতীর উপত্যকার নিম্নাংশ পলিগঠিত নবীন শিলায় সৃষ্ট। সমুদ্র হইতে সামান্য উঁচু বিস্তীর্ণ সমভূমি (সাইবেরিয়া ও সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি) যেমন আছে, অত্যুচ্চ পর্বতময় মালভূমিও (মধ্য এশিয়ার পর্বতসঙ্কুল মালভূমি) তেমনি আছে। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত হিমালয় এবং নিম্নতম স্থান মরুসাগরের গ্রস্ত উপত্যকা এই মহাদেশেই অবস্থিত। একদিকে যেমন বৃষ্টিহীন উষর মরুভূমি (আরব, গোবি ইত্যাদি) দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি সুজলা-সুফলা ভূমিরও (সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি, ইয়াংসিকিয়াং সমভূমি ইত্যাদি) তুলনা মিলে না। মধ্য এশিয়া এবং উত্তর সাইবেরিয়ার বৃক্ষবিরল বিস্তীর্ণ প্রান্তর যেমন আছে তেমনি আবার মৌসুমী ও নিরক্ষীয় অঞ্চলের ঘন নিবিড় বনও অনেক আছে। পৃথিবীর শীতলতম স্থান ভারখয়ানস্ক, উষ্ণতম স্থান জেকোবাবাদ, এবং সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের স্থান চেরাপুঞ্জি এই মহাদেশেই অবস্থিত। লোহিত সাগর হইতে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত ভূভাগে বৃষ্টিপাত খুবই কম, বৃষ্টিবিরল এতবড় ভূভাগ খুব কমই দেখা যায়। এশিয়ার কোথাও জনমানবহীন, অথবা জনবিরল বিশাল প্রান্তর, কোথাও আবার

অতি ঘনবসতির অঞ্চল দেখা যায়। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক এশিয়ায় বাস করে। পৃথিবীতে যে কয়টা প্রধান ধর্মমত প্রচলিত এশিয়া হইতেই তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এশিয়াতে যেমন অতি প্রাচীন সভ্য জাতি আছে, তেমনি অর্ধসভ্য আদিবাসীর সংখ্যাও কম নহে। একদিকে যেমন সুসভ্য চীনা, ভারতীয় ও আসীরিয় কৃষক ও কৃষিসভ্যতা দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি আবার যাযাবর বেদুইন, কিরঘিজ, স্যাময়েদ, ইয়াকুট প্রভৃতি মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখাও দেখা যায়। এই বৈচিত্র্যই এশিয়ার বিশেষত্ব। অন্য কোনও মহাদেশে বিভিন্ন বৈসাদৃশ্যের এমন বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এশিয়ার প্রাকৃতিক বিভাগ—ভূপৃষ্ঠের উচ্চাবচতার বৈচিত্র্যও এশিয়া মহাদেশে কম নয়। ভূ-প্রকৃতির সব রূপেরই সমাবেশ এই মহাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এশিয়ার ভূ-প্রকৃতির মানচিত্রটি লক্ষ্য করিলেই এই বৈচিত্র্য সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে। উত্তর দিকে এক বিশাল সমভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা সাইবেরিয়ার সমভূমি। ইহা সমুদ্র-সমতল হইতে সামান্য উঁচু এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় সহস্র মাইল বিস্তৃত। এই সুবিস্তীর্ণ সমভূমির দক্ষিণে এক পর্বতসঙ্কুল মালভূমি রহিয়াছে। এই পর্বতময় মালভূমি এশিয়া মাইনর হইতে একেবারে এশিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মালভূমি আড়াই মাইল হইতে তিন মাইল উঁচু, এবং কোন কোন স্থানে তিনশত মাইলের চেয়েও অধিক প্রশস্ত। উত্তরের বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরের তুলনা যেমন পৃথিবীর আর কোথাও মিলে না তেমনি অত্যুচ্চ সুবিশাল মালভূমির জুড়িও পৃথিবীর আর কোথাও নাই। মানচিত্রে দেখ কাশ্মীরের উত্তরে পামীর নামে একটি মালভূমি আছে। পামীরের পূর্বদিক হইতেই এই পর্বতবেষ্টিত মালভূমির প্রধান অংশ ত্রিভুজাকারে এশিয়ার মধ্যভাগ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। পামীর হইতে বহির্গত হিমালয় পর্বতশ্রেণীকে এই ত্রিভুজের দক্ষিণ বাহু বলা যাইতে পারে। আবার পামীর হইতে চুকচি উপদ্বীপ পর্যন্ত একটি রেখা টানিলে এই ত্রিভুজের পশ্চিম বাহু হইবে। পূর্বদিকে এই মালভূমি প্রায় সমুদ্র-উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত; তবে স্থানে স্থানে মালভূমি ক্ষয় করিয়া নদী আপন সমভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। পামীর মালভূমিই এই পর্বতবেষ্টিত মালভূমির প্রান্তসীমা নয়। পামীর হইতে পশ্চিমদিকে আরও কতকগুলি মালভূমি

ডিঙ্গির আকারে আফগানিস্তান, ইরাণ ও তুরস্কের মধ্য দিয়া একেবারে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পামীর হইতে অনেক পর্বত



এশিয়া মহাদেশের গ্রীষ্মকালীন সমোষ্ণ রেখা
১২১নং চিত্র

বাহির হইয়া মালভূমির বিভিন্ন অংশকে প্রাচীরের মত বেষ্টন করিয়া আছে। পামীর হইতে অনেক পর্বত বাহির হইয়াছে বলিয়াই পামীরকে পর্বতগ্রন্থি বলা হয়।

এশিয়ার প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে তাকাইলে এশিয়ার দক্ষিণে তিনটি বিশাল উপদ্বীপ দেখিতে পাইবে। প্রথমে আরব, মধ্যভাগে দক্ষিণ-ভারত এবং পূর্বপ্রান্তে ইন্দোচীনের উপদ্বীপ। এইগুলির কোনটিই অধিক উচ্চ নহে। ইহাদের ভূ-পৃষ্ঠের বন্ধুরতাও অনেক কম। ইহারা প্রাচীন শিলায় গঠিত এবং বহু যুগব্যাপী ক্ষয়ীভবনের ফলে ইহাদের উচ্চতা কমিয়া গিয়াছে।

এই মালভূমিগুলির উত্তরে এবং মধ্য এশিয়ায় মালভূমির দক্ষিণে তিনটি নদীমাতৃক সমভূমি আছে। প্রথমে টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস কর্তৃক বিধৌত মেসোপটেমিয়ার সমভূমি, তারপর হিন্দুস্থানের সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি এবং পূর্বে ইরাবতী, মেনাম ও মেকং নদীর তিনটি অল্প-পরিসর সমভূমি।

ইহাই এশিয়ার ভূপ্রকৃতির মোটামুটি রূপ। কোথাও বিস্তীর্ণ সমভূমি, কোথাও অত্যুচ্চ পর্বতমালা, কোথাও নদী-বিধৌত বিশাল সমভূমি। কোথাও অল্প উচ্চ মালভূমি, কোথাও অতি উচ্চ মালভূমি। সবকিছুই বিরাট আকারে আছে।

এশিয়ার জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জের বিভিন্নতার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃষ্টিবহুল, বৃষ্টিবিরল, অতি উষ্ণ, অতি শীতল—সর্বপ্রকার জলবায়ুই এশিয়াতে আছে। পার্বত্য অঞ্চলের এবং মালভূমি অঞ্চলের জলবায়ুর উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব খুব বেশী। উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জের পরিবর্তন ঘটে। মানুষের কর্মধারার উপর ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু এবং উদ্ভিজ্জের অনেকখানি প্রভাব আছে। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ এবং মানুষের কর্মধারা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া এশিয়া মহাদেশকে অনেকগুলি প্রাকৃতিক বিভাগ এবং ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। ভৌগোলিক অঞ্চল নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় পরিবেশকেও অনেক সময় গুরুত্ব দিতে হয়। এশিয়া শুধু বিশাল মহাদেশই নয়, ইহা এক চরম বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাদেশ। তাই সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ইহাকে অনেকগুলি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করিতে হয়। স্বল্পপরিসর এই পুস্তকে এইসকল বিভাগের বিস্তৃত আলোচনা ও বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা মহাদেশটিকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করিয়া সেই বিভাগের প্রত্যেকটি অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ দিব। স্থূলভাবে এই যে বিভাগের কথা বলা হইল তাহা

কখনও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ, কখনও ভূ-প্রকৃতি আবার কখনও বা অন্য পরিবেশের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা হইয়াছে।

সোভিয়েট এশিয়া

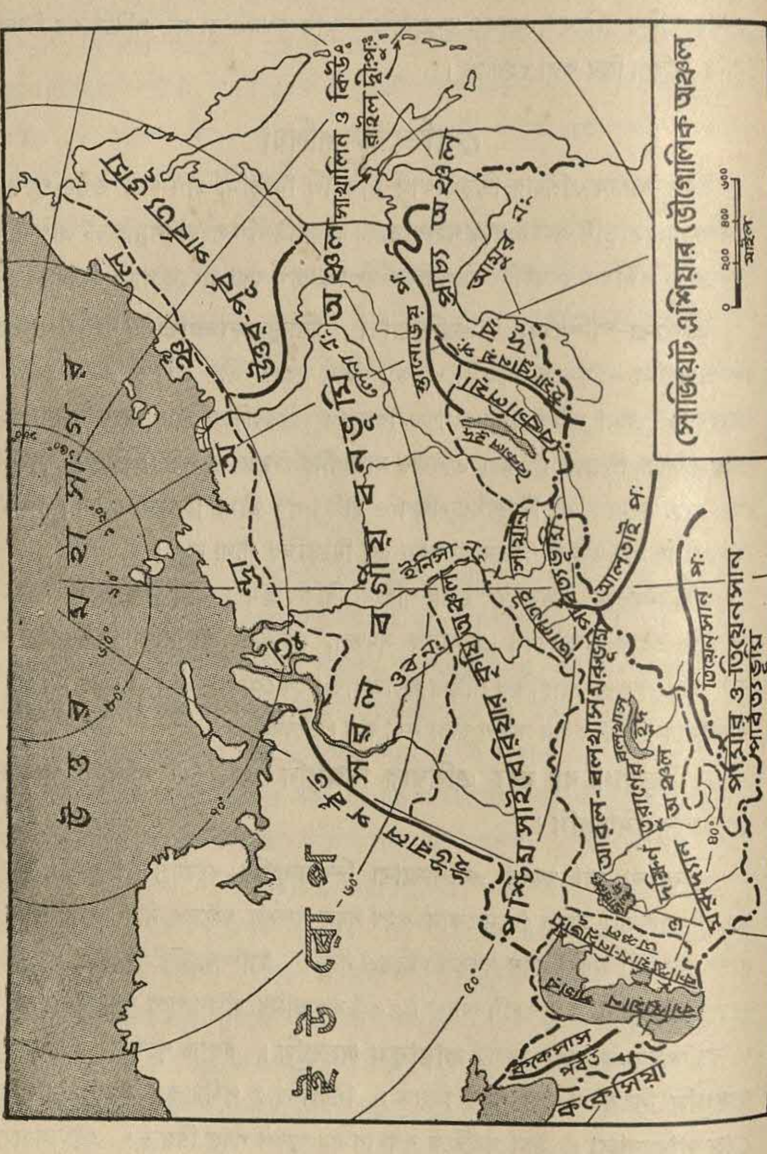
উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার ত্রিভুজাকার সুবিশাল নিম্নভূমি, দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্বের উচ্চ ও পার্বত্যভূমি এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ লইয়া সোভিয়েট এশিয়া। ইহাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন—

উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার ত্রিভুজাকার সুবিশাল নিম্নভূমি—ইউরাল-উচ্চভূমি ও কাস্পিয়ান হ্রদের তীর হইতে এই নিম্নভূমি উত্তর-পূর্বে লেনা নদীর ব-দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরদিকে ইহা উত্তর মহাসাগর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। মধ্য এশিয়ার মালভূমির উত্তর ও পশ্চিম দিকের পর্বত-বেষ্টনীকে অনেকে এই নিম্নভূমির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমা হিসাবে ধরেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ভঙ্গিল পর্বতমালা সর্বত্র এই নিম্নভূমির সীমা নহে।

এই নিম্নভূমি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। কোথাও ইহার উপরিভাগ একেবারে সমতল, কোথাও বা সামান্য উঁচু-নীচু। নদী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে কোথাও বা ইহা বন্ধুর। এই সমভূমিকে দুইটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **তুরাণ বা মধ্য এশিয়ার নিম্নভূমি** এবং (২) **পশ্চিম সাই-বেরিয়ার নিম্নভূমি।**

তুরাণ বা মধ্য এশিয়ার নিম্নভূমি—তুরাণের নিম্নভূমি শুষ্ক মরুসদৃশ অঞ্চল। ইহার কোন কোন অংশ সমুদ্র-সমতল হইতেও নীচু। কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চল সমুদ্র-সমতল হইতেও নীচু। কাস্পিয়ানের পূর্বদিকে সামান্য দূরে দুইটি অল্প-উচ্চ মালভূমি আছে। এই মালভূমির দক্ষিণ-পূর্বে আমুদরিয়া নদী ও কাস্পিয়ানের মধ্যে মরুময় **কারাকুম সমভূমি**। ইহার পূর্বে **কিজিলকুম সমভূমি** সিরদরিয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। সিরদরিয়ার পূর্বদিকের সমভূমির নাম **বেড্‌পাকডালা**। ইহা পূর্বদিকে বলখাস হ্রদ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বলখাস সমভূমির উপর দিয়া প্রাচীনকালে তুরাণ হইতে চীনদেশে যাতায়াতের পথ ছিল।


সোভিয়েট এশিয়ার ভৌগোলিক অঞ্চল
মাইল
আরল-বলখাস মরুভূমি
আলতাই পঃ
ককেসিয়া
ককেসাস পর্বত
সাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ
উত্তর-পূর্ব অঞ্চল

১২২নং চিত্র

এই পথেই মধ্যযুগে তুরাণের সঙ্গে চীনদেশের বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলিত। উত্তরদিকে **টুরগাই সমভূমি** পশ্চিম সাইবেরিয়ার সহিত তুরাণের সংযোগ সাধন করিয়াছে। তুরাণের নিম্নভূমির উত্তর-পূর্বে পশ্চিম সাইবেরিয়ার নিম্নভূমি।

পশ্চিম সাইবেরিয়ার নিম্নভূমি—অব ও ইরতিস নদীর অববাহিকা লইয়া এই সুবিশাল নিম্নভূমি গঠিত। এরূপ বিশাল নিম্নভূমি পৃথিবীতে খুব কমই দৃষ্ট হয়। অব নদীর সমভূমির উত্তরাংশের বহু স্থানে হিমবাহ-বাহিত শিলারাশি সঞ্চিত রহিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সময়ের মাপ অনুযায়ী বলিতে গেলে বলিতে হয় যে সাম্প্রতিক ভূতাত্ত্বিক যুগে (recent geological age) ইহা সমুদ্রের নীচে ছিল। তাই এই সমভূমির উপরিভাগ সামুদ্রিক শিলায় গঠিত দেখা যায়। এই সমভূমির দক্ষিণে এক বিশাল জলাভূমি রহিয়াছে। ইহা **ভাস্যুইগান জলা** (Vasyugan swamp) নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে আরও অনেক জলাভূমি আছে। এই জলাভূমি থাকার কারণ পরে জানিতে পারিবে। ইহার দক্ষিণে শুষ্ক মরুসদৃশ সমভূমি। বায়ুর ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে এখানে ছোটবড় অসংখ্য গর্তের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কোথাও বা ছোট ছোট বালিয়াড়ি চোখে পড়ে। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়াই ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ গিয়াছে। এই সমভূমি ইনিসি নদীর অপর তীরেও কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার এই নিম্নভূমির ভূ-প্রকৃতি প্রায় একইরূপ। সমগ্র অঞ্চলেই জনবসতি অল্প। তবে জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ এবং মানুষের কর্মধারা সর্বত্র এক নহে। এই বিভিন্নতার জন্য এই অঞ্চলকে কতকগুলি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে। নিম্নে এই অঞ্চলগুলির বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) **কাস্পিয়ান হ্রদ-তীরের নিম্নভূমি**—কাস্পিয়ান হ্রদের চতুর্দিকের নিম্নভূমি লইয়া ইহা গঠিত। এই নিম্নভূমি সমুদ্র-সমতল হইতেও নীচু। অতি প্রাচীন কালে তুষার যুগে (Ice Age) কাস্পিয়ান সাগর আরও বিস্তৃত ছিল। জল কমিয়া যাওয়ায় এখন চারিদিকের স্থান নিম্নভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা সমুদ্র-সমতল হইতে প্রায় ৮৫ ফুট নীচু। এই অঞ্চল অনেকটা গামলার আকারের (basin shaped), মধ্যভাগ নীচু, চারিদিক ক্রমশঃ উঁচু হইয়া গিয়াছে। নদীগুলি মধ্যভাগের এই নিম্ন স্থানের দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

এই অঞ্চল মরুভূমিময়। বৃষ্টিপাত অতি অল্প হয়, জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন। শীতকালে সাইবেরিয়ার শীতল বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তখন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের প্রায় ৫০° ফাঃ নীচে নামিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে মধ্য এশিয়া হইতে শুষ্ক বায়ু প্রবলবেগে এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন তাপমাত্রা ১১০° ফাঃ পর্যন্ত উঠে। বৃষ্টিপাত সর্বত্র সমান নহে, তবে কোথাও বৎসরে ১২ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হয় না। অত্যধিক উষ্ণতার জন্য এখানে এত অধিক বাষ্পীভবন হয় যে অনেক সময় নদীগুলি কাস্পিয়ান হ্রদে পৌছিবার পূর্বেই শুকাইয়া যায়, আবার শীতকালে নদীগুলি তিন চারি মাস বরফে জমিয়া থাকে।

চাষ-আবাদের পক্ষে এই অঞ্চল সম্পূর্ণ অনুপযোগী। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে যেখানে জলসেচের সুবিধা আছে সেখানেই শুধু কৃষিভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল জমিতে গম, বার্লি এবং মিলেটই প্রধান ফসল। এখানে মঙ্গোল জাতীয় কয়েকটি যাযাবর জাতির বাস। উট এবং মেষপালনই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। কাস্পিয়ানের উত্তর তীরে অনেক লোক মাছ ধরার কাজে লিপ্ত আছে।

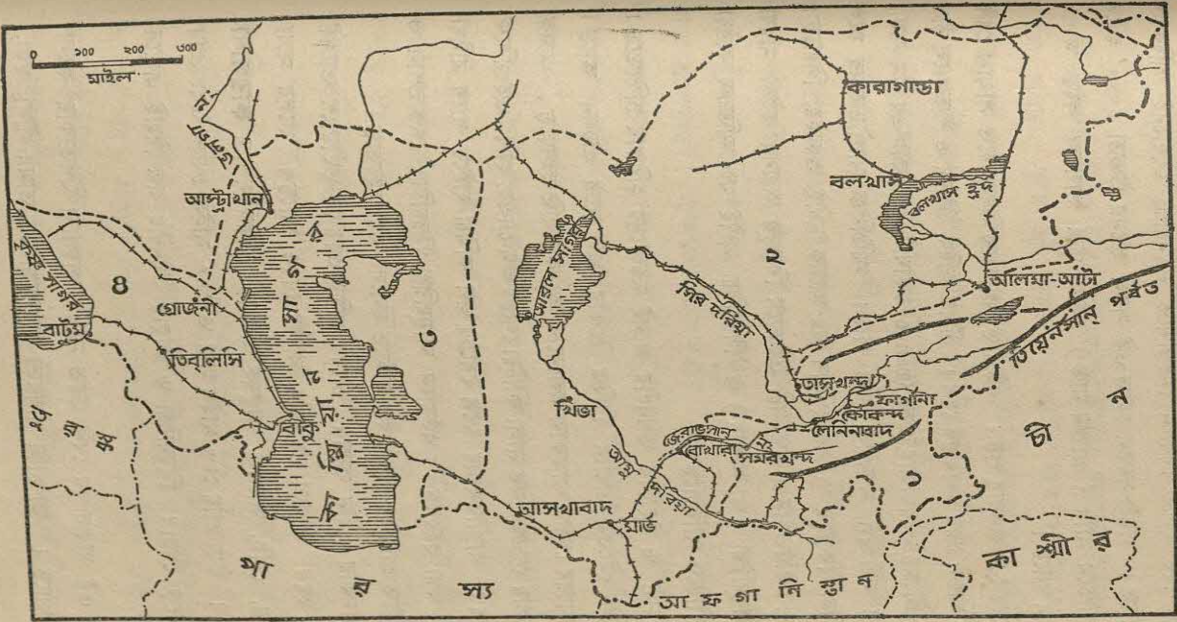
খনিজ সম্পদ এখানে অনেক আছে। এখানে পেট্রোলিয়াম, সোহাগা, গন্ধক ও গন্ধকমিশ্রিত লবণ এবং অন্যান্য অনেক খনিজ লবণ পাওয়া যায়।

আষ্ট্রাখান* (ইউরোপীয় রাশিয়া)—এই অঞ্চলের প্রধান নগর। কাস্পিয়ানের পশ্চিম তীরে ভল্গার একটি শাখানদীর উপর ইহা অবস্থিত। এখান হইতে কৌটাবন্দী মৎস্য, কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্য এবং খনিজ তৈল রপ্তানী হয়। এই নগরের লোকসংখ্যা আড়াই লক্ষের অধিক।

(২) **দক্ষিণ তুরাণের মরূদ্যান অঞ্চল**—তুরাণ শুষ্ক মরুভূমি। এখানে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক সেই দিকেই বালুকাময় মরুভূমি দেখিতে পাওয়া যাইবে। দক্ষিণ তুরাণকে দুইটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে, যেমন—দক্ষিণ তুরাণের মরূদ্যান ও আরল-বলখাস মরু অঞ্চল। দক্ষিণ তুরাণের দক্ষিণ দিকে নিম্নভূমি ও কিছু উত্তরে কাজাকের উচ্চভূমি।

---

* ভৌগোলিক অঞ্চলের সীমারেখা সবসময় রাষ্ট্রীয় বিভাগের সীমারেখার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলে না। এই অঞ্চলেও তাহা হইয়াছে। এই অঞ্চলের সামান্য অংশ ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত, তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য সমগ্র ভৌগোলিক অঞ্চলেরই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।



দক্ষিণ-পশ্চিমে সোভিয়েট এশিয়ার ভৌগোলিক অঞ্চল
(১) পামির ও তিয়েনসানের পার্বত্য অঞ্চল, (২) আরল-বলখাস মরুভূমি ও দক্ষিণ তুরাণের মরূদ্যান অঞ্চল,
(৩) কাস্পিয়ান হ্রদ-তীরের নিম্নভূমি, (৪) ককেসিয়া।
১২৩নং চিত্র

নদীগুলি পর্বত হইতে যেখানে নিম্নভূমিতে নামিয়াছে সেখানেই অধিকাংশ মরূদ্যান অবস্থিত। সমুদ্র-সমতল হইতে এই সকল স্থানের উচ্চতা ১০০০′ হইতে ১৫০০′। পশ্চিমে মারি (প্রাক্তন মার্ভ) হইতে পূর্বে তাসখন্দ পর্যন্ত অঞ্চলে অনেক মরূদ্যান আছে।

এইসকল স্থানের জলবায়ু শুষ্ক। বৃষ্টিপাত অল্প, তবে উচ্চভূমিতে সামান্য বেশী বৃষ্টি হয়। এ অঞ্চল চরম জলবায়ুর দেশ। গ্রীষ্মে অধিক উষ্ণতা ও শীতকালে তীব্র শীত। শীত-গ্রীষ্মের তাপমাত্রার প্রসর (range) কোথাও ৫০° ফাঃ-এর কম নহে।

এখানকার নদীগুলি বরফগলা জল পায়। অতিরিক্ত বাষ্পীভবনের ফলে মরুর মধ্য দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর অনেক নদীই শুকাইয়া গিয়াছে। তেজেন, মুর্ঘাব, জেরাভশান প্রভৃতি নদী এইভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মরিয়া গিয়াছে। আমুদরিয়া (বা অক্সাস) ও সিরদরিয়া নদীই মরু অতিক্রম করিয়া আরল হ্রদে পৌছিতে পারিয়াছে।

এইসকল নদী ও ইহাদের উপনদীর জলেই মরূদ্যানের কৃষিকার্য চলিতেছে। বহু প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন প্রকার জলসেচের প্রচলন আছে। সোভিয়েট সরকারের চেষ্টায় আজকাল জলসেচের অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থানে মাটির তলায় সুড়ঙ্গের মত নালা কাটিয়া সেচের জল নেওয়া হয়। এইগুলিকে **ক্যারেজ** বলে। বাষ্পীভবনের ফলে সেচের জল কমিয়া যাইতে পারে বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে আমুদরিয়া, সিরদরিয়া, জেরাভশান ও চিরচিক নদী হইতে প্রায় ৪৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হইতেছে।

তূলাই এখানকার প্রধান ফসল। চাষের জমির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভাগেই তূলার চাষ করা হয়। এছাড়া গম, ধান, বার্লির চাষও আছে। ফলের মধ্যে অ্যাপ্রিকট, প্লাম, চেরি, আপেল, আঙ্গুরই প্রধান। কৃষিজ সম্পদে **ফারগানা** উপত্যকাই শ্রেষ্ঠ। ইহা প্রায় ১৮০ মাইল লম্বা ও ১০০ মাইল চওড়া এবং প্রায় চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা। সিরদরিয়া ও তাহার উপনদীর জল দিয়াই এখানে চাষ-আবাদ হয়।

খনির কাজে এই অঞ্চল খুব বেশী উন্নত নয়। ফারগানা উপত্যকায় কয়লা ও পেট্রোলিয়াম আছে। তা'ছাড়া পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলিতে তামা, সীসা, দস্তা,

সোনা ও রূপা পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে এখানে খনি-শিল্প গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা আছে।

এই অঞ্চলের ভিতর দিয়া প্রাচীনকালে চীন ও ভারতের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য চলিত। তাই এই অঞ্চলে বহু প্রাচীন শহর দেখিতে পাওয়া যায়। বোখারা, মার্ভ, সমরখন্দ, তাসখন্দ প্রভৃতি প্রাচীন শহরে প্রাচ্যের বণিকদের সহিত পাশ্চাত্ত্যের বণিকদের বাণিজ্য-সামগ্রীর আদান-প্রদান হইত। জেরাভশান নদীর তীরে অবস্থিত **সমরখন্দ** অতি প্রাচীন শহর। অতি প্রাচীনকালেই ইহা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার এই শহর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। পরবর্তীকালেও অনেক অভিযানকারী বীর ইহা আক্রমণ করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লইয়া গিয়াছেন, তবুও ইহার ঐশ্বর্য একেবারে লোপ পায় নাই। এখানে প্রাচীন যুগের মুসলিম কারুকার্য-খচিত অনেক প্রাসাদ ও মসজিদ আছে। বর্তমান কালে **তাসখন্দ**ই (লোকসংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ) এই অঞ্চলের বৃহত্তম নগর। ইহা শিল্পপ্রধান শহর। গত মহাযুদ্ধের সময় এখানে একটি ইস্পাতের কারখানা তৈয়ারী করা হইয়াছে। অন্যান্য শহরের মধ্যে **লেনিনাবাদ** (প্রাক্তন খোজেন্দ), **ফারগানা** ও **খোকন্দ**ই প্রধান।

(৩) **আরল-বলখাস মরুভূমি**—আরল ও বলখাস হ্রদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক ও চরম। কোথাও ১০"র অধিক বৃষ্টিপাত হয় না। গ্রীষ্মকালে জুলাই মাসের গড় উষ্ণতা ৮০°-৮৫° ফাঃ হয়, শীতে সাইবেরিয়ার শীতল বায়ুর প্রভাবে প্রচণ্ড শীত পড়ে। আমুদরিয়া নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে শীতকালে কখনও কখনও তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ৪০°-৪৫° ফাঃ নীচে নামিয়া যায়।

এ অঞ্চলে অনেক হ্রদ আছে, তবে খুব কম হ্রদেই সারা বৎসর জল থাকে। হ্রদগুলি ছোট। **বলখাস** ও **আরল**ই বৃহৎ ও প্রধান। নদীগুলি মরুপথে নিঃশেষিত হইয়াছে একথা আগেই বলা হইয়াছে।

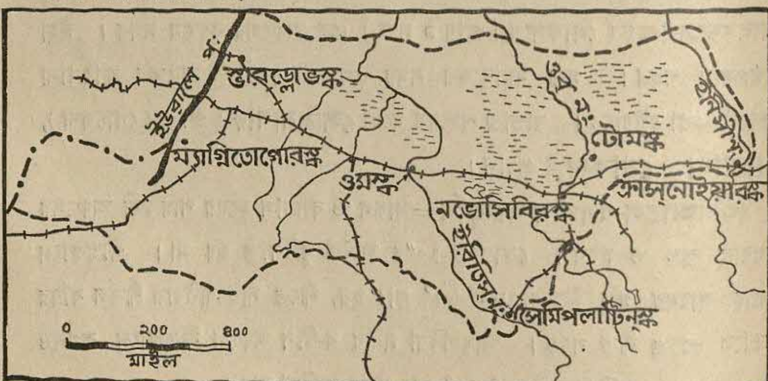
শুষ্ক জলবায়ুর জন্য এখানে বসতি খুব কম। এখানে প্রধানতঃ যাযাবর জাতিরই বাস। তাহারা মেষপাল লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। চাষ-আবাদ এখানে প্রায় নাই বলিলেই চলে।

কৃষি সম্পদে হীন হইলেও এখানে খনিজ সম্পদ অনেক আছে। এ অঞ্চলের

কারাগাণ্ডা কয়লা খনির জন্য বিখ্যাত। কয়লা উৎপাদনে সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যে কারাগাণ্ডার স্থান পঞ্চম। ১৯৫০ সালে এই খনি হইতে প্রায় ১৬,০০০,০০০ টন কয়লা উঠান হইয়াছিল। এ ছাড়া বলখাস হ্রদের উত্তরে কৌনরাডে তামার খনি, আস্কাবাদের উত্তরে গন্ধক, ও চিমখেন্দে সীসার খনি আছে।

আস্কাবাদ, খিবা, আলমাআটা, বলখাস এবং **কারাগাণ্ডা** এই অঞ্চলের প্রধান শহর।

(৪) **পশ্চিম সাইবেরিয়ার কৃষি অঞ্চল**—এই অঞ্চল ইউরাল উচ্চভূমি হইতে পূর্বে অব ও ইনিসি নদীর উর্ধ্ব প্রবাহ পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে উচ্চভূমি বা পাহাড় নাই। উন্মুক্ত সমতল ভূমিই এখানকার বিশেষত্ব। এই অঞ্চলের উত্তরাংশে বনভূমি ও দক্ষিণাংশে স্তেপ ভূমি ছিল। এই সকল স্থান আবাদ করিয়া এখন কৃষিকার্য হইতেছে।



পশ্চিম সাইবেরিয়ার কৃষি অঞ্চল
১২৪নং চিত্র

এখানকার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। শীতকালে তুষারপাত হয়। কখন কখন এত অধিক বরফ পড়ে যে পথঘাট বন্ধ হইয়া যায়, এবং যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ হইতে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত গড় উষ্ণতা হিমাঙ্কের উপরে উঠে না। গ্রীষ্ম ঋতু স্বল্পকালস্থায়ী এবং নাতি-উষ্ণ। একমাত্র জুলাই মাসেই উষ্ণতা ৬৮° ফাঃ-এর অধিক হয়। বারিপাত গ্রীষ্মকালে অধিক হয়। বার্ষিক বারিপাতের পরিমাণ ১২"-১৮"।

এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর, তাই কৃষি অঞ্চল হিসাবে ইহা সোভিয়েট রাষ্ট্রে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে গম, জই, রাই ও বার্লির প্রচুর চাষ হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে গম উৎপাদনে ইহার স্থান দ্বিতীয়। সমগ্র দেশের উৎপন্ন গমের প্রায় ১৩ শতাংশ এখানে উৎপন্ন হয়। এখানে গরু এবং মেষও প্রতিপালিত হয়। দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং কৌটাবন্দী মাংস এখান হইতে প্রচুর রপ্তানী হয়।

ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহাতে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানীর যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। শহরগুলি রেল লাইনের ধারে এবং রেল ও নদীপথের সংযোগস্থলে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক শহরেই আটা ও ময়দার কল আছে। **নভোসিবিরস্ক** ও **ওমস্ক** এখানকার প্রধান শহর। অন্যান্য শহরের মধ্যে ইনিসি তীরের **ক্রাসনোইয়াস্ক** ও অব নদীর নিকটবর্তী **টমস্ক** শহরই প্রধান।

(৫) **তুন্দ্রা অঞ্চল**—উত্তর মহাসাগরের উপকূলে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া হইতে এশিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত একটি দীর্ঘ অল্পপরিসর অঞ্চলে জলবায়ু অতি শীতল। ইহাই তুন্দ্রা অঞ্চল নামে পরিচিত। ৫০° ফাঃ জুলাই সমোষ্ণরেখা তুন্দ্রা-ভূমির দক্ষিণ সীমা।

এখানে শীতকাল বৎসরে প্রায় নয় মাস স্থায়ী হয়। শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে নামিয়া যায়। গ্রীষ্মকালেও উষ্ণতা কম থাকে। নদীগুলি বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফে জমিয়া থাকে। গাছপালা বেশী নাই। শেওলা ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদই প্রধান। মৃত্তিকাও অনুর্বর।

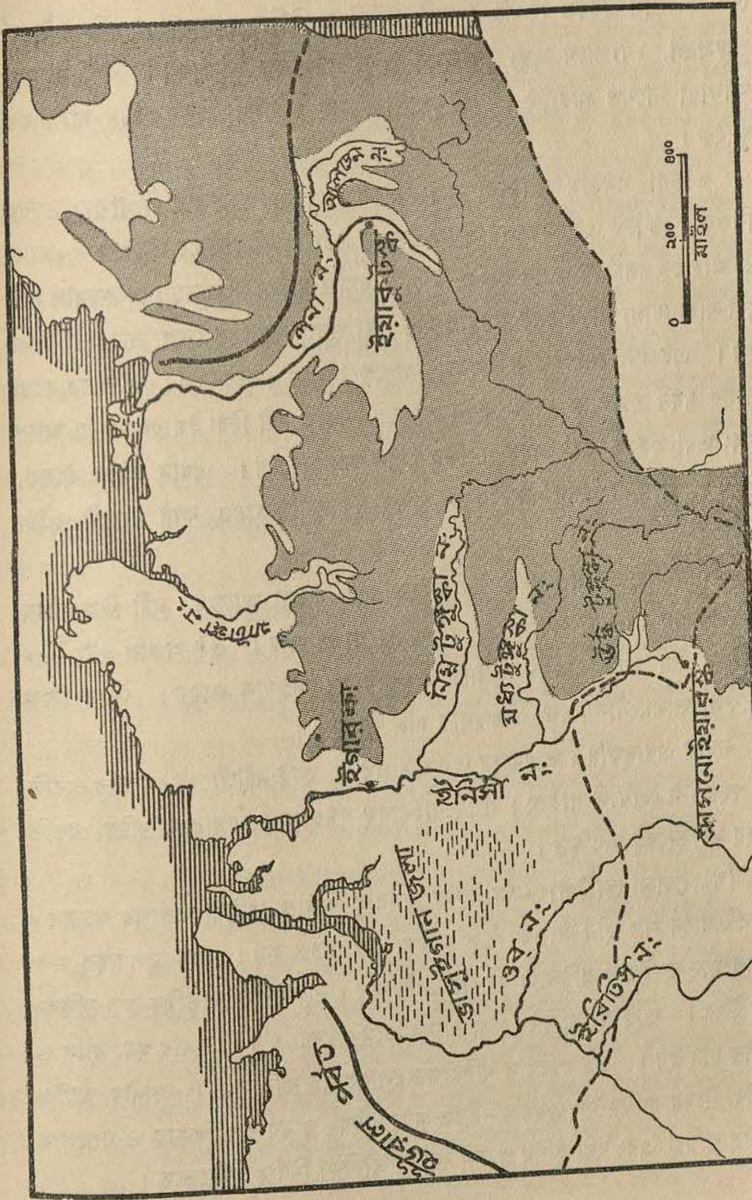
চাষের পক্ষে এ অঞ্চল সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তবে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা এই অঞ্চলে গম উৎপাদন করা যায় কিনা তাহার পরীক্ষা করিতেছেন। আদিম অধিবাসীরা এখনও বল্গাহরিণ চরাইয়া বেড়ায় এবং মৎস্য ও পশু শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

(৬) **সরলবর্গীয় বনভূমি অঞ্চল**—তুন্দ্রাভূমির দক্ষিণে বেরিং সাগরের তীর হইতে পশ্চিমে ইউরাল-উচ্চভূমি পর্যন্ত এই বনভূমি অঞ্চল বিস্তৃত। ইহার পশ্চিমাংশ সমভূমি, পূর্বাংশ পার্বত্যভূমি এবং মধ্যভাগ উচ্চভূমি। এই বনভূমির

উত্তরাংশ তাইগা নামে পরিচিত। অব, ইনিসি, লেনা ও তাহাদের উপনদীগুলি এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িতেছে। এ অঞ্চলে শীত অত্যধিক, শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী, তাপমাত্রা তখন হিমাঙ্কের অনেক নীচে নামে। বৃষ্টিপাত অপেক্ষা তুষারপাতই এখানে অধিক হয়। বৎসরে কয়েক মাস এই অঞ্চল তুষারাবৃত থাকে। নদীর জল তখন জমাট বাঁধিয়া যায়। বসন্ত ঋতুতে নদীর উচ্চপ্রবাহ প্রথমে গলিতে আরম্ভ করে, নিম্নপ্রবাহ তখনও বরফে জমাট থাকে, তাই তখন নদীর জল দুই তীর ছাপাইয়া বন্যার সৃষ্টি করে। আবার শরৎকালে যখন জল জমিতে আরম্ভ করে তখন নিম্নপ্রবাহের জল প্রথমে জমিয়া যায়, উচ্চপ্রবাহের জল নিম্নপ্রবাহে আসিয়া নদীর দুই তীরে ছড়াইয়া পড়ে, ফলে তখনও বন্যা হয়। এজন্য এ অঞ্চলে অসংখ্য জলাভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল জলাভূমিতে মশামাছির জন্ম হয়, কখন কখন মশা ও পোকার উপদ্রব এত অধিক হয় যে বন্যাহরিণগুলিও চঞ্চল হইয়া উঠে। এই অঞ্চলের বনভূমিতে ফার, পাইন, স্প্রুস্, লার্চ প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান। এই বনভূমি হইতে প্রচুর কাষ্ঠ চালান হয়। এখানকার বৃক্ষ কাষ্ঠমণ্ড ও রেয়ন (rayon) তৈয়ারীর উপযোগী। এই বনভূমিকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন—

(ক) **অব-তাইগা**—এই অঞ্চল নিম্ন সমতল ভূমি, ধীরে ধীরে ইহা উত্তর মহাসাগরের দিকে নামিয়া গিয়াছে। এখানে জমির ঢাল প্রতি মাইলে প্রায় দুই ইঞ্চি। অব নদী ৩২০০ মাইল লম্বা। ইরিতিস ইহার প্রধান উপনদী। অব ও তাহার উপনদীগুলি অনেক দূর পর্যন্ত নৌ-বাহনযোগ্য। নদীর নিম্নাংশের জলাভূমির কথা আগেই বলা হইয়াছে। অব ও ইরিতিসের সঙ্গমস্থলের নিকটে ভাস্যুইগান জলাভূমি বিখ্যাত। ইহা প্রায় এক লক্ষ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। এখান হইতে প্রচুর কাষ্ঠ বাহিরে চালান যায়। নদী দিয়াই অধিকাংশ কাষ্ঠ সমুদ্রতীরে লইয়া যাওয়া হয়; তবে দক্ষিণ দিক হইতে অনেক কাঠ রেলপথেও চালান দেওয়া হয়। এই বনভূমিতে কোন উল্লেখযোগ্য শহর নাই।

(খ) **ইনিসি তাইগা**—ইনিসি তাইগার অধিকাংশই মধ্য সাইবেরিয়ার উচ্চভূমিতে অবস্থিত। এই উচ্চভূমি পূর্বদিকে উচ্চ হইয়া লেনা ও ইনিসি নদীর মধ্যে জলবিভাজিকার সৃষ্টি করিয়াছে। এই জলবিভাজিকা প্রায় ৪৫০০ ফুট উচ্চ।



ন্দ্রা ও সরলবর্গীয় বনভূমি অঞ্চল (উচ্চভূমি অঞ্চল শেড করা আছে)

এই উচ্চভূমি হইতে তিনটি উপনদী ইনিসিতে মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণে **উর্ধ্ব টুঙ্গুসকা**, মধ্যভাগে **মধ্য টুঙ্গুসকা** ও উত্তরে **নিম্ন টুঙ্গুসকা**। উর্ধ্ব টুঙ্গুসকা আঙ্গারা নামেও পরিচিত। এই আঙ্গারা সহ ইনিসির দৈর্ঘ্য ৩৫০০ মাইলেরও অধিক।

তাইগা বনভূমি আঙ্গারা নদী হইতে ৭৫০ মাইল উত্তরে **ইগারকা** পর্যন্ত বিস্তৃত। কাঠই এই অঞ্চলের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। নদীর তীরে তীরে কাষ্ঠ চেরাই ও জাহাজে বোঝাই করার জন্য ছোট ছোট বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। যে কয়মাস নদী নৌ-বাহনযোগ্য থাকে সেই কয়মাস নদী দিয়া অসংখ্য কাষ্ঠের ভেলা ভাসাইয়া আনা হয়। এইগুলি চেরাইকলে চিরিয়া বিদেশে চালান দেওয়া হয়। উত্তরের কারা সাগর যখন বরফমুক্ত থাকে তখন সমুদ্রের জাহাজ নদী দিয়া ইগারকা পর্যন্ত আসে এবং তথা হইতে কাষ্ঠ লইয়া বিভিন্ন দেশে চালান দেয়। এখান হইতে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানী এমন কি সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায়ও কাষ্ঠ রপ্তানী হইয়া থাকে।

ইনিসির পূর্বভাগে টুঙ্গুসকা উচ্চভূমিতে প্রচুর কয়লা আছে। নদী উপত্যকায় ও দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলেই কয়লা অধিক পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে প্রায় ৪০০ বিলিয়ন টন কয়লা আছে বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন। উত্তর দিকে নিকেল, তামা, সীসা, দস্তা ও কয়লার খনি আছে।

নদীই এখানকার যাতায়াতের একমাত্র পথ। তাই নদীতীরেই লোকের বসতি ও শহরগুলি দেখিতে পাইবে। ক্রাসনোইয়ারস্ক, মিনুসিনস্ক, ইগারগা, দুদিঙ্কা প্রভৃতি শহর নদীতীরেই অবস্থিত।

(গ) **লেনা তাইগা**—এখানকার জলবায়ু অন্যান্য তাইগা অঞ্চলের অনুরূপ। তবে এখানে অন্য স্থান অপেক্ষা শীত অধিক, বৃষ্টিপাতও কম। শুষ্ক জলবায়ুর জন্য নিম্নভূমিতে তাইগার পরিবর্তে তৃণভূমি দেখা যায়। এই সকল তৃণভূমির কৃষ্ণ মৃত্তিকা খুব উর্বর। তাই স্থানে স্থানে অল্প চাষের জমিও দেখা যায়। তথায় গম, বার্লি ও সব্জীর চাষ হয়। এই চাষবাস বহিরাগত লোকেরাই করিতেছে। স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের অধিকাংশ এখনও নদীতে মাছ ধরিয়া, বনের পশু শিকার ও পশুলোম সংগ্রহ করিয়া এবং বন্য হরিণ পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

এই অঞ্চলে নদী হইতে স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করা হইত। ১৯২৩ সালে আলডান অঞ্চলে একটি স্বর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের এক-পঞ্চমাংশ স্বর্ণ এই খনি হইতেই পাওয়া যায়। এই শীতের দেশে পূর্বে কেবল গুরুতর অপরাধী-দেরই নির্বাসনে পাঠান হইত; কিন্তু এখন এই স্থানে প্রায় ৪০,০০০ লোক এই খনির কাজে নিযুক্ত আছে। আজকাল রেলপথের সাহায্যে এই অঞ্চলের সঙ্গে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের সংযোগ সাধন করা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, লেনা নদীতে নৌ-চালনেরও যথেষ্ট উন্নতি করা হইয়াছে। যেখানে রেলপথ তৈয়ারী করা সম্ভব হয় নাই সেখানে মোটর গাড়ী চলাচলের উপযোগী ভাল রাস্তা করা হইয়াছে। ইয়াকুটস্কের নিকটে কয়লাখনি হইতে বৎসরে প্রায় আড়াই লক্ষ টন কয়লা উঠান হইতেছে। জাহাজ ও রেলগাড়ী এই কয়লাই ব্যবহার করে। এই সকল কারণে এই অঞ্চলের দ্রুত উন্নতি ঘটিতেছে।

ইয়াকুটস্কই এই অঞ্চলের একমাত্র বড় শহর। ইহা ইয়াকুট রিপাব্লিকের রাজধানী।

দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্বের উচ্চ ও পার্বত্যভূমি—মধ্য এশিয়ার ভঙ্গিল পর্বতমালার কোন কোন অংশ রাশিয়ার রাষ্ট্রসীমার মধ্যে পড়িয়াছে। এইগুলি ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্যভূমিকে কতকগুলি ভৌগোলিক বিভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) **ককেসিয়া**—কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান হ্রদের মধ্যবর্তী ককেসাসের পার্বত্য ও উচ্চভূমি লইয়া এই অঞ্চল। ইহার পরিমাণ প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল। ককেসাস পর্বত বাকুর নিকট হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। অধিকাংশ স্থানই ১২০০ ফুটের অধিক উচ্চ। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এলব্রূস ১৮,৪৬৮ ফুট উচ্চ। পর্বতের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর। এই পর্বত হইতে অনেক হিমবাহ বাহির হইয়াছে। ককেসাসের দক্ষিণে ইহার সমান্তরাল ভাবে অব-ককেসাস পর্বত অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ৬০০০′-১০,০০০′। অনুচ্চ সুরাম পাহাড় এই দুই পর্বতকে যোগ করিয়াছে। দুই পর্বতের মধ্যে দুইটি নিম্ন উপত্যকা আছে। একটি উপত্যকা দিয়া কুরা নদী কাস্পিয়ানে এবং অপরটির মধ্য দিয়া রিওন নদী কৃষ্ণসাগরে পড়িতেছে।

ভূমির উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে এখানে জলবায়ু এবং উদ্ভিজ্জেরও পরিবর্তন লক্ষ্য

করা যায়। পশ্চিমাংশে কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু। এখানে বাটুমিতে প্রায় ৯৩" বারিপাত হয়। পূর্বাংশে কাস্পিয়ান অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক ও চরম। বাকুতে বৎসরে মাত্র ৯" বৃষ্টি হয়। সুরাম পাহাড় ও ককেসাস পর্বতের জন্য কৃষ্ণসাগরের আর্দ্র বায়ু ককেসাসের উত্তরে ও কাস্পিয়ান অঞ্চলে পৌছিতে পারে না। জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্য এখানে নানা জাতীয় বৃক্ষ ও ফুল জন্মে।

উপক্রান্তীয় অঞ্চলের বহু ফসল এখানে উৎপন্ন হয়। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ভুট্টা, তুলা, তামাক, আঙ্গুর, ও নানা জাতীয় ফলই প্রধান। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে মেষ পালন করা হয়। তাই এই অঞ্চল হইতে প্রচুর পশম ও চামড়া রপ্তানী হয়।

খনিজ তৈলের জন্য এই অঞ্চল প্রসিদ্ধ। কাস্পিয়ান তীরের বাকু অঞ্চলেই সর্বাধিক পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক পেট্রোলিয়াম এই খনি অঞ্চল হইতেই উঠান হয়। এখান হইতে নলের সাহায্যে তৈল কৃষ্ণসাগর তীরে বাটুমিতে চালান দেওয়া হয়। অপর একটি পাইপ লাইন ইউক্রেন পর্যন্ত গিয়াছে। ককেসাসের উত্তরে গ্রজনি ও মাইকপেও তৈল পাওয়া যায়। এখানে প্রচুর ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। কৃষ্ণসাগর তীরের পটি হইতে ইহা পশ্চিম ইউরোপে ও আমেরিকায় রপ্তানী করা হয়। এছাড়া এখানে তামা, আরসেনিক, টাঙ্গষ্টেনও পাওয়া যায়।

এখানে বিভিন্ন জাতির লোক বাস করে। এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রাচীন বাণিজ্য পথ ছিল, তাই এখানে বহু প্রাচীন শহর আছে। **বাকু** (লোকসংখ্যা ৮ লক্ষের অধিক) এখানকার বৃহত্তম নগর। তৈল শোধনই এই নগরের প্রধান শিল্প। জর্জিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী **তিবলিসি** (লোকসংখ্যা ৫ লক্ষের অধিক) কুরা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে অনেক ছোট ছোট কলকারখানা আছে। অন্যান্য শহরের মধ্যে **অ্যারিভান, গ্রজনি** ও **মাইকপ** প্রধান।

(২) **পামীর ও তিয়েনসানের পার্বত্যভূমি**—পামীর মালভূমি সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্গত। উত্তর দিকে তিয়েনসান পর্বতের পশ্চিমাংশও সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চল পর্বতসঙ্কুল ও অত্যন্ত বন্ধুর। পামীর মালভূমির

গড় উচ্চতা ১২,০০০′। এই মালভূমিতে পরস্পর-সমান্তরাল অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় ও উপত্যকা আছে।

উচ্চতার জন্য এখানে শীতের প্রকোপ খুব বেশী। তাই এই অঞ্চলে বনভূমি নাই বলিলেও চলে। তৃণভূমিই অধিক। মেষপালকরা এই অঞ্চলে বাস করে। ইহারা যাযাবর; শীতকালে ইহারা মেষপাল·লইয়া নীচে নামিয়া আসে, আবার গ্রীষ্মকালে উচ্চভূমিতে চলিয়া যায়। এই অঞ্চলে, বিশেষতঃ পামীরে, অনেক গিরিপথ আছে। এই সকল গিরিপথ দিয়া তিব্বত, সিংকিয়াং, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানে যাতায়াতের পথ আছে। মধ্যযুগে বিখ্যাত ভূ-পর্যটক মার্কো পলো এই পথেই চীনদেশে গিয়াছিলেন। অনেকগুলি রাষ্ট্রের সীমা এখানে মিশিয়াছে, তাই ইহার সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী। এজন্য সোভিয়েট সরকার আজকাল এই অঞ্চলে রাস্তাঘাট তৈয়ারী করিতেছেন।

(৩) **আলতাই-সায়ান পার্বত্যভূমি**—পশ্চিম সাইবেরিয়ার কৃষিভূমির পূর্বাংশে আলতাই ও সায়ান পর্বতের পার্বত্যভূমি। ইহা মধ্য এশিয়ার ভঙ্গিল পর্বতমালার অংশ। বহু যুগব্যাপী ক্ষয়ীভবনের ফলে এই পার্বত্যভূমির উপরিভাগের বন্ধুরতা হ্রাস পাইয়াছে। এখানকার উচ্চতা ১০,০০০ ফুটের অধিক। পাহাড়গুলি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মঙ্গোলিয়ার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। ইরিতিস ও অব নদীর মধ্যভাগে আলতাই পর্বত, ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বেলুখা (১৫,১৫৪′)। সায়ান পর্বতের প্রধান অংশ বৈকাল হ্রদ হইতে ইনিসি পর্যন্ত বিস্তৃত, পূর্বাংশের সর্বাধিক উচ্চতা ১১,৪৪৭ ফুট। পর্বতের পার্শ্বদেশ নদী, বৃষ্টি, হিমবাহ প্রভৃতির ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে অত্যন্ত ভগ্ন, কোন কোন স্থানে গভীর খাত আছে।

এখানকার জলবায়ু চরম প্রকৃতির (গড় উত্তাপ জানুয়ারী – ৫° ফাঃ, জুলাই ৭০° ফাঃ)। পর্বতের পাদদেশে এবং উপত্যকায় বারিপাত কম (১০″), কিন্তু উপরিভাগে বৃষ্টিপাত বেশী (৫০″) হয়।

পর্বতের নিম্নাংশে (৩০০০′ উচ্চতা পর্যন্ত) স্তেপজাতীয় তৃণ এবং উচ্চাংশে (৬০০০′ উচ্চতা পর্যন্ত) লার্চ, সেডার, ফার, পাইন ও বার্চ বৃক্ষের বনভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর আবার (৯০০০′ পর্যন্ত) তৃণভূমি (Alpine meadows) আছে। ৯০০০ ফুটের অধিক উচ্চ অংশ চিরতুষারাবৃত থাকে।

এখানকার আদিম অধিবাসীরা পশুপাল লইয়া যাযাবরের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। সোভিয়েট সরকারের প্রচেষ্টায় ইহারা এখন স্থায়ী ভাবে এক স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজকাল ইনিসি ও টম নদীর উপত্যকায় গম, আলু ও সূর্যমুখী ফুলের চাষ হইতেছে।

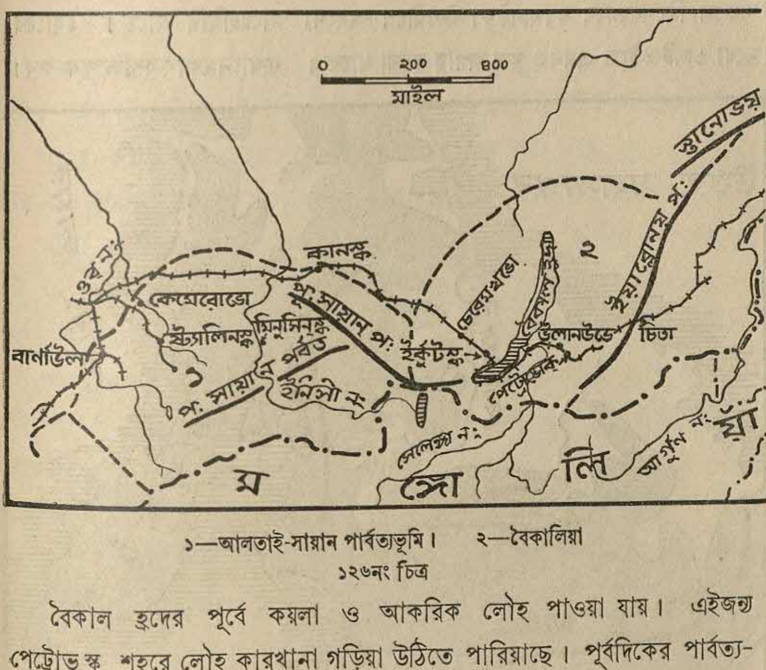
খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের জন্যই এই অঞ্চল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কয়লাই প্রধান খনিজ সম্পদ। এই কয়লা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এই অঞ্চলে প্রায় ৬৩৫,২৭০ মিলিয়ন টন কয়লা আছে। কুজ্‌নেৎজ্‌ উপত্যকা, মিনুসিনস্ক্‌ উপত্যকা, চুলিম-ইনিসি অঞ্চল, কানস্ক এবং চেরেমখভোই প্রধান কয়লা খনি অঞ্চল। একমাত্র কুজ্‌নেৎজ্‌ খনি হইতেই ১৯৫০ সালে প্রায় ৩২,০০০,০০০ টন কয়লা উঠান হয়। এই খনি হইতেই সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের এক-অষ্টমাংশ কয়লা পাওয়া যায়। কুজ্‌নেৎজ্‌ উপত্যকার চারিপাশে দস্তা, স্বর্ণ, সীসা ও লোহার খনি আছে। আলতাই পাহাড়ে বার্নাউলের দক্ষিণ-পূর্বে স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ও টিনের খনি আছে। এচিনস্কের নিকটে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ও আকরিক লৌহ থাকায় কুজ্‌নেৎজ্‌ অঞ্চলে বিরাট লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং ইহার উপর নির্ভরশীল অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এককালে যেখানে জনহীন তৃণভূমি ছিল আজ সেখানে বিরাট বিরাট কলকারখানা তৈয়ারী হইয়াছে। **ষ্ট্যালিনস্ক**ই এই অঞ্চলের সর্বপ্রধান শহর। অন্যান্য শহরের মধ্যে **কেমেরোভো** ও **প্রকোপিয়েভ্‌স্ক**এর নাম করা যাইতে পারে।

(৪) **বৈকালিয়া**—বৈকাল হ্রদের চতুষ্পার্শ্বের পার্বত্যভূমি ও পূর্বাংশের ভিটিম মালভূমি লইয়া এই অঞ্চল। ইহার দক্ষিণে ও পশ্চিমে সায়ান পর্বতমালা, পূর্বে ইয়াব্লোনয় ও ভিটিম মালভূমি। বৈকাল পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ (গভীরতা ৫৭১২′)। হ্রদটি প্রায় ৪০০ মাইল লম্বা। পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলি হ্রদের তীর হইতে প্রায় এক মাইল উঁচু। সেলেঙ্গা নদী দক্ষিণের মঙ্গোলিয়ার পার্বত্যভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া বৈকাল হ্রদে পড়িয়াছে। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ তীর ঘুরিয়া গিয়াছে।

জলবায়ু শীতপ্রধান। শীতকালে তিন চারি মাস এই অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে, তবে হ্রদের তীরে শীত গ্রীষ্ম দুইই অপেক্ষাকৃত কম।

এই অঞ্চলে পাইন বৃক্ষের বনভূমিই বেশী। শুষ্ক অঞ্চলে তৃণভূমি দেখা যায়। এখানে বুরিয়াটদের বাস। ইহারা গো-পালন করে। বহু লোক আজকাল চাষ-আবাদও করিতেছে। এখানে গম ও বার্লি উৎপন্ন হয়। হ্রদে অনেক মাছ পাওয়া যায়। মাছ ধরার কাজেও বহু লোক নিযুক্ত আছে।



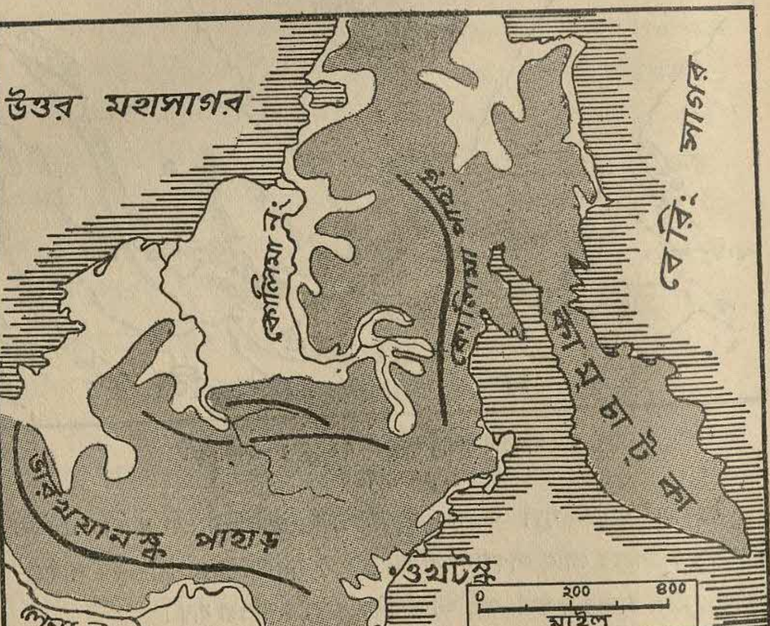
১—আলতাই-সায়ান পার্বত্যভূমি। ২—বৈকালিয়া
১২৬নং চিত্র

বৈকাল হ্রদের পূর্বে কয়লা ও আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। এইজন্য পেট্রোভ্‌স্ক্‌ শহরে লৌহ কারখানা গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। পূর্বদিকের পার্বত্য-ভূমিতে টিন, টাঙ্গষ্টেন, দস্তা, স্বর্ণ, আরসেনিক প্রভৃতি পাওয়া যায়।

ইর্কুটস্ক এই অঞ্চলের প্রধান শহর। বৈকালের তীর হইতে ৪৪ মাইল দূরে আঙ্গারা নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। লোকসংখ্যা আড়াই লক্ষের অধিক। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের উপর সেলেঙ্গা নদীর তীরে **উলানউডে** শহর। এখান হইতে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত একটি রেলপথ গিয়াছে। আরও কিছু পূর্বে রেলপথের উপর **চিতা** শহর। ইহার নিকটবর্তী কারিমস্ক হইতে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত রেলপথ গিয়াছে।

(৫) **উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার পার্বত্যভূমি**—এই পার্বত্যভূমি মধ্য এশিয়ার পর্বতমালারই সম্প্রসারণ। এই অঞ্চলের সকল স্থান সম্বন্ধে এখনও সঠিক

তথ্য জানা যায় নাই। ইহা পর্বতসঙ্কুল বন্ধুর দেশ, চলাচলের পথ বেশী নাই, তাছাড়া এখানে শীতের প্রকোপও সবচেয়ে বেশী। এখানেই পৃথিবীর শীতলতম স্থান ভারখোয়ানস্ক (জানুয়ারীর গড় উত্তাপ –৫৯° ফাঃ, জানুয়ারীর দৈনিক সর্বনিম্ন তাপ –৯০° ফাঃ) অবস্থিত। পাহাড়গুলির উচ্চতা ১২,০০০′-১৫,০০০′। এই অঞ্চলে বিশেষভাবে কামচাটকা উপদ্বীপে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি আছে। ইহাদের মধ্যে ১৯টি হইতে এখনও অগ্ন্যুদ্গার হইয়া থাকে। এখানে লোকবসতি খুব কম।



উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার পার্বত্যভূমি (পার্বত্যভূমি সেড করা হইয়াছে)
১২৭নং চিত্র

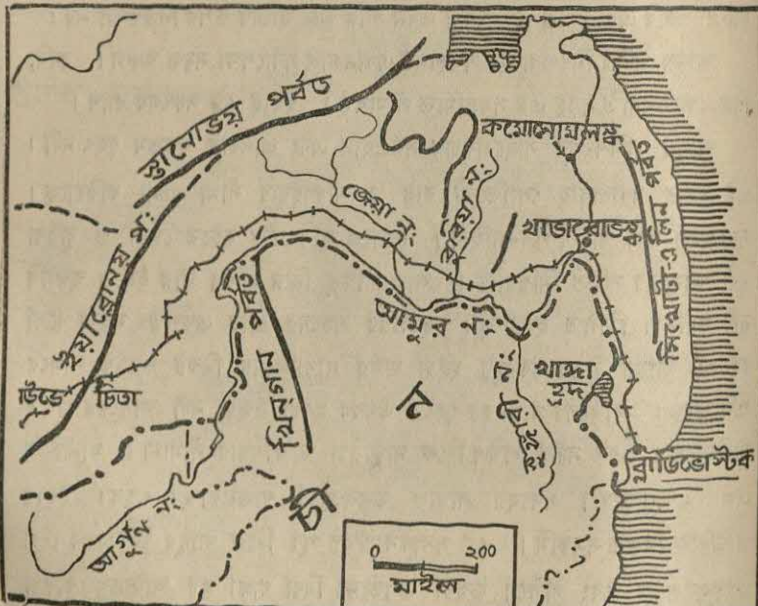
ওখটস্ক ও বেরিং সাগরের তীরেই লোকবসতি বেশী। সমুদ্রের মাছ ধরাই ইহাদের কাজ। সমুদ্রে স্যামন, কড্, হেরিং প্রভৃতি মাছ ধরা হয়। এইগুলি বিদেশে চালান যায়। ১৯২৯ সালে কলিমা উপত্যকার উর্ধ্বভাগে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাই উপকূল হইতে খনি অঞ্চল পর্যন্ত একটি মটর-পথ তৈয়ারী করা হইয়াছে।

(৬) **দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়া বা রাশিয়ার দূর প্রাচ্য অঞ্চল**—ইহা মাঞ্চুরিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি পার্বত্য অঞ্চল। কৃষি ও শিল্পে ইহা অনুন্নত ছিল; বসতিও ছিল এখানে খুব কম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই সোভিয়েট সরকার এই অঞ্চলের উন্নতি বিধানে মনোযোগী হন। সামরিক কারণই ছিল ইহার মূলে। সাম্রাজ্যবাদী জাপানের ভয়েই রুশ সরকার এই অঞ্চলকে কৃষি ও শিল্পে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। তাই এই অঞ্চলের আর্থিক অবস্থার অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। কৃষি এবং শিল্পে এই অঞ্চল এখন আর অন্য স্থানের উপর নির্ভরশীল নয়।

আমুর নদীর নিম্নপ্রবাহের সমভূমিই এখানকার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল। কৃষি, শিল্প, লোকবসতি সবই এই সমভূমিতে সীমাবদ্ধ। ইহাই এই অঞ্চলের প্রাণ।

আমুর দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়ার সর্বপ্রধান এবং এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ নদী। এই নদীর মধ্যপ্রবাহ সোভিয়েট রাষ্ট্র ও মাঞ্চুরিয়ার সীমা রচনা করিয়াছে। মধ্যভাগে ইহা দক্ষিণ-পূর্ব-বাহিনী। এখানে বাম তীর হইতে জেয়া ও বুরিয়া নদী আমুরের সহিত মিশিয়াছে। আরও কিছু নিম্নে দক্ষিণ তীর হইতে সুঙ্গারি নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সুঙ্গারির সঙ্গমের প্রায় একশত মাইল ঊর্ধ্ব হইতেই আমুর উত্তর-পূর্ব-মুখী হইয়া উত্তর সাখালিনের নিকট ওখটস্ক সাগরে পড়িতেছে। দক্ষিণের খাঙ্কা হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া উসুরী নদী আমুরের সহিত মিশিয়াছে। এই নদীই দক্ষিণ দিকে মাঞ্চুরিয়া ও রুশিয়ার সীমানা। মানচিত্রে দেখ আমুর-উসুরী সঙ্গমের সামান্য উত্তর-পূর্বে খাভারোভস্ক শহর। ইহার চারিদিকে বিস্তৃত সমভূমি। এই সমভূমি উত্তর-পূর্ব দিকে আমুর উপত্যকা দিয়া উপকূল পর্যন্ত এবং দক্ষিণে উসুরী উপত্যকা দিয়া খাঙ্কা হ্রদ অতিক্রম করিয়া ব্লাডিভোষ্টক পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সমভূমি পর্বতবেষ্টিত। পূর্বদিকে সিখোটা এলিন পর্বত, পশ্চিমে ছোট খিনগান ও বুরিয়া পর্বত। বুরিয়া পর্বতের পশ্চিমে বুরিয়া ও জেয়া উপত্যকার সমভূমি দুইটি সরু ফালির মত পার্বত্য ভূমির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। বুরিয়া ও জেয়া উপত্যকার মধ্যে তুরানা পর্বত। বৃহৎ খিনগান ও স্তানোভয় পর্বতকে এই অঞ্চলের পশ্চিম এবং উত্তর সীমা ধরা যাইতে পারে। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ উসুরী ও আমুর উপত্যকা দিয়া ব্লাডিভোষ্টক হইতে বৈকাল হ্রদের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

এই অঞ্চলে মহাদেশীয় চরম জলবায়ু বর্তমান। তবে জাপান সাগরের প্রভাবে জলবায়ু সর্বত্র অত্যধিক চরম হইতে পারে নাই। শীতকালে সাইবেরিয়ার শীতল ও শুষ্ক বায়ু বেগে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে তাই তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে নামিয়া যায়। গ্রীষ্মে প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৌসুমীর প্রভাবে তাপমাত্রা বেশী থাকে এবং বারিপাতও হয়। ব্লাডিভোষ্টকে বার্ষিক বারিপাতের পরিমাণ ২২"। পশ্চিম দিকে এবং পর্বতমধ্যবর্তী উপত্যকায় বারিপাত খুবই কম।



রাশিয়ার দূর প্রাচ্য অঞ্চল

১২৮নং চিত্র

আর্দ্র অঞ্চলে পাইন, স্প্রুস্, ফার, লার্চ প্রভৃতি মোচাকৃতি বৃক্ষ ও ওক প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষই অধিক। শুষ্ক উপত্যকায় তৃণভূমিই বেশী চোখে পড়ে।

ইরিতিশ নদীর পূর্বে এত সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চল সাইবেরিয়ায় আর নাই। এই শীতের দেশেও নিপুণ কোরিয়ান কৃষকেরা ধান্য উৎপাদন করিতেছে। এখানকার প্রধান ফসল গম, রাই, জই, বার্লি এবং বীট। শ্রমিকের অভাবই ছিল

এ অঞ্চলের প্রধান সমস্যা; কিন্তু সোভিয়েট সরকারের চেষ্টায় এবং কৃষি-ঋণ, খাজনা-মুকুব ইত্যাদি নানা সুবিধাজনক ব্যবস্থা থাকায় অন্যান্য অঞ্চল হইতে কৃষকেরা এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের পরিশ্রমের ফলেই এই অঞ্চল খাদ্য ও কৃষিসম্পদে আজ এত সমৃদ্ধ।

খনিজ সম্পদেও এ অঞ্চল হীন নহে। বুরিয়া অঞ্চলের কয়লা ও ছোট খিন-গানের আকরিক লৌহ হইতে **কমসোমোলস্ক** শহরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৩২ সালে এই শহরের পত্তন হয়, কিন্তু মাত্র সাত বৎসরের (অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের) মধ্যেই ইহার লোকসংখ্যা ৭০,০০০এ দাঁড়ায়। আমুরের তীরে ইহা অবস্থিত। এত বড় ইস্পাতের কারখানা দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়ার আর কোথাও নাই, এখানে জাহাজ নির্মাণের কারখানাও আছে। আমুর নদীর তীরে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের উপর **খাভারোভস্ক** শহর (লোকসংখ্যা দুই লক্ষের অধিক)। ইহা বাণিজ্যপ্রধান শহর ও রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র। দক্ষিণে সমুদ্রতীরে ব্লাডিভোষ্টক এই অঞ্চলের সর্বপ্রধান শহর ও একমাত্র বন্দর। লোকসংখ্যা প্রায় সোয়া দুই লক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে এই বন্দরের ব্যবসায়-বাণিজ্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শীতে বন্দরের মুখ জমিয়া যায়, তাই কৃত্রিম উপায়ে সারা বৎসর বন্দর-মুখকে বরফমুক্ত রাখা হয়। রাশিয়ার এই দূর প্রাচ্য অঞ্চলের সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িতেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় (সোভিয়েট) দ্বীপ

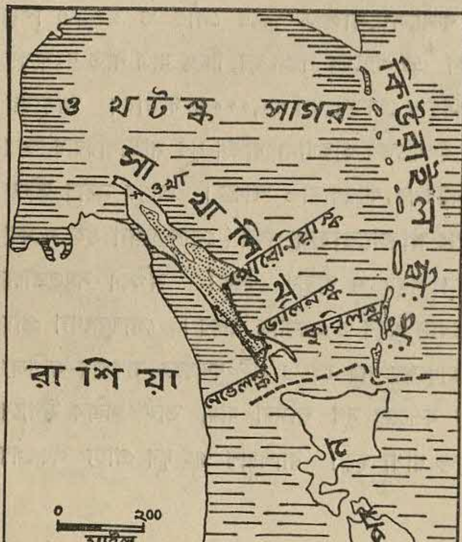
(১) **সাখালিন দ্বীপ**—এশিয়ার পূর্বে জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপের উত্তরে সাখালিন দ্বীপ। ইহার দক্ষিণার্ধ পূর্বে জাপানের অধীনে ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে সমগ্র দ্বীপটিই সোভিয়েট সরকারের অধীনে চলিয়া গিয়াছে।

দ্বীপটির পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুইটি পাহাড়। তাই সমভূমি অল্পপরিসর উপকূল ও পর্বতমধ্যবর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। ইহা শীতপ্রধান দেশ। প্রায় ছয়মাসই শীতঋতু। শীতকালে দেশটি বরফে আবৃত থাকে। অধিবাসীরা বরফের উপর দিয়া কুকুরের সাহায্যে স্লেজ গাড়ী চালাইয়া মালপত্র এক স্থান হইতে অন্য

স্থানে লইয়া যায়। গ্রীষ্মে তাপ বৃদ্ধি পায়, বরফও গলিয়া যায়। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয় (পরিমাণ প্রায় ২৫")।

পাহাড়ে স্প্রুস্, ফার, লার্চ, বার্চ ও উইলো বৃক্ষের বনভূমি আছে।

এখানে সমভূমি ও কর্ষণযোগ্য ভূমি কম, শীত অধিক ও দীর্ঘকালস্থায়ী—তাই খুব সামান্য কৃষিজ ফসল এখানে উৎপন্ন হয়। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে জই, পশুখাদ্য তৃণ, আলু ও মটরই প্রধান। জাপানী চাষীরা দক্ষিণভাগে সামান্য ধানের চাষও করিতেছে।



সাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ
১২৯নং চিত্র

কাষ্ঠ, মৎস্য, কয়লা এবং পেট্রোলিয়ামই এই দ্বীপের প্রধান সম্পদ। সমুদ্র হইতে কড্, হেরিং, স্যামন প্রভৃতি মাছ ধরা হয়। প্রচুর শুকনা মাছ ও মাছের তেল বিদেশে চালান দেওয়া হয়। বনভূমি হইতে কাষ্ঠ ও কাষ্ঠজাত মণ্ড প্রচুর রপ্তানী করা হয়। সিরেটরীতে জাপানীদের তৈরী একটি কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুতের বিরাট কারখানা আছে। এত বড় কাষ্ঠমণ্ডের কারখানা পূর্ব এশিয়াতে আর নাই। এই দ্বীপের উত্তরভাগে ওখা অঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের বৃহৎ খনি আছে। ইউরালের পূর্বাংশে এত বড় পেট্রোলিয়ামের খনি আর নাই।

(২) **কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ**—সাখালিন দ্বীপের পূর্বে হোক্কাইডোর উত্তর-পূর্ব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি দ্বীপ মালার মত কামচাটকা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এখানে ছোটবড় ৩২টি দ্বীপ আছে। ইহাদের অধিকাংশই আগ্নেয়গিরি হইতে

উৎপন্ন। জাপানীরা এই দ্বীপমালাকে 'চিশিমা' বা সহস্র দ্বীপ বলে, তবে বিদেশীদের নিকট ইহা কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ নামেই পরিচিত। দ্বীপগুলি অত্যন্ত বন্ধুর, সমভূমি ও কর্ষণযোগ্য ভূমি একেবারে নাই বলিলেও চলে। শীত এখানে তীব্র। সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগ হইতেই এখানে বরফ পড়িতে আরম্ভ করে এবং জুনমাসে বরফ পড়া বন্ধ হয়। গ্রীষ্ম অল্পকালস্থায়ী। তখনও ঘন কুয়াশায় দ্বীপগুলি ঢাকা থাকে। উষ্ণ কুরোসিও ও শীতল ওখটস্ক স্রোতের মিলনেই এই কুয়াশার সৃষ্টি হয়।

সমুদ্র উপকূলে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে জাপানী জেলেরা স্যামন, কড্ প্রভৃতি মাছ ও কাঁকড়া ধরার জন্য এখানে আসে। তা'ছাড়া শিকারীরা দ্বীপে ভালুক, শেয়াল প্রভৃতি লোমশ জন্তুও শিকার করে। ইহাদের লোম ও চামড়া বিদেশে চালান দেওয়া হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া

তুরস্ক—তুরস্ককে এশিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বলা হয়। ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর বৈচিত্র্যই এশিয়া মহাদেশের বিশেষত্ব। তুরস্ক ক্ষুদ্র দেশ হইলেও সেখানে জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতির বিভিন্নতা কম নয়।

এশিয়া মাইনরের মালভূমি, আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি এবং বসফরাস প্রণালীর অপর তীরে ইউরোপের সামান্য অংশ লইয়া তুরস্ক দেশ। মালভূমির উত্তরে ও দক্ষিণে উচ্চ পর্বত এবং পূর্বভাগে আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি। মালভূমি ক্রমশঃ মধ্যভাগের দিকে নীচু হইয়া গিয়াছে। ইহার গড় উচ্চতা প্রায় ২,৫০০ ফুট। মালভূমির উপরিভাগ সর্বত্র সমান নহে। কোথাও কোথাও পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ছোট ছোট পাহাড় আছে।

মালভূমির উত্তর দিকে পন্টিক পর্বতশ্রেণী অনেকগুলি পর্বত লইয়া গঠিত। এই পর্বতমালার সর্বোচ্চ শ্রেণী ৮,০০০-৯,০০০ ফুট উচ্চ। কৃষ্ণসাগরের তীরের সমভূমি অতি সঙ্কীর্ণ। মালভূমির দক্ষিণে টরাস পর্বতশ্রেণী। এখানেও অনেকগুলি পর্বত আছে। পর্বতগুলি গায়ে গায়ে লাগান। পশ্চিমাংশে ইহাদের উচ্চতা ১০,০০০-১১,০০০ ফুট। পর্বতগুলি ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। এই উপকূলেও

(১) **মর্মরা সাগরতীরের নিম্নভূমি**—এখানে জমি খুব উর্বর, তাই গম, বার্লি, ওট, জলপাই, তামাক, আঙ্গুর প্রচুর উৎপন্ন হয়, রেশমের জন্য এখানে গুটিপোকার চাষও হয়। বসফরাস প্রণালীর মুখে তুরস্কের অন্যতম প্রধান শহর **ইস্তাম্বুল** (ইউরোপীয় তুরস্ক) অবস্থিত। এখানে একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় আছে। লোকসংখ্যা ৮½ লক্ষের অধিক।

(২) **কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চল**—এখানে বাদাম ও তামাকের চাষই বেশী হয়। এরেগ্লি বন্দরের নিকটে কয়লা এবং কামডাগ অঞ্চলে আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। কারাবুকে বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা আছে।

(৩) **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল**—ইহা তুরস্কের সর্বপ্রধান কৃষি অঞ্চল। এখানে গম, বার্লি, তুলা, আঙ্গুর, ডুমুর, জলপাই ও তামাক প্রচুর উৎপন্ন হয়। আজকাল ধানের চাষও হইতেছে। পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত **ইজমির** (পূর্বনাম স্মার্না) এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বন্দর ও পোতাশ্রয় এবং তুরস্কের অন্যতম প্রধান নগর (লোকসংখ্যা ২,৪০,০০০)। এই বন্দর দিয়া ফল, সব্জীজাত দ্রব্য, কিস্‌মিস্‌, জলপাই, তামাক, গম, বার্লি, পশমীবস্ত্র, কার্পেট, চামড়া প্রভৃতি রপ্তানী হয়। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্র এবং যন্ত্রপাতিই প্রধান। শহরে সাবান ও স্পিরিটের কারখানা এবং কাপড়ের কল আছে। অন্যান্য শহরের মধ্যে আদানা ও আডালিয়ার নাম করা যাইতে পারে।

(৪) **আনাতোলিয়ার মালভূমি**—এখানে অনেক যাযাবর জাতি বাস করে। তাহারা গরু, ছাগল ও মেষ পালন করে। এই অঞ্চলের আঙ্গোরা মেষের পশম উৎকৃষ্ট। তুর্কীরা এই পশম হইতে বস্ত্র, কম্বল ও কার্পেট তৈয়ারী করিয়া বিদেশে চালান দেয়। মালভূমির উত্তরাংশে মধ্যভাগে তুরস্কের রাজধানী **আঙ্কারা** শহর (লোকসংখ্যা ২,৮৭,০০০; ১৯৫০ সালের গণনা) অবস্থিত। ইহাই এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে পশমী বস্ত্রের কল, অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারীর ও সিগারেটের কারখানা আছে।

(৫) **আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি**—এখানে ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর, শীত অধিক, তাই লোকবসতি খুব কম। আজকাল খনিজ দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এখানে খনিজ শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে।

ইরাণ বা পারস্য

তুরস্কের মত ইরাণও একটি পর্বতবেষ্টিত মালভূমি। আর্মেনিয়ার পর্বতগ্রন্থি হইতে উত্তর-পূর্বদিকে এলবুর্জ এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে জাগ্রোস পর্বত বাহির হইয়াছে। এই দুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে ইরাণের মালভূমি। এই মালভূমি, এলবুর্জ ও জাগ্রোস পর্বত, পারস্য উপসাগর ও কাস্পিয়ান হ্রদের উপকূল এবং মেসোপটেমিয়ার সমভূমির কিছু অংশ লইয়া পারস্য দেশ।

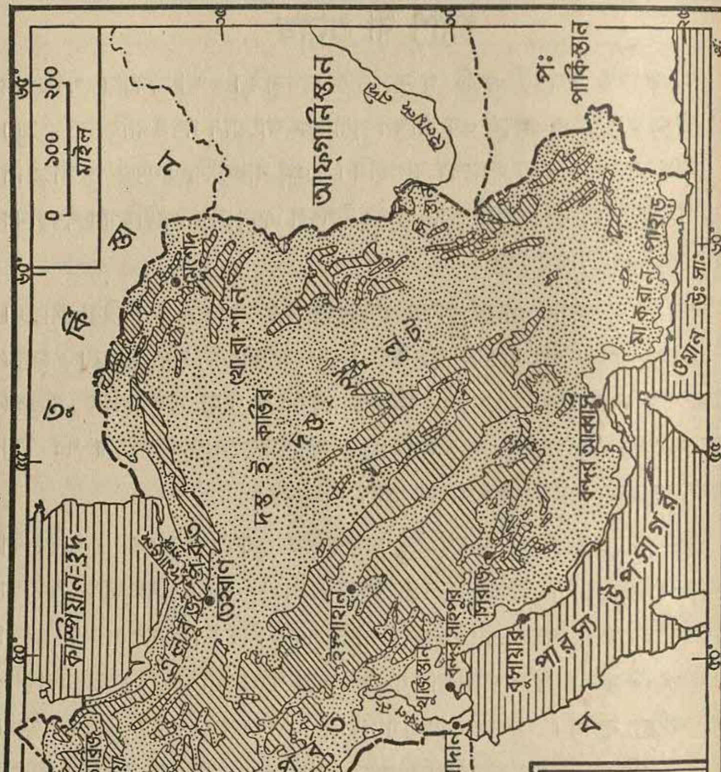
উত্তর দিকে দুর্লঙ্ঘ্য এলবুর্জ পর্বত প্রাচীরের মত মালভূমিকে ঘিরিয়া আছে। আট হাজার হইতে দশ হাজার ফুট উচ্চ ইহার অনেকগুলি শৃঙ্গ আছে। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ দেমাভেন্দ (১৮,৫৪৯ ফুট)। পূর্বদিকে ইহা খোরাশান পর্বতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আরও কিছুদূর পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ার পর ইহা আফগানিস্তানের উত্তরে হিন্দুকুশ নাম ধারণ করিয়াছে।

দক্ষিণ দিকে জাগ্রোস পর্বতমালায় অনেকগুলি সমান্তরাল পর্বত ও অধিত্যকা রহিয়াছে। এইসকল পর্বতের গড় উচ্চতা ৮,০০০ ফুট। জাগ্রোস পর্বতের পূর্বদিকে মাকরান পর্বত পাকিস্তানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। মাকরানের উচ্চতা ২০০০-৩০০০ ফুট। পর্বতগুলি প্রায় সমুদ্রের তীর পর্যন্ত আসিয়াছে; তাই উপকূল-ভাগ অতি সঙ্কীর্ণ। মধ্যভাগের মালভূমি ৩০০০-৫০০০ ফুট উচ্চ। ইহার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত অনেকগুলি পাহাড় আছে। পূর্বদিকে মালভূমি ক্রমশঃ নীচু হইয়া সিস্তানের নিম্নভূমিতে (২০০০′) মিশিয়াছে। ইরাণের অধিকাংশ স্থানেই নদীগুলি অন্তর্বাহিনী। পশ্চিমভাগে উরমিয়া হ্রদে অনেকগুলি নদী পতিত হইয়াছে।

পারস্যের জলবায়ু তুরস্কের মত চরম হইলেও কিছুটা পার্থক্য আছে। তাই ইহাকে 'ইরাণী জলবায়ু' বলা হয়। গ্রীষ্মকালে গরম খুব বেশী আবার শীতকালে শীতও অত্যধিক হয়।

শুষ্ক অঞ্চলে তৃণ ও কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়ই একমাত্র উদ্ভিজ্জ। কেবল জাগ্রোসের আর্দ্র অংশে ও এলবুর্জ পর্বতের বৃষ্টিবহুল অংশে বনভূমি দেখা যায়।

পারস্যে বৃষ্টিপাত কম বলিয়া কৃষিকার্যের অনেক অসুবিধা; জলসেচ ব্যতীত


পারস্য
৬০০০ ফুটের অধিক
১০০০' — ৬০০০'
০' — ১০০০'
মাইল
আফগানিস্তান
পঃ পাকিস্তান
কাস্পিয়ান হ্রদ
তেহারান
ইস্পাহান
সিরাজ
বুসায়ার
পারস্য উপসাগর
বন্দর আব্বাস
মাকরান পাহাড়
ওমান উঃ সাঃ
আবাদান
খুজিস্তান
বন্দর সাহপুর
তাব্রিজ
মেশেদ
খোরাসান
দস্ত-ই-কাভির
সিরিয়া

১৭১নং চিত্র

কৃষিকার্য অসম্ভব। গম, বার্লি ও রাই শীতকালের ফসল। গ্রীষ্মকালে মিলেট, ভুট্টা, তূলা ও ধানের চাষ হয়। ধান প্রধানতঃ কাস্পিয়ান হ্রদের উপকূলেই জন্মে। এছাড়া তামাক এবং আফিংএর চাষ প্রায় সর্বত্রই আছে। খুজিস্তানে অনেক খেজুর গাছ দেখা যায়।

পেট্রোলিয়ামই পারস্যের প্রধান খনিজ সম্পদ। জাগ্রোস পর্বতের পাদদেশে দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই তৈলখনিগুলি অবস্থিত। খনি অঞ্চল হইতে নলের সাহায্যে পারস্য উপসাগর তীরে তৈল প্রেরণ করা যায়। এখানে তৈল শোধন করা হয়, কিছু অংশ অপরিষ্কৃত অবস্থাতেই জাহাজে করিয়া বিদেশে চালান দেওয়া হয়। এই তৈলশিল্প হইতেই সরকার অনেক রাজস্ব পান। শাট্-এল্-আরবের তীরে আবাদান শহরে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম তৈল শোধনাগার আছে। এলবুর্জ পর্বতে কয়লা এবং পূর্বাঞ্চলের হ্রদ হইতে লবণ পাওয়া যায়।

পশম পারস্যের অন্যতম প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। এই পশম হইতে ইরাণীরা চমৎকার কার্পেট তৈয়ারী করে। পারস্যের কার্পেট জগদ্বিখ্যাত। পারস্যে রেলপথ ও মটর চলাচলের উপযোগী পথ খুব কম আছে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক অসুবিধা হয়।

এলবুর্জের পাদদেশে মালভূমিতে অবস্থিত **তেহেরাণ** পারস্যের রাজধানী ও সর্বপ্রধান শহর। এখানে কাচ, দিয়াশলাই, রাসায়নিক দ্রব্য ও ছোট অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারীর কারখানা আছে। **তাব্রিজ** (২,২০,০০০) উরমিয়া হ্রদ হইতে অল্পদূরে পশ্চিম পারস্যের সর্বপ্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। উত্তর-পূর্বদিকে **মেশেদ** খোরাসান প্রদেশের রাজধানী, বাণিজ্য কেন্দ্র এবং মুসলমানদের তীর্থস্থান। **ইস্পাহান** মধ্যভাগে অবস্থিত পারস্যের প্রাচীন রাজধানী ও শিক্ষাকেন্দ্র। **সিরাজ** শহর আতর ও গোলাপজলের জন্য বিখ্যাত। এখানে উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা মহাকবি হাফেজের জন্মস্থান। শাট্-এল্-আরবের তীরে **আবাদান** সর্ববৃহৎ তৈল-শোধন কেন্দ্র ও তৈল রপ্তানীর বন্দর। এখান হইতে বিভিন্ন দেশে বিমান চলাচল করে। **বুসায়ার, বন্দর আব্বাস** অন্যান্য প্রধান শহর।

আফগানিস্তান

হিন্দুকুশ পর্বত ও স্থলেমান-খিরথার পর্বতের মধ্যভাগে আফগানিস্তানের মালভূমি। ইহা অত্যন্ত বন্ধুর, পাহাড়ময়। কোহ-ই-বাবা পর্বত (১৭,০০০′) ইহাকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের সিস্তানের নিম্নভূমিতে হেলমন্দ নদী প্রবাহিত হইতেছে। উত্তরভাগের নদীগুলি আমুদরিয়ার উপত্যকার দিকে প্রবাহিত। পূর্বদিকে কাবুল নদী বাহির হইয়া সিন্ধু নদে মিশিয়াছে। এই কাবুল উপত্যকায় লোকবসতি ঘন।

আফগানিস্তানের জলবায়ু চরম। শীতকালে অত্যধিক শীত, গ্রীষ্মকালে গরমও বেশী হয়। বৃষ্টিপাত খুব কম। শীতকালেই বৃষ্টিপাত হয়।

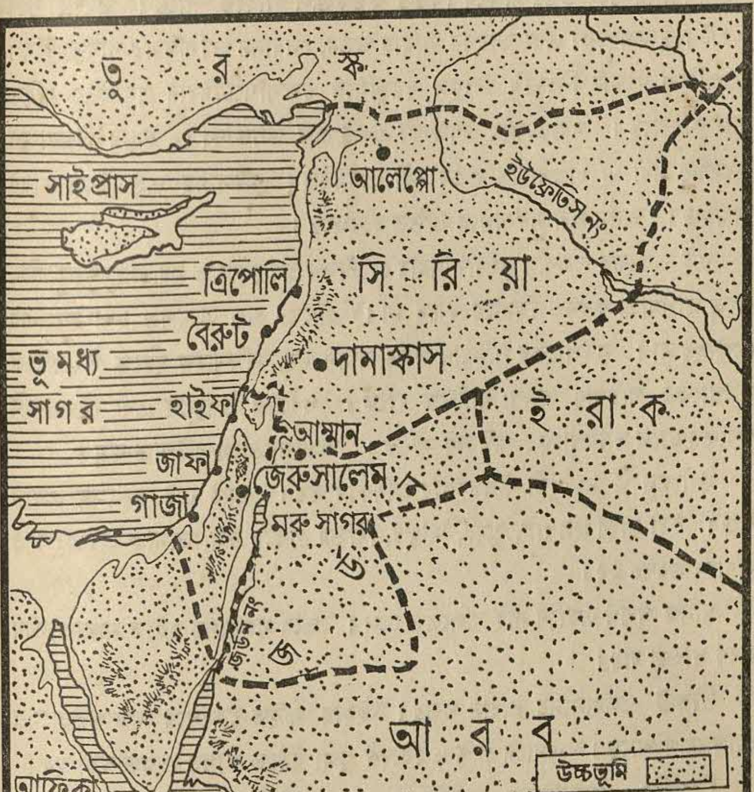
নদী উপত্যকায় এবং যেখানে জলসেচের স্থবিধা আছে তথায় গম, বার্লি, ধান, মিলেট, তামাক, ভুট্টা ও বীটের চাষ হয়। এছাড়া ফল ও সব্জীর চাষ প্রায় সর্বত্রই আছে।

পার্বত্য অঞ্চলে মেষ পালনই অধিবাসীদের একমাত্র উপজীবিকা। অধিকাংশ মেষপালকই যাযাবর। আফগানিস্তান হইতে প্রচুর মেষচর্ম ও পশম বিদেশে রপ্তানী হয়।

এই দেশে খনিজ সম্পদ অনেক আছে। তবে পরিবহন ব্যবস্থার অস্থবিধার জন্য খনির কাজ কোথাও বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। দেশে কোন রেলপথ নাই। কাবুল হইতে খাইবার গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া পাকিস্তানের পেশোয়ার পর্যন্ত একটি মটর-পথ আছে। এছাড়া কাবুল হইতে কান্দাহার, হিরাট ও মাজার-ই-শরীফ পর্যন্তও রাস্তা আছে।

কাবুল (লোকসংখ্যা ২ লক্ষ) ৭০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত আফগানিস্তানের রাজধানী ও সর্বপ্রধান শহর। এই শহরে কাপড়ের কল, সাবান, কাচ, দিয়াশলাই ও সিমেন্টের কারখানা আছে। উত্তর-পশ্চিম দিকে **হিরাট** ও দক্ষিণ দিকে **কান্দাহার** প্রধান শহর। অন্যান্য শহরের মধ্যে স্থলতান মামুদের রাজধানী **গজনী** ও মুসলমানদের তীর্থস্থান **মাজার-ই-শরীফের** নাম করা যাইতে পারে।

ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর অঞ্চল—ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে সিরিয়া, লেবানন, জর্ডন ও ইসরায়েল—এই চারিটি রাষ্ট্র লইয়া একটি ভৌগোলিক



ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর অঞ্চল
১৩২নং চিত্র

অঞ্চল ধরা যাইতে পারে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বাস, তবে আরবরাই প্রধান।

ভূমধ্যসাগরের তীরে একটি অল্প-পরিসর সমভূমি আছে। সমুদ্র হইতে প্রথমে অনেকগুলি বালিয়াড়ি দেখিতে পাইবে। উহার পশ্চাতেই এই উপকূল সমভূমি। এই সমভূমির পূর্বে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত কতকগুলি পাহাড় আছে। ইহার পূর্বে একটি নিম্ন উপত্যকা এবং তারপর আবার জর্ডন, লেবানন ও সিরিয়ার পার্বত্যভূমি। উত্তরদিকে একটি নিম্নভূমি উপকূল সমভূমিকে মেসোপটেমিয়ার সমভূমির সহিত যুক্ত করিয়াছে। মধ্যভাগের উপত্যকা একটি গ্রস্ত উপত্যকা। ইহার উত্তরাংশে ওরনটিস্ নদী ও দক্ষিণাংশে জর্ডন নদী প্রবাহিত। মরুসাগর এই উপত্যকায়ই অবস্থিত। জর্ডন নদী মরুসাগরে পতিত হইতেছে।

এই অঞ্চলের জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয়। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়, গ্রীষ্মকাল শুষ্ক, শীতে তাপমাত্রা কখনও হিমাঙ্কে নামে না। গ্রীষ্মের গড় উত্তাপও ৮০° ফাঃ-এর বেশী হয় না। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়, দক্ষিণদিক হইতে উত্তরদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। পর্বতের উপকূলে এবং নিকটবর্তী পর্বতের ঢালে বারিপাতের পরিমাণ অধিক। অভ্যন্তরভাগে বৃষ্টিপাত কম।

উপকূলে ও মধ্যবর্তী উপত্যকায় কৃষিকার্য হয়। গমই এই অঞ্চলের প্রধান শস্য। ইহা ছাড়া জলপাই, ডুমুর, আঙ্গুর, বিভিন্ন প্রকার ফল, তামাক এবং তুলাও এখানে উৎপন্ন হয়।

খনিজ পদার্থ এখানে নাই বলিলেও চলে। তবে মরুসাগর হইতে নানাজাতীয় লবণ পাওয়া যায়।

বীরুট—লেবাননের প্রধান বন্দর। ইহার সহিত রেলপথে অভ্যন্তরভাগের যোগাযোগ আছে। এখানে দেশী ও বিদেশী তুলা হইতে কাপড় প্রস্তুত করা হয়।

ত্রিপলি—পেট্রোলিয়াম রপ্তানীর বন্দর। খনি অঞ্চল হইতে পাইপ লাইন দ্বারা এখানে তেল পাঠান হয়।

আলেপ্পো—অন্যতম প্রধান বাণিজ্য স্থান। ইহা প্রাচীন বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত। এখান হইতে বিভিন্ন দিকে রেলপথ গিয়াছে। **দামাস্কাস** সিরিয়ার রাজধানী, অতি প্রাচীন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা রেশমী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত।

টেলআবিব ইস্রায়েলের রাজধানী ও একটি শিল্পপ্রধান শহর। **জাফা** ভূমধ্যসাগর তীরে অবস্থিত অন্যতম প্রধান বন্দর। হাইফা তৈল রপ্তানীর বন্দর।

ইরাকের তৈলখনি হইতে এই বন্দর পর্যন্ত পাইপ লাইন আছে। এখানে অনেক কলকারখানা আছে। **জেরুজালেম** যীশুখৃষ্টের লীলাভূমি বলিয়া ইহা খৃষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান। **গাজা** ইস্‌রায়েলের একটি বন্দর। **আম্মান** জর্ডনের রাজধানী।

মেসোপটেমিয়ার সমভূমি (ইরাক)

ইরাণের মালভূমি ও আরবের মরুভূমির মধ্যে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস বিধৌত মেসোপটেমিয়ার সমভূমি। এই সমভূমিতেই সুপ্রাচীনকালে ব্যাবিলনের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সমভূমির প্রায় সবটুকু বর্তমানে ইরাক দেশের অন্তর্গত। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী আনাতোলিয়ার মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া এই সমভূমির উপর দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহুদূর প্রবাহিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত প্রবাহ শাট্-এল্-আরব নামে পারস্য উপসাগরে পতিত হইতেছে। নিম্নাংশে উভয় নদীই স্বাভাবিক বাঁধ তৈয়ারী করায় নদীখাত পার্শ্ববর্তী ভূমি হইতে উঁচু হইয়া গিয়াছে। সমভূমির নিম্নাংশে অনেক জলাভূমি আছে।

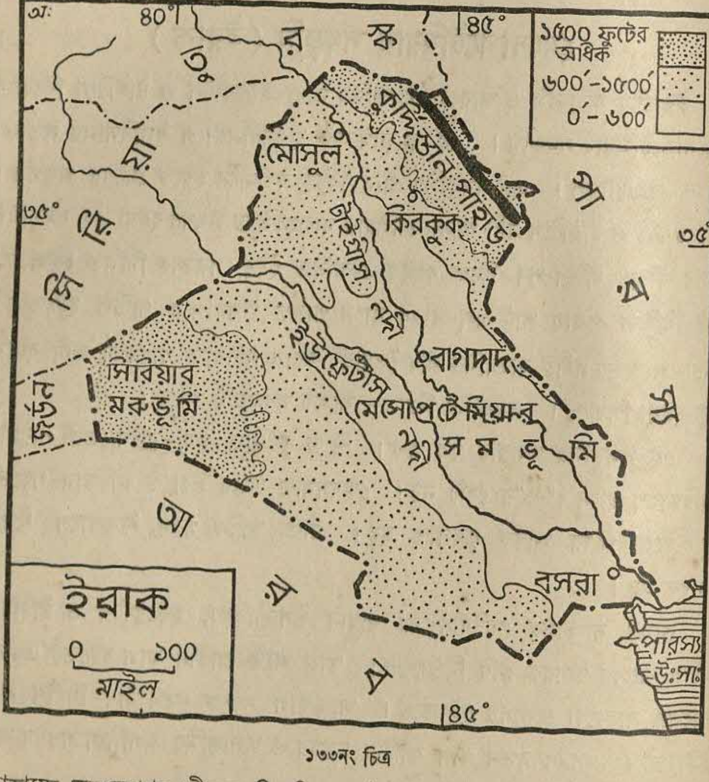
এই সমভূমির জলবায়ু খুব শুষ্ক। শীতে বৃষ্টিপাত হয়, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিকাংশ স্থানে ৫"-৬"র বেশী নয়। কেবলমাত্র উত্তর ইরাকে কুর্দিস্তান পর্বতের পাদদেশে ১৫"র অধিক বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মে অধিক গরম, শীতকালে শীতও অধিক হয়।

কৃষিই সমভূমির অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর জলের উপরই কৃষি নির্ভরশীল। তাই অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানে খালের সাহায্যে জলসেচ হইতেছে। আজকাল অনেক নূতন বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। অনেক নূতন খাল কাটিয়া চাষের ও জলাভূমির জলনিকাশের ব্যবস্থা করিয়া কৃষির উন্নতি করা হইয়াছে।

খেজুরই ইরাকের প্রধান ফসল। শাট্-এল্-আরবের দুই তীরে অসংখ্য খেজুর গাছ আছে। পৃথিবীর আর কোথাও এত খেজুর জন্মে না। এখান হইতেই সবচেয়ে বেশী খেজুর বিদেশে রপ্তানী হয়। উত্তর-পশ্চিমাংশে বার্লি ও গমের চাষ আছে। নিম্নাংশে ধান ও ভুট্টা জন্মে। কোথাও কোথাও তুলার চাষও দেখা

যায়। যেখানে জলসেচের সুবিধা নাই সেখানে মেষ পালনই অধিবাসীদের উপজীবিকা। এই সকল মেষ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়ামই ইরাকের একমাত্র খনিজ সম্পদ। কিরকুক, নাফট্‌খানে ও মোস্থলের নিকটে প্রচুর খনিজ তৈল আছে। এই অঞ্চল হইতে পাইপ লাইনের



১৩৩নং চিত্র

সাহায্যে ভূমধ্যসাগর তীরের ত্রিপলি ও হাইফা বন্দরে তৈল চালান করা হয় এবং সেখান হইতে জাহাজে এই তেল বিদেশে রপ্তানী করা হয়।

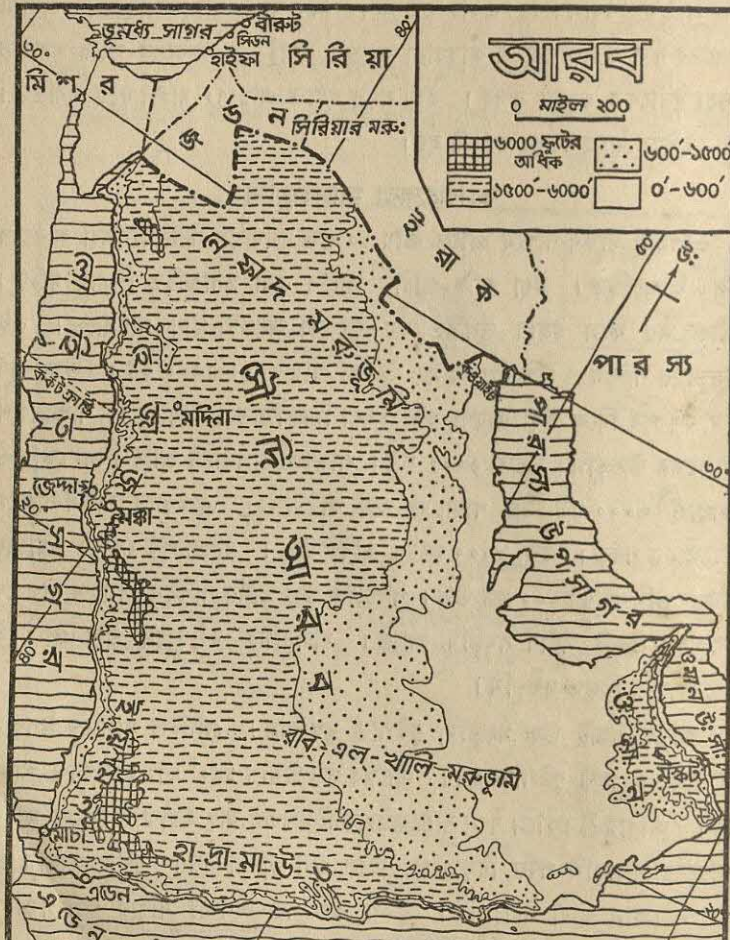
মোস্থল টাইগ্রিসের তীরে অবস্থিত প্রাচীন শহর। মেষচারণ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহা পশুচর্ম ও পশমের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সমভূমির মধ্যভাগে টাইগ্রিসের তীরে অবস্থিত **বাগদাদ** ইরাকের রাজধানী। ইহা

আন্তর্জাতিক বিমানপথের একটি স্টেশন। ইহা বৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানে কাপড়ের কল ও সিগারেটের কারখানা আছে। শাট্-এল্-আরবের তীরে অবস্থিত **বসরা** ইরাকের প্রধান বন্দর। ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখান হইতে প্রচুর খেজুর রপ্তানী হয়।

আরবের মালভূমি

এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ১০ লক্ষ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া আরবের মালভূমি অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলায় গঠিত। ক্ষয়ীভবনের ফলে ইহার উপরিভাগের বন্ধুরতা অনকটা হ্রাস পাইয়াছে। এই মালভূমির পশ্চিম ও দক্ষিণাংশের গড় উচ্চতা প্রায় ৩০০০-৪৫০০ ফুট। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইহা ক্রমশঃ ঢালু হইয়া নিম্নভূমিতে মিশিয়াছে। পশ্চিমাংশে হেজাজের উচ্চভূমির উচ্চতা ৫০০০ ফুট। লাভা ও গ্র্যানাইট আদি শিলা কোথাও কোথাও ৬০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের সৃষ্টি করিয়াছে। একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিমে ইয়েমেনের পর্বত। ইহা ৮০০০ ফুটের অধিক উচ্চ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ওমানের পার্বত্য ভূমি প্রায় ৯০০০ ফুট উচ্চ। পশ্চিমের উচ্চ ভূমির পশ্চিমে লোহিত সাগরের উপকূলে একটি সঙ্কীর্ণ সমভূমি আছে। মালভূমির মধ্যভাগে রাব-এল-খালি ও নেফাদের বিস্তৃত মরুভূমি।

আরব একটি উষ্ণ মরুভূমি, বৃষ্টিপাত খুব অল্প। লোহিত সাগরের উপকূলে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মের গড় উত্তাপ ১০০° ফাঃ অপেক্ষাও অধিক হয়। আবার শীতকালে যখন সাইবেরিয়ার হিমশীতল বায়ু ইরাক অতিক্রম করিয়া আরবের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তখন জল জমিয়া যায়। বৃষ্টির অল্পতার জন্য এখানে কোন স্থায়ী নদী নাই। বৃষ্টিপাতের পর অসংখ্য ধারায় জল গড়াইয়া যাইতে থাকে, তারপর উহা মাটির নীচে চলিয়া যায়। ভূ-অভ্যন্তরস্থ জল যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের খুব নিকটে থাকে সেই সকল স্থানে মরূদ্যান আছে। এই সকল মরূদ্যানেই বসতি দেখা যায়। অন্যত্র স্থায়ী বসতি নাই। এই স্থানে বেদুইন প্রভৃতি যাযাবর আরবরা পশুপাল লইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুযোগ পাইলে ইহারা ডাকাতি ও লুণ্ঠন করিতে দ্বিধা করে না। বরং এই ডাকাতিকেই ইহারা জীবিকা অর্জনের সহজ পথ বলিয়া মনে করে।



১৩৪নং চিত্র

কৃষিকার্য এদেশে খুব কমই হয়। মরূদ্যানগুলিতে গম, বার্লি, মিলেট, তামাক ও খেজুর জন্মে। ইয়েমেন অঞ্চলে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কফি

জন্মে। মোচা হইতে এই কফি রপ্তানী হয় বলিয়া ইহা মোচা কফি নামে পরিচিত।

বাহেরিণ দ্বীপে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের খনি আছে। বর্তমানে একটি আমেরিকান কোম্পানী খনি হইতে তৈল উঠাইতেছে। তৈল রপ্তানীর জন্য এখান হইতে ভূমধ্যসাগর তীরের সিডন পর্যন্ত নল বসান হইয়াছে। এই অঞ্চল হইতে প্রচুর তৈল বিদেশে রপ্তানী হয়।

জেদ্দা লোহিত সাগরের তীরে একটি বন্দর। এই বন্দর দিয়া লক্ষ লক্ষ যাত্রী মক্কা নগরীতে তীর্থ করিতে যায়। এই বন্দর হইতে ৪৫ মাইল দূরে হজরত মহম্মদের জন্মস্থান **মক্কা** নগরী অবস্থিত। ইহা মুসলমানদের সর্বপ্রধান তীর্থস্থান। পৃথিবীর সকল স্থান হইতে মুসলমানেরা এই শহরে তীর্থ করিতে আসে। মক্কার উত্তরে **মদিনা** শহর হজরত মহম্মদের সমাধি স্থান ও মুসলমানদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। লোহিত সাগরের প্রবেশপথের প্রায় একশত মাইল পূর্বে **এডেন** বন্দর ও উপদ্বীপ। এডেন ইংরাজদের অধীন। এই বন্দর হইতে জাহাজগুলি কয়লা বোঝাই করে। এডেনের সামরিক গুরুত্ব অত্যধিক।

মধ্য এশিয়ার পার্বত্য মালভূমি অঞ্চল

এশিয়ার মধ্যভাগে কতকগুলি পর্বত ও পর্বতবেষ্টিত উচ্চ মালভূমি রহিয়াছে। পামির হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে ধনুকের মত হিমালয় পর্বতশ্রেণী ভারতের উত্তর সীমা জুড়িয়া কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। হিমালয়ের উত্তরে পামির হইতে কারাকোরাম পর্বত বাহির হইয়াছে। পূর্বদিকে কিউনলুন পর্বত চীন দেশের সিন্‌লিংশান পাহাড় পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কিউনলুন হইতে উত্তর-পূর্বদিকে আলতিনতাঘ পর্বত বাহির হইয়াছে। আরও কিছু উত্তরে তিয়েনশান পর্বত। উত্তর দিকে আলতাই, খিনগান, ইয়াব্লোনয় ও স্তানোভয় পর্বত আছে। ইহারা পামির হইতে বাহির হয় নাই। এই পর্বতগুলির মধ্যে কতকগুলি উচ্চ ও নিম্ন মালভূমি আছে।

হিমালয় ও কিউনলুন পর্বতের মধ্যে তিব্বতের মালভূমি, কিউনলুন ও আলতিনতাঘের মধ্যে সাইডাম নিম্নভূমি। উত্তর দিকে আলতিনতাঘ ও তিয়েনশান

পর্বতশ্রেণীর মধ্যে তারিম উপত্যকা। গোবি উপত্যকা ও মরুভূমি আলতাই-ইয়াব্লোনয় পর্বতের দক্ষিণে এবং আলতিনতাঘ পর্বতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এই সকল অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

পামির মালভূমি—ইহা পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি (১২,০০০-১৪,০০০ ফুট), তাই ইহাকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয়। ইহা চীন, রাশিয়া এবং ভারত এই তিনটি রাষ্ট্রের মিলনস্থল। এই মালভূমির উপরিভাগ একেবারে সমতল নহে। এখানে কতকগুলি পরস্পর-সমান্তরাল পাহাড় ও উপত্যকা আছে। তাছাড়া অনেকগুলি গিরিপথ আছে। এই সকল গিরিপথ দিয়া প্রাচীনকালে চীন ও তিব্বতের সহিত তুরাণের বাণিজ্য চলিত। এখানে অত্যধিক শীত, তাই চাষ হয় না, লোকবসতি নাই বলিলেও চলে।

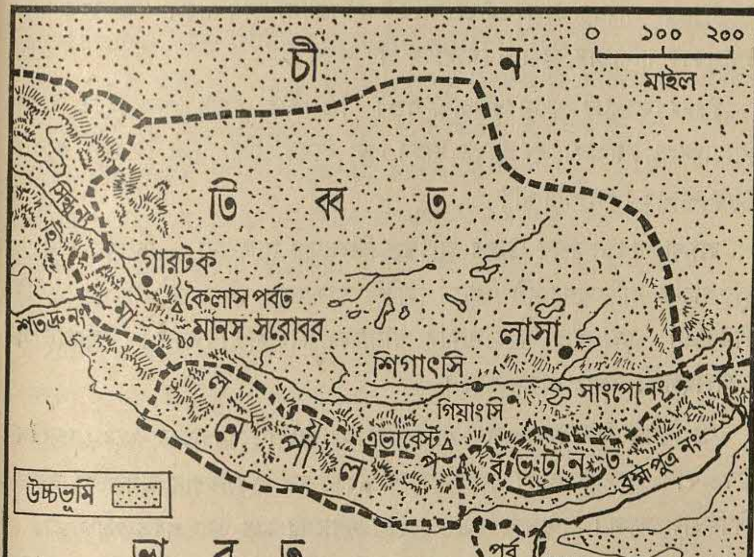
তিব্বতের মালভূমি ও সাইডাম নিম্নভূমি—তিব্বতের মালভূমি এবং সাইডামের নিম্ন জলাভূমি লইয়াই তিব্বত দেশ। হিমালয় ও কিউনলুন পর্বতের মধ্যে তিব্বতের মালভূমি ; ইহার অধিকাংশই ১২,০০০ ফুটের অধিক উচ্চ।

উত্তর তিব্বতের প্রায় অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া চ্যাংট্যাং মালভূমি (৮০° পূঃ-৯২° পূঃ এবং ৩১° উঃ-৩৬° উঃ)। ১৫০০ মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ৫০০ মাইল প্রশস্ত এই বিশাল মালভূমির গড় উচ্চতা ১৬,০০০ ফুটেরও অধিক। এখানে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কতকগুলি পাহাড় আছে। দক্ষিণ দিকেই বিখ্যাত কৈলাস পর্বত। ইহার গড় উচ্চতা হিমালয়ের মতই, তবে শৃঙ্গগুলি হিমালয়ের শৃঙ্গের মত তত উঁচু নয়। মালভূমির উপরে অনেকগুলি স্বাদু ও লবণজলের হ্রদ আছে। কোথাও কোথাও লবণ হ্রদ শুকাইয়া গিয়াছে। সেখানে পটাস, সোডা প্রভৃতি লবণ-জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। হ্রদগুলির মধ্যে টেংরিনরই বৃহত্তম, ইহার আয়তন প্রায় ১০০০ বর্গমাইল। অত্যধিক উচ্চতার জন্য এখানে শীত খুব বেশী। প্রায় আট মাস এ অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। তাই এখানে কোন শস্য জন্মে না। লোকবসতিও প্রায় নাই।

দক্ষিণ তিব্বতে মানস সরোবরের নিকটে ব্রহ্মপুত্র (সাংপো) ও সিন্ধুর উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের ঊর্ধ্বপ্রবাহ তিব্বতে সাংপো নামে অভিহিত হয়। ইহা পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিত এবং প্রায় ৪০০ মাইল পর্যন্ত নৌ-বাহনযোগ্য।

এই অঞ্চলের উচ্চতা ১২০০০ ফুট। এখানেই তিব্বতের অধিকাংশ লোক বাস করে। কৃষিকার্যও এখানে হয়। শহরগুলি সব এই অংশেই অবস্থিত।

তিব্বতের পূর্বভাগ হইতে ইয়াংসি, মেকং, ইরাবতী, সালুইন প্রভৃতি নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল নদী ও উহাদের উপনদীগুলি তিব্বতের পূর্বভাগের উচ্চ ভূমিতে গভীর নদীখাত ও উচ্চ পাহাড়ের সৃষ্টি করিয়াছে।



তিব্বত

১৩৫নং চিত্র

কিউনলুন ও আলতিনতাঘের মধ্যে সাইডামের নিম্নভূমি (৯০০০′), ইহার পূর্বে ককোনর হ্রদের নিম্নভূমি। ককোনর এই অঞ্চলের বৃহত্তম হ্রদ।

তিব্বতের পশ্চিমাংশে কারাকোরাম পর্বত ও উহার শাখাপ্রশাখা অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। কারাকোরামের শৃঙ্গ কে$_২$ (২৮,২৫০′) পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ।

তিব্বতের জলবায়ু মরুভূমির জলবায়ুর অনুরূপ। এখানে শুধু বার্ষিক তাপের প্রসরই অধিক নয় দৈনিক তাপের প্রসরও অত্যধিক। কোন কোন স্থানে দৈনিক তাপের প্রসর ৮০° ফাঃ পর্যন্ত হয়। গ্রীষ্মকালে তাপ ৯০° ফাঃ পর্যন্ত উঠে। আবার শীতে তাপ ৪০° ফাঃ পর্যন্ত নামিতেও শোনা গিয়াছে। শীতকালে প্রচণ্ড শীতল বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে। বৃষ্টিপাত খুম কম হয়।

শীতের আধিক্য হেতু এই দেশে বেশী কর্ষণযোগ্য ভূমি নাই। দক্ষিণের নদী-উপত্যকায় বার্লি, গম, ভুট্টা ও মিলেটের চাষ আছে।

ইয়াক তিব্বতের প্রধান ভারবাহী পশু। তিব্বতীরা ইহার লোম হইতে তাঁবুর আচ্ছাদন ও পোষাক, দুধ হইতে মাখন এবং চামড়া দিয়া জুতা তৈয়ারী করে। ইহার মাংসও তিব্বতীরা খায়।

লাসা সাংপো নদীর উত্তরে অবস্থিত তিব্বতের রাজধানী। ভারত, চীন ও তুর্কিস্তানের বাণিজ্যপথগুলি এখানে মিলিত হইয়াছে। ইহা বৌদ্ধদিগের একটি তীর্থস্থান। এখানকার দালাইলামার প্রাসাদের কারুকার্য বিখ্যাত। **সিগাট্‌সি** ও **গ্যাংগসী** অন্যান্য প্রধান শহর।

তারিম উপত্যকা—আলতিনতাঘ এবং তিয়েনশানের মধ্যে তারিম উপত্যকা। এই উপত্যকা এবং তিয়েনশানের উত্তরে জুঙ্গেরিয়ান উপত্যকা লইয়া সিংকিয়াং অঞ্চল। তিব্বতের উত্তরে তিয়েনশানের মত উচ্চ পর্বত আর নাই। ইহা এক হাজার মাইলেরও বেশী লম্বা। পশ্চিম দিকের উচ্চতা অধিক (খানটেংরি শৃঙ্গ—২৩,৬১৬′), পূর্ব দিকের উচ্চতা কম (বগডাওলা শৃঙ্গ—১৭,৭১২′)। তিয়েনশানের ভূ-প্রকৃতি অত্যন্ত বন্ধুর। উপরিভাগ চিরতুষারাবৃত। সেখান হইতে অনেক হিমবাহ নামিয়াছে। দক্ষিণদিকের আলতিনতাঘ তিয়েনশান অপেক্ষা কম উচ্চ (গড় উচ্চতা ১০,০০০ ফুট)। পশ্চিমদিকেও তারিম উপত্যকা পর্বতদ্বারা বেষ্টিত। এখানে কয়েকটি গিরিবর্ত্ম আছে। এই সকল গিরিবর্ত্ম দিয়াই অতীতে তারিম উপত্যকা হইতে সোভিয়েট তুর্কিস্তানে যাতায়াতের পথ ছিল। বিখ্যাত ভূপর্যটক মার্কোপলো এই পথেই চীন দেশে গিয়াছিলেন।

এই দুই পর্বতের মধ্যভাগে প্রায় ৫০০০-৬০০০ ফুট উঁচু তারিম উপত্যকা।

তারিম নদী এই উপত্যকা দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্বদিকে লবণর হ্রদে পড়িয়াছে। তারিম ও আলতিনতাঘের মধ্যে বিখ্যাত টাকলা-মাকান মরুভূমি।

এই অঞ্চল অত্যন্ত শুষ্ক, বারিপাত বৎসরে ৩"-৪"র বেশী হয় না। শীতকালে অত্যন্ত শীত, আবার গ্রীষ্মকালে বেশ গরম।

তিয়েনশান ও আলতিনতাঘের বরফ যখন গলিতে আরম্ভ করে তখন অসংখ্য জলপ্রবাহ তারিম উপত্যকার দিকে নামিয়া আসে। কিন্তু কোনটিই নদীর আকারে তারিম পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। শুষ্ক মরুতে পৌছামাত্রই জল শেষ হইয়া যায়। নদীগুলি পাহাড় হইতে যেখানে নিম্নভূমিতে নামিয়াছে, সেখানে অনেক মরূদ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই আলতিনতাঘ ও তিয়েনশানের পাদদেশে তারিম উপত্যকার পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত অনেকগুলি মরূদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে সেচের জল পাওয়া যায় তাই একমাত্র এই অঞ্চলেই কৃষিকার্য সম্ভব। এখানে গম, ভুট্টা, বার্লি, তূলা এবং কোন কোন স্থানে ধানও উৎপন্ন হয়।

এই দুইটি মরূদ্যান অঞ্চলের মধ্য দিয়াই প্রাচীন বাণিজ্যপথ ছিল। তাই এই অঞ্চলে অনেক প্রাচীন শহর আছে। দক্ষিণদিকে চাক্‌লিক, চার্‌চেন, খোটান, ইয়ারকন্দ ও কাশগড় এবং উত্তরদিকে টুরফান, কারাশাহী, কুচা, আক্‌সু প্রভৃতি শহর এখনও দেখিতে পাইবে।

এই সকল অঞ্চল ব্যতীত অন্য স্থানের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা পশুপালন। শুষ্ক মরু অঞ্চলে অল্পকালস্থায়ী তৃণ জন্মে। কাজাক প্রভৃতি যাযাবরেরা এই তৃণের সন্ধানে ছাগ ও মেষপাল লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। অধিবাসীদের অধিকাংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

উত্তরদিকে তিয়েনশান ও আলতাই পর্বতের মধ্যে জুঙ্গেরিয়ার নিম্ন ভূমি। ইহা তারিম উপত্যকা অপেক্ষা আর্দ্র। তিয়েনশানের উত্তরদিকের পাদভূমির মরূদ্যান অঞ্চলে কৃষিকার্য হয়। এখানে বারকল, মানস প্রভৃতি মরূদ্যান-শহর আছে। তিয়েনশান পর্বতের গিরিবর্ত্মের উপর অবস্থিত **উরুমচি** সিনকিয়াংএর রাজধানী।

গোবি মরু-অঞ্চল—পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে আলতাই ও সায়ান পর্বতমালা হইতে পূর্বদিকে খিনগান পর্বত পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। উত্তরে

বৈকালিয়া ও ইয়াব্লোনয় পর্বত এবং দক্ষিণে নানশান ও আলাশান পর্বতকে এই অঞ্চলের সীমা ধরা যাইতে পারে।

এই অঞ্চলের মধ্যভাগে গোবি বা শামো মরুভূমি। ইহা শীতল ও শুষ্ক মরুভূমি। ভূ-পৃষ্ঠ এখানে সমতল নয়। বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে এখানে অসংখ্য ক্ষুদ্রবৃহৎ গর্তের সৃষ্টি হইয়াছে। এইগুলিকে 'টালা' বলে।

এই অঞ্চলে শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী। শীতে তাপমাত্রা ৪০° ফাঃ-৫০° ফাঃ পর্যন্ত নামে। গ্রীষ্ম অতি অল্পকালস্থায়ী, তবে তাপ তখন বেশী হয়। বৃষ্টি অত্যন্ত কম, মরুভূমির দুই পার্শ্বে প্রায় ১২"র মত বৃষ্টিপাত হয়।

মধ্যভাগে বৃক্ষলতাহীন গোবি মরুভূমি। ইহার দুই পার্শ্বে তৃণভূমি আছে। এই সকল তৃণভূমিতে পশুপালন প্রধান জীবিকা। অধিবাসীরা যাযাবর, তাহারা ঘোড়া, উট ও গরুর পাল লইয়া তৃণের অন্বেষণে একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই অঞ্চলে কোন উল্লেখযোগ্য শহর নাই। উত্তরদিকে অপেক্ষাকৃত আর্দ্র স্থানে **উলানবেটর** শহর অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন শহর, মঙ্গোলিয়া সাধারণতন্ত্রের রাজধানী। এই শহর হইতে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেল লাইন পর্যন্ত রেলপথ আছে।

পূর্ব-এশিয়া

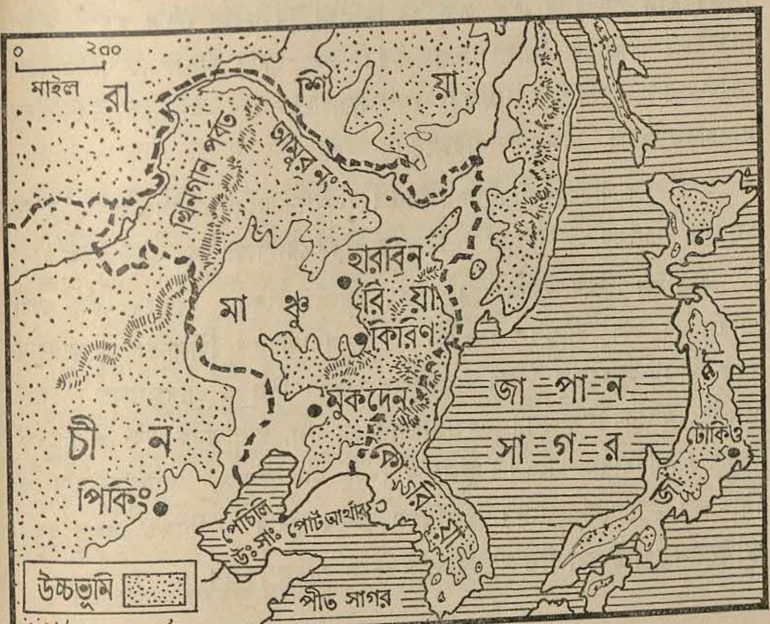
মাঞ্চুরিয়া

মাঞ্চু অধিবাসীদের নাম হইতে এই অঞ্চলের নাম মাঞ্চুরিয়া হইয়াছে। মাঞ্চু রাজবংশের রাজারা বহুদিন চীনদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। ইহা কিছুদিন জাপানের অধীনে ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের পর জাপানীরা এই অঞ্চলের কর্তৃত্ব হারাইয়াছে। বর্তমানে ইহা চীন সাধারণতন্ত্রের একটি অংশ।

মাঞ্চুরিয়ার মধ্যভাগ এক বৃহৎ সমভূমি। ইহা উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে পাহাড়ে ঘেরা। সমভূমির উত্তরাংশ প্রশস্ত, দক্ষিণ দিকে ইহা ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। উত্তরাংশে সুঙ্গারি ও উহার উপনদীগুলি প্রবাহিত। সুঙ্গারি উত্তর-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া আমুর নদীতে মিশিয়াছে। দক্ষিণাংশে লিয়াও হো এবং হুন হো নদী প্রবাহিত। এই সমভূমিই মাঞ্চুরিয়ার সর্বপ্রধান অংশ। ইহার

পশ্চিমদিকে বৃহৎ খিনগান পর্বত, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ক্ষুদ্র খিনগান পর্বত। পূর্বভাগের পার্বত্যভূমি আগ্নেয় শিলায় গঠিত। সুঙ্গারি নদী এই পার্বত্যভূমিকে ক্ষুদ্র খিনগান হইতে পৃথক করিয়াছে।

মাঞ্চুরিয়ার জলবায়ু শীতপ্রধান। শীতকালে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে হিমশীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এজন্য তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নামে। শীতকালে নদীগুলি জমিয়া যায়। গ্রীষ্মকাল অল্পকালস্থায়ী। মাত্র চারিমাস তাপমাত্রা



মাঞ্চুরিয়া
১৩৬নং চিত্র

শস্য-উৎপাদনের উপযোগী থাকে। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়। দক্ষিণ-পূর্বদিকে অধিক হয়। সমভূমিতে ২০"র মত বারিপাত হয়।

সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা খুব উর্বর। এখানে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ, সোয়াবিন, মিলেট, ভুট্টা ও গম প্রচুর উৎপন্ন হয়। সোয়াবিনই এখানকার প্রধান

ফসল। সোয়াবিন উৎপাদনে মাঞ্চুরিয়া পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। পশুপালন পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম পেশা। পশ্চিম দিকের পাহাড়ে মঙ্গোলীয়রা গরু, শূকর, মেষ ও ছাগল পালন করে। মেষলোম ও পশুচর্ম বিদেশে রপ্তানী হয়।

মাঞ্চুরিয়ায় খনিজ সম্পদ অনেক আছে। জাপানীরা এই দেশের খনিজ শিল্পের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছে। ফুসান অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। বিভিন্ন খনি হইতে বৎসরে প্রায় ১২ মিলিয়ন টন কয়লা উঠান হয়। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া মাঞ্চুরিয়ায় খনিজ তৈল (Shale-oil) ও স্বর্ণ পাওয়া যায়। জাপানীরা এই দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থারও অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছে।

মাঞ্চুরিয়ার পরিবহন ব্যবস্থা খুব উন্নত। এখানে অনেক রেলপথ ও মোটর-পথ আছে। দক্ষিণ দিকে মুকডেন ও উত্তরে হারবিন রেলপথের বৃহৎ দুইটি কেন্দ্র।

হারবিন একটি প্রচীন শহর ও বৃহৎ রেলওয়ে জংশন। এখানে আটা, ময়দা ও তেলের কল আছে। সমভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত **সিনকিং** মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী। **মুকডেন** দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার সর্ববৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা পাঁচটি রেলপথের মিলনস্থল। এখানে কাপড়ের কল, রাসায়নিক দ্রব্য ও সিমেণ্ট প্রস্তুতের কারখানা আছে। **ফুসানে** লৌহ ও ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম ও সিমেণ্টের কারখানা আছে। **কিরিনে** কৃত্রিম রবার ও সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়। **ডাইরেন-পোর্ট আর্থার** মাঞ্চুরিয়ার বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

খাস চীন

মধ্য এশিয়ার পর্বতবেষ্টিত মালভূমির পূর্বাংশে খাস চীন। ইহা পশ্চিমে তিব্বতের মালভূমি ও সিনকিয়াং হইতে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঞ্চুরিয়া, তিব্বত ও সিনকিয়াংএর ভৌগোলিক বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অঞ্চল চীনের রাষ্ট্রীয় সীমার অন্তর্ভুক্ত। খাস চীন চীন সাধারণতন্ত্রের একটি ভৌগোলিক অঞ্চল মাত্র।

উত্তর-পূর্ব চীনে একটি বিস্তৃত সমভূমি আছে। বাকী অংশ পার্বত্যভূমি।

হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ও সিকিয়াং নদী এই পার্বত্যভূমি ভেদ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পড়িয়াছে। ইহাদের নিম্নপ্রবাহে সমভূমি আছে। এই সকল সমভূমি ও উপত্যকা অঞ্চল ভিন্ন খাস চীনের আর কোথাও উল্লেখযোগ্য সমভূমি নাই। বাকী অংশ নাতিউচ্চ পর্বতময়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, লোকবসতি সব দিক হইতেই এই সমভূমি অত্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চল।

হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং তিব্বত মালভূমির উত্তরপূর্বাংশে এবং সিকিয়াং নদী ইউনান মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছে। হোয়াংহো নিম্নপ্রবাহে স্বাভাবিক বাঁধ তৈয়ারী করায় নদীখাত পার্শ্ববর্তী ভূমি হইতে উঁচু হইয়া গিয়াছে। এই নদী মধ্য এশিয়া হইতে পীতবর্ণের লোয়েস মৃত্তিকা লইয়া আসে বলিয়া নদীর জল পীতবর্ণ দেখায়। তাই ইহাকে পীত নদীও বলা হয়। ইহা অতীতে বহুবার গতি পরিবর্তন করিয়াছে এবং বন্যায় বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত করিয়া বহু ধনপ্রাণ নষ্ট করিয়াছে। তাই এই নদীকে চীনের দুঃখ বলা হয়। ইয়াংসিকিয়াং চীন দেশের প্রধান নদী। ইহা সাংহাইর নিকটে চীন সাগরে পড়িয়াছে। সিকিয়াং দক্ষিণ চীনের প্রধান নদী, ইহা হংকং-এর নিকট চীন সাগরে পতিত হইতেছে।

খনিজ সম্পদে এই অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভিন্ন আর কোথাও এত অধিক কয়লা নাই। এ ছাড়া এখানে লৌহ, তাম্র, টিন, টাঙ্গষ্টেন ও পেট্রোলিয়ামের খনি আছে। এত খনিজ পদার্থ থাকা সত্ত্বেও খনির কাজের খুব উন্নতি হয় নাই। এখন নূতন সরকারের প্রচেষ্টায় দ্রুত খনিজ শিল্পের উন্নতি হইতেছে।

চীন দেশের জলবায়ু সম্বন্ধে তোমরা দ্বিতীয় খণ্ডে কিছুটা জানিতে পারিয়াছ। শীতকালে চীনে এশিয়ার অভ্যন্তর ভাগ হইতে অত্যন্ত শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে সমগ্র উত্তরাংশে শীতকালের গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের নীচে থাকে। গ্রীষ্মকালে সমুদ্র হইতে আর্দ্র বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে গড় উষ্ণতা স্থলভাগের প্রায় সর্বত্র ৮০° ফাঃ-এর কাছাকাছি থাকে। উচ্চ ভূমিতে তাপ কিছুটা কম ও দক্ষিণাংশে কিছু বেশী হয়। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালে অধিক হয়। দক্ষিণ-পূর্বের পার্বত্য অংশে প্রায় ৭০" বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে বৃষ্টির পরিমাণ কমিতে থাকে। হোয়াংহো নদীর উত্তরে মাত্র ২০" বৃষ্টি হয়।

কৃষিই চীনের প্রধান সম্পদ। খাদ্যশস্য উৎপাদনে চীন স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানে ধান, গম, মিলেট, ইক্ষু, ভুট্টা, সোয়াবিন, চা, তূলা, শন ও তুঁতগাছের চাষ হয়। চা ও রেশম উৎপাদনে চীনদেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

পূর্বে চীনদেশ যান্ত্রিক শিল্পে খুবই অনুন্নত ছিল। তবে এখন দেশে নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ায় দিন দিন শিল্পের উন্নতি হইতেছে। এখানে কাপড়ের কল, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, আটাময়দার কল, তেলের কল ইত্যাদি আছে। শিল্পের মধ্যে রেশম শিল্পই প্রধান।

খাস চীনকে নিম্নলিখিত ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যাইতে পারে ; যেমন—

(১) **উত্তর-পশ্চিম ভাগের লোয়েস-মালভূমি**—মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চল হইতে বায়ু-তাড়িত অতি সূক্ষ্ম লোয়েস মৃত্তিকা এখানকার পার্বত্যভূমির উপর সঞ্চিত হইতে হইতে এই মালভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। এই লোয়েস মৃত্তিকার গভীরতা কোন কোন স্থানে ৩০০০ ফুটেরও অধিক। এখানে বারিপাত কম, তাই জলসেচের সাহায্যে চাষ করিতে হয়। এখানে মিলেট, গম, তূলা, তামাক, আফিং এবং ফলের চাষ হয়।

প্রাদেশিক রাজধানীগুলিই এখানকার প্রধান শহর। ইহাদের মধ্যে **তাই-ওয়ান, চ্যাংগান, ক্যাওলান** (ল্যাংচাও) ও **কালগান**ই প্রধান।

(২) **উত্তর চীনের বিস্তৃত সমভূমি**—হোয়াংহো নদীর পলিমাটিতে এই সমভূমি সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমভূমি অত্যন্ত উর্বর, তাই এখানে লোকবসতি খুব ঘন। এখানে ১,২৫,০০০ বর্গমাইলে প্রায় ৮ কোটি লোক বাস করে। হোয়াংহো নদী অগভীর বলিয়া নদীতে স্টীমার চলাচল করিতে পারে না।

এ অঞ্চলে শীত অত্যধিক। কখন কখন শীতকালের সর্বনিম্ন তাপ ০° ফাঃ পর্যন্ত নামে। আবার গ্রীষ্মের সর্বোচ্চ উত্তাপ ১০০° ফাঃ পর্যন্তও উঠে। বারিপাত সর্বত্র সমান নয়—দক্ষিণ দিকে ৩০", উত্তরাংশে ২০"।

এই সমভূমির আয়তনের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ কৃষিজমি। ফসলের মধ্যে গম, বার্লি, সোয়াবিন, মিলেট, ভুট্টা, তূলা এবং শনই প্রধান।

এই সমভূমি অঞ্চলের উত্তরভাগে চীনদেশের রাজধানী **পিপিং** (জনসংখ্যা ১৭ লক্ষ) নগর অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন শহর। এই অঞ্চলের রেলপথগুলি

এই নগরে মিলিত হইয়াছে। এই মহানগরীর মন্দির ও প্রাসাদগুলি চীনা শিল্প ও কারুকার্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দক্ষিণদিকে রেলপথগুলি **টিয়েন্টসিন** (জনসংখ্যা



১৩৭নং চিত্র

১৮ লক্ষ) নগরে মিলিত হইয়াছে। ইহা সমুদ্র হইতে ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা উত্তর চীনের সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর।

(৩) **সান্টুং উপদ্বীপ**—সান্টুং উপদ্বীপের প্রায় সবটুকুই উচ্চভূমি। ইহা অতি প্রাচীন শিলায় গঠিত। এই অঞ্চলে গুটি পোকার চাষ হয়। তাই এই উপদ্বীপে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হয়। উপকূলে কতকগুলি ভাল পোতাশ্রয় আছে। তন্মধ্যে **সিঙটাও** (৭½ লক্ষের অধিক) প্রধান। রেলপথে ইহার সহিত অভ্যন্তর-ভাগের যোগাযোগ আছে।

এই অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। অন্যান্য খনিজ সম্পদও অনেক আছে।

(৪) **লোহিত উপত্যকা** (Red Basin)—পশ্চিম দিকে সেজুয়ান প্রদেশের মধ্যভাগে লোহিত উপত্যকা অবস্থিত। ইহা চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা, অনেকটা আমাদের দেশের কাশ্মীর উপত্যকার মত। লোহিত বর্ণের বেলে পাথর হইতেই এই অঞ্চলের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহার উচ্চতা প্রায় ১০০০ ফুট। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া ইয়াংসিকিয়াং নদী প্রবাহিত। চারিদিকের পাহাড় হইতে অনেক নদী আসিয়া ইহাতে মিলিত হইয়াছে। ইয়াংসিকিয়াং পরে সঙ্কীর্ণ গিরিখাতের মধ্য দিয়া মধ্যচীনের পার্বত্যভূমি অতিক্রম করিয়া আইচ্যাংএর নিকটে সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। এই লোহিত উপত্যকার জলবায়ু অনেকটা উষ্ণ ও আর্দ্র। মৃত্তিকা খুব উর্বরা। ইহা কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল, তাই লোকবসতি খুব ঘন।

এখানে গম, ভুট্টা, মিলেট, ধান, ইক্ষু, আলু, চা, তূলা ও আফিং প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে রেশমও প্রচুর উৎপন্ন হয়। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে অনেক চাষের জমি আছে।

এখানে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এছাড়া আকরিক লৌহ, তাম্র এবং স্বর্ণও পাওয়া যায়।

চুংকিং (প্রায় ১০ লক্ষ) ইয়াংসির তীরে মোহানা হইতে প্রায় ১৪০০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা লোহিত উপত্যকার সর্বপ্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। **চেংটু** এই অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

(৫) **ইয়াংসি সমভূমি**—পশ্চিমে আইচ্যাং হইতে পূর্বে সাংহাই পর্যন্ত এই সমভূমির বিস্তৃতি। পূর্ব-পশ্চিমে ইহা ৬০০ মাইল লম্বা। ইহার পরিসর সর্বত্র

সমান নহে। কোথাও ইহা মাত্র ২০ মাইল, কোথাও বা ২০০ মাইল প্রশস্ত। এই সমভূমির আয়তন প্রায় ৭৫০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি।

এই সমভূমি ইয়াংসি নদীর পলিমাটি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। ইয়াংসি মোহানায় ব-দ্বীপ তৈয়ারী করিয়াছে। সমভূমি অতি ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ইহা চীনের সর্বপ্রধান নদী। এই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এই নদীপথেই চলে। মোহানা হইতে বহু দূর পর্যন্ত ইয়াংসি নৌ-বাহনযোগ্য। এই সমভূমিতে অনেক কৃত্রিম খাল থাকায় ইয়াংসির সহিত জলপথে সকল স্থানের যোগাযোগ সহজ হইয়াছে। চীনদেশের আর কোথাও এত খাল নাই।

এই সমভূমি অঞ্চলে উত্তর চীনের মত প্রচণ্ড শীত পড়ে না। শীতকালে গড় উত্তাপ ৪০° ফাঃ-র কাছাকাছি থাকে। গ্রীষ্মের গড় উত্তাপ ৮০° ফাঃ—৮৫° ফাঃ, বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মেই অধিক হয়। বাৎসরিক বারিপাতের পরিমাণ প্রায় ৪০" হইতে ৫০"।

এই সমভূমির জলবায়ু এবং মৃত্তিকা কৃষিকার্যের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। সমভূমির মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য হয়। ধানই এখানকার গ্রীষ্মকালের প্রধান ফসল। শীতকালের প্রধান ফসল গম ও বার্লি। এছাড়া এখানে প্রচুর তূলা ও রেশম উৎপন্ন হয়। চীনে উৎপন্ন মোট তূলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এখানে উৎপন্ন হয়।

এই সমভূমিতে ছোটবড় অনেক শহর আছে। এই সমভূমির ১২টি নগরের প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা ৫ লক্ষের অধিক। এক লক্ষাধিক লোকের নগরের সংখ্যাও বারোর কম হইবে না। এই সকল নগরের প্রত্যেকটির বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়। **সাংহাই** ইয়াংসির মোহানায় অবস্থিত চীনদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ও শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্র এবং এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম নগরী। চীনের বাণিজ্য-সম্ভারের প্রায় অর্ধেক এই বন্দর দিয়াই আমদানী-রপ্তানী হয়। এই বন্দর দিয়া প্রচুর রেশম (মোট রপ্তানীর ২/৩ অংশ) এবং চা (মোট রপ্তানীর অর্ধেক) রপ্তানী হয়। এখানে অসংখ্য কলকারখানা আছে। **নানকিং** ইয়াংসির তীরে অবস্থিত এই অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। ইহা অনেকগুলি রেলপথের কেন্দ্রস্থল ও বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। **হ্যাঙ্কো** ইয়াংসির তীরে একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র।

হ্যাংচৌ সাংহাইর দক্ষিণে একটি অগভীর সমুদ্রখাড়ির মুখে অবস্থিত। ইহা রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

(৬) **দক্ষিণ ও মধ্যচীনের পার্বত্য অঞ্চল**—উত্তর চীনের সমভূমির পশ্চিমে হোয়াংহো ও ইয়াংসির মধ্যবর্তী অংশ এবং দক্ষিণ চীনের ইয়াংসি সমভূমি ও সিকিয়াং উপত্যকার মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্বতময়। পার্বত্য নদীর অল্পপরিসর উপত্যকা ভিন্ন এখানে সমতল স্থান নাই। পাহাড়ের ঢালে ধাপে ধাপে জমি কাটিয়া চাষ করা হয়। ধান এবং চা এখানকার প্রধান ফসল।

এখানে অনেক খনিজ সম্পদ আছে। তন্মধ্যে কয়লা এবং লৌহই প্রধান।

(৭) **সিকিয়াং উপত্যকা**—সিকিয়াং দক্ষিণ চীনের অন্যতম প্রধান নদী। ইহা ক্যাণ্টনের নিকটে দক্ষিণ চীন সাগরে পড়িয়াছে। এই উপত্যকায় প্রচুর ধান্য জন্মে। এছাড়া ইক্ষু, তামাক, ভুট্টা, বাদাম, কমলালেবু এবং চা-ও উৎপন্ন হয়। গুটিপোকার চাষও এখানে আছে। সিকিয়াং নদী দিয়া ছোট ছোট জাহাজ মোহানা হইতে প্রায় ২০০ মাইল ভিতরে চলাচল করিতে পারে। **ক্যাণ্টন** (লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ) সিকিয়াংএর মোহানার নিকটে অবস্থিত দক্ষিণ চীনের অন্যতম প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

হংকং—ক্যাণ্টনের প্রায় ৯০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে হংকং দ্বীপ (উপকূলের কৌলুন সহ) বৃটিশের অধিকারভুক্ত। ইহা দূরপ্রাচ্যে বৃটিশের একটি প্রধান নৌঘাঁটি। ইহার ভূমি পর্বতময়, জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। রাজধানী **ভিক্টোরিয়া** (লোকসংখ্যা ১৮ লক্ষ) প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

(৮) **দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল**—হ্যাংচৌ হইতে ক্যাণ্টন পর্যন্ত সঙ্কীর্ণ উপকূল লইয়া এই অঞ্চল। ইহার পশ্চিমে দক্ষিণ চীনের পার্বত্যভূমি। তাই উপকূলের একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়ার একমাত্র পথ সমুদ্র। সমুদ্রের সঙ্গে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের তাই খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই জন্য এখানকার অধিবাসীরা সাহসী নাবিক হইতে পারিয়াছে। ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশে যে সকল চীনারা আছে তাহাদের অধিকাংশেরই আদি নিবাস এই উপকূল অঞ্চল। এখানে ধান, চা ও কমলালেবু প্রচুর জন্মে। **নিংপো, ফুচ্যাও, আময় ও সুয়াটো** এই অঞ্চলের প্রধান বন্দর ও শহর।

(৯) **ইউনান মালভূমি**—তিব্বতের দক্ষিণ-পূর্বে ইউনান মালভূমি। এই মালভূমির জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতি কৃষিকার্যের প্রতিকূল ; তাই এখানে লোকসংখ্যা খুব কম। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌রা অনুমান করেন যে এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদ আছে। তবে এখানে খনিজ শিল্প গড়িয়া উঠিতে এখনও অনেক দেরী আছে।

হাইনান দ্বীপ—চীনের দক্ষিণদিকে একটি অল্পপরিসর (১৫ মাইল চওড়া) প্রণালী হাইনান দ্বীপকে মূল ভূখণ্ড হইতে পৃথক করিয়াছে। ইহার আয়তন ১৪০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ। ইহার ভূমি পার্বত্য, জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। ধানই এই দ্বীপের প্রধান ফসল। বনজ সম্পদের মধ্যে কাষ্ঠ ও রবারই উল্লেখযোগ্য। এখানে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। প্রধান শহর **কিয়ুংচাও।**

ফরমোসা বা তাইওয়ান—কম্যুনিষ্টদের নিকট পরাজিত হইয়া কুওমিণ্টাং সরকার এখন এই দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছেন। ইহা জাতীয়তাবাদী চীনাদের অধীন। এই দ্বীপের পূর্বভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি স্তূপপর্বত আছে। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট মরিসস (১২,৯৫৬′), পাহাড়গুলি পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ নীচু হইয়া গিয়াছে। উপকূলে উর্বর সমভূমি আছে। এই দ্বীপের আয়তন প্রায় ১৪,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭৬ লক্ষ। সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে এই দ্বীপের জলবায়ু উষ্ণশীতোষ্ণ। সারা বৎসর বৃষ্টিপাত হয়, তবে গ্রীষ্মকালেই অধিক বৃষ্টি হয়। উপকূলে বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ৪০″, কিন্তু পর্বতের উপরিভাগে ১০০″র অধিক বৃষ্টি হয়।

ধান এবং চা এই দ্বীপের প্রধান ফসল। এছাড়া এখানে ইক্ষু, আলু ও কমলালেবু প্রচুর জন্মে। কর্পূর উৎপাদনের জন্য ফরমোসা বিখ্যাত। ঐ দ্বীপে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের খনি আছে। প্রধান শহর **তাইপেই** (লোকসংখ্যা ৪½ লক্ষ) ফরমোসার রাজধানী। **তাইনান** অন্যতম প্রধান শহর।

কোরিয়া

কোরিয়ার আয়তন ৮৫,০০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। উপদ্বীপের উত্তরভাগ উচ্চ মালভূমি। দক্ষিণে পূর্ব উপকূলের নিকটে উত্তর দক্ষিণে

বিস্তৃত একটি পাহাড় আছে। পাহাড়টি খুব খাড়াভাবে পূর্বদিকে নামিয়া গিয়াছে। পশ্চিম দিকের ঢাল কম। পশ্চিমে বিস্তৃত সমভূমি আছে।

কোরিয়ার জলবায়ু মাঞ্চুরিয়ার জলবায়ুর অনুরূপ; তবে সমুদ্রবায়ুর প্রভাবের জন্য বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী।

এখানকার মৃত্তিকা অনুর্বর, তাই ফসল খুব ভাল হয় না। ধানই প্রধান ফসল। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, বার্লি, সোয়াবিন, ভুট্টা, তামাক, তূলা ও মিলেট প্রধান। সমুদ্র উপকূলে মৎস্য ধরা হয়।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা ও লোহের নাম করা যাইতে পারে। শিল্প দ্রব্যের মধ্যে কাগজ, সিমেণ্ট এবং বস্ত্রই প্রধান।

সিউল দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী। **পাই-অং-যং** উত্তর কোরিয়ার রাজধানী। **ফুজান** দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত প্রধান বন্দর।

জাপান

হক্কাইডো, হনস্থ, সিকোকু, কিউসিউ—এই চারিটি বৃহৎ দ্বীপ ও নিকটবর্তী অনেকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া জাপান দেশ বা নিপ্পন। ইহাদের মধ্যে হনস্থ দ্বীপই বৃহত্তম।

জাপানে পার্বত্যভূমিই বেশী। এখানে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে। ইহাদের কতকগুলি এখনও সক্রিয়। জাপানে এত বেশী ভূমিকম্প হয় যে ইহাকে ভূমিকম্পের দেশও বলা হয়। টোকিওর পশ্চিমের সমভূমি (কুয়াণ্টো সমভূমি), নাগোয়া ও কোবে—ওসাকা অঞ্চলের সমভূমি ভিন্ন এদেশে আর কোনও উল্লেখযোগ্য সমভূমি নাই।

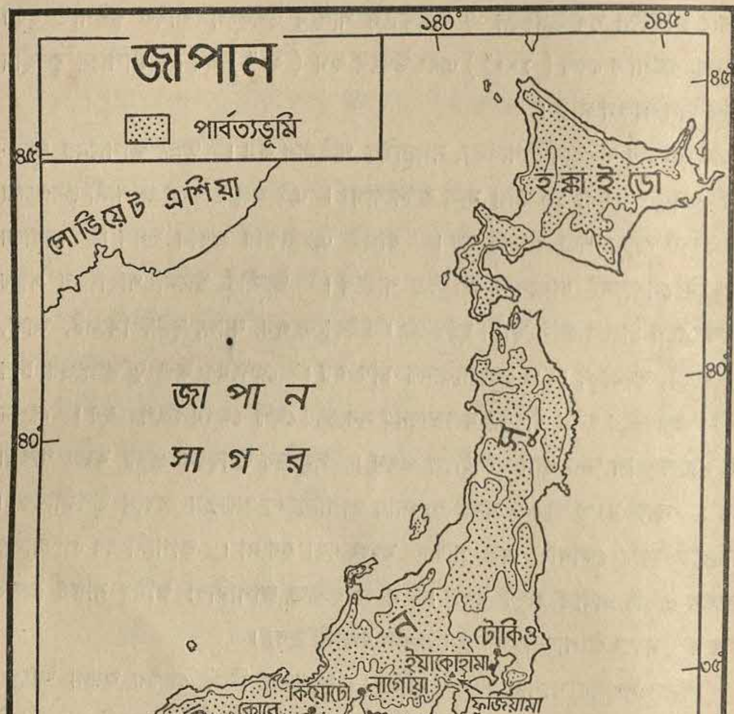
জাপানের জলবায়ুকে এক কথায় হিমশীতোষ্ণ মহাসাগরীয় জলবায়ু বলা যাইতে পারে। শীতকালে হক্কাইডো দ্বীপ এবং হনস্থর উত্তরাংশের গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের নীচে থাকে। দক্ষিণ দিকে তাপমাত্রা বাড়িতে থাকে। কিউসিউ দ্বীপের দক্ষিণাংশে জানুয়ারীর গড় উত্তাপ ৪৫° ফাঃ। গ্রীষ্মকালে কিউসিউর দক্ষিণের তাপমাত্রা ৮০° ফাঃ হয়। উত্তরে তাপ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। একেবারে হক্কাইডোর উত্তরে জুলাইয়ের গড় উত্তাপ ৬০° ফাঃ হয়। বৃষ্টিপাত বারমাসই হয়

তবে গ্রীষ্মকালে পূর্ব উপকূলে ও শীতকালে পশ্চিম উপকূলে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণে বৃষ্টিপাত বেশী (১০০") এবং উত্তরে কম (২০") হয়। জাপানে বৃষ্টিহীন শুষ্ক কোন অঞ্চল নাই।

জাপানের ভূ-প্রকৃতি পার্বত্য, সমভূমির পরিমাণ কম। তাই জাপানের ভূমি-পরিমাণের শতকরা ১৬ ভাগ মাত্র কর্ষণযোগ্য। এই অল্প স্থানেই জাপানী কৃষকদের কুশলতায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। ধানই এখানকার প্রধান ফসল। যেখানে সমভূমি সেখানেই ধানক্ষেত দেখিতে পাইবে। উঁচুনীচু স্থানে, পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চাষের জমি কাটা হইয়াছে। ইহাতে গম, বার্লি, ভুট্টা, মিলেট, আলু, শাকসব্জী, তামাক, চা ও সোয়াবিনের চাষ হয়। রেশমের জন্য তুঁতগাছের চাষ সর্বত্রই হয় তবে হনসু দ্বীপের মধ্যভাগেই সবচেয়ে বেশী রেশম উৎপন্ন হয়। রেশম রপ্তানীতে জাপানের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। সমুদ্রের উপকূলে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। তাই মৎস্য ধরা ও মৎস্য ব্যবসায় জাপানীদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। পৃথিবীর আর কোথাও এত অধিক মৎস্য ধরা হয় না। জাপানীদের প্রাত্যহিক খাদ্যের একটি প্রধান অংশ মৎস্য। মৎস্য হইতে জাপানীরা জমির সারও প্রস্তুত করে। মৎস্য জাপানের অন্যতম প্রধান রপ্তানী দ্রব্য।

খনিজ সম্পদে জাপান অত্যন্ত দরিদ্র। জাপানে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা আছে। কয়লাখনিগুলি উত্তর-পশ্চিম কিউসিউ ও দক্ষিণ হক্কাইডোতে অবস্থিত। প্রতি বৎসর যে পরিমাণ কয়লা উঠান হইতেছে তাহাতে অচিরেই সব কয়লা শেষ হইয়া যাইবে। আকরিক লৌহের পরিমাণ আরও কম। তাই জাপানকে কয়লা ও লৌহের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাম্রের খনিও আছে। দেশের প্রয়োজনীয় তামার সবই দেশে পাওয়া যায়। সামান্য পেট্রোলিয়ামও জাপানে উৎপন্ন হয়। কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জাপানে খুবই কম। পার্বত্যভূমির জন্য জাপানে খরস্রোতা নদী ও জলপ্রপাতের অভাব নাই। তাই জাপান প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের অভাব পূরণ করিয়াছে। এশিয়ার আর কোনও দেশে এত অধিক জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না।

বিগত এক শতাব্দীতে জাপান যেভাবে শিল্পের উন্নতি করিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখন জাপানকে বিদেশ হইতে শিল্পজাত কোন দ্রব্যই


জাপান
পার্বত্যভূমি
সোভিয়েট এশিয়া
হক্কাইডো
জাপান সাগর
টোকিও
ইয়াকোহামা
কিয়োটো
নাগোয়া
ফুজিয়ামা
কোবে
ওসাকা
হিরোশিমা
সিকোকু
নাগাসাকি
কিউসিউ
প্রশান্ত মহাসাগর
0 ১০০ ২০০
মাইল
১৪০°
১৪৫°
৪৫°
৪০°
৩৫°
৩০°
১৩০°
১৩৫°

১৩৮নং চিত্র

আমদানী করিতে হয় না। নিজের দেশের শিল্পের জন্য জাপান কাঁচামাল আমদানী করে, সেইগুলিই আবার শিল্পদ্রব্যের আকারে বিদেশে চালান দেয়। শিল্পে এত উন্নত দেশ এশিয়াতে আর নাই। শিল্প বিষয়ে এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানই পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সমকক্ষ। এখানে জাপানের শিল্পজাত দ্রব্যের নাম করা সম্ভব নয়। এইটুকু জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে জাপানে সবরকমের শিল্পই আছে। বিগত মহাযুদ্ধে জাপানের শিল্পবাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। তবে এতদিনে জাপান যুদ্ধের ক্ষতি অনেক পূরণ করিতে পারিয়াছে। এখন জাপানী দ্রব্য আবার বাজারে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে ; তবে জাপান পূর্বের মত শিল্পবাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ আছে।

জাপানের আয়তন ১৪১,৫২৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ। জাপানের প্রায় অর্ধেক লোক শিল্পের উপর নির্ভরশীল। বাকী অর্ধেকের জীবিকা কৃষি এবং মৎস্য ধরা ও মৎস্য ব্যবসায়।

হনসু দ্বীপের পূর্ব উপকূলে **টোকিও** (৬২'৭৭ লক্ষ) জাপানের রাজধানী ও পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নগরী। ইহা জাপানের অন্যতম প্রধান শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। টোকিওর ২০ মাইল দক্ষিণে **ইয়োকোহামা** (৯'৫১ লক্ষ)। ইহা জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ও রেশম রপ্তানীর বৃহত্তম কেন্দ্র। **কিয়োটো** (১১ লক্ষ) জাপানের অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্র। ইহা চীনামাটির বাসন প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত। **ওসাকা** (১৯'৫৬ লক্ষ) জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী, বন্দর ও বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। তাই ইহাকে 'জাপানের ম্যাঞ্চেষ্টার' বলা হয়। এখানে ইস্পাতের জিনিস, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, খেলনা, রবার ও চিনির কল আছে। **কোবে** (৭'৬৫ লক্ষ) ওসাকার পশ্চিমে অবস্থিত একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় এবং জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। এই বন্দর দিয়া কাঁচামালই বেশী আমদানী হয়। এখানে রবারের কারখানা ও রেশমের কল আছে। **নাগোয়া** (১০'৩ লক্ষ) জাপানের বিখ্যাত বন্দর। ইহা রেশম, বস্ত্র ও পশমের জন্য বিখ্যাত। চীনামাটির বাসন প্রস্তুতের কারখানাও এখানে আছে। **নাগাসাকি** (২'৪১ লক্ষ) কিউসিউ দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত জাপানের জাহাজ-নির্মাণ কেন্দ্র। **হিরোশিমা** (২'৫৮ লক্ষ) অন্যতম শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। বিগত মহাযুদ্ধের সময়

আমেরিকানরা আণবিক বোমা ফেলিয়া নাগাসাকি ও হিরোশিমা শহর দুইটিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। যুদ্ধের পর ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করিয়া আবার নূতন নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে। **হাকোডাটে** (২.২৯ লক্ষ) শিল্পপ্রধান শহর।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ ও নিকটবর্তী সমুদ্রের কতকগুলি দ্বীপ লইয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্রহ্মদেশ

আসামের পূর্বদিকের পার্বত্যভূমি ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে পৃথক করিয়াছে। এই পর্বতগুলি ভঙ্গিল পর্বত। ইহাদের উচ্চতা কোথাও ৫,০০০ ফুটের কম নয়। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত আরাকান ইয়োমা পাহাড় ব্রহ্মদেশের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। উত্তর দিকে ইহা আসামের দক্ষিণের পাহাড়ের সহিত সংযুক্ত। সেখানে ইহার উচ্চতা প্রায় ১০,০০০ ফুট, দক্ষিণে উহা ক্রমশঃ নীচু হইয়া গিয়াছে। একেবারে দক্ষিণে ইহা মাত্র ১০০০ ফুট উচ্চ। পশ্চিম দিকে উপকূলে সমভূমি আছে। আরাকান ইয়োমার পূর্বে ইরাবতী ও চিণ্ডুইন উপত্যকা। চিণ্ডুইন ও ইরাবতীর ঊর্ধ্ব প্রবাহের মধ্যবর্তী ভূমি পার্বত্য। ইরাবতী নদী মোহানায় বিশাল ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। ইরাবতী (নিম্নাংশ) উপত্যকাই ব্রহ্মদেশের সর্বপ্রধান অঞ্চল। ইরাবতীর পূর্বে সিতাং উপত্যকা। ইরাবতী ও সিতাংএর মধ্যভাগে অনুচ্চ পেগু ইয়োমো পাহাড়। আরও পূর্বে প্রাচীন শিলাগঠিত শান মালভূমি। ইহার ভূমি বন্ধুর। একেবারে দক্ষিণে টেনাসেরিমের পাহাড়। পাহাড়ের পশ্চিমে একটি সঙ্কীর্ণ উপকূল সমভূমি আছে।

এই দেশের জলবায়ু উষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলের জলবায়ুর অনুরূপ। শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রার প্রসর বেশী হয় না। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে বৃষ্টি হয় না। আরাকান উপকূল, ব-দ্বীপ অঞ্চল, টেনাসেরিম উপকূল ও উত্তরের পার্বত্যভূমিতে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে

বেশী (৮০"-র অধিক) হয়। মধ্যভাগে ইরাবতী উপত্যকার মধ্যাংশে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে কম (৪০"-র কম)। অবশিষ্ট অংশে ৪০" হইতে ৮০" বারিপাত হয়।

ব্রহ্মদেশের পার্বত্য অঞ্চল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। এই সকল অরণ্যভূমিতে বহু মূল্যবান বৃক্ষ আছে। তন্মধ্যে শাল ও সেগুনই প্রধান। এত উৎকৃষ্ট সেগুন কাষ্ঠ আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাই ইহার চাহিদা খুব বেশী। প্রতি বৎসর প্রায় ৩ লক্ষ টন ওজনের কাঠ কাটা হয়। হাতীর সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ গাছের গুঁড়ি একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রচুর কাঠ দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, চীন, জাপান ও ইউরোপে রপ্তানী হয়।

এই দেশ খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে বর্তমানে পেট্রোলিয়ামই প্রধান। মধ্য ব্রহ্মের খনি হইতে বৎসরে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন গ্যালন তৈল উঠান হয়। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে টিন, তাম্র, রৌপ্য, সীসা, দস্তা ও টাংষ্টেন প্রধান। চুনি, পান্না, নীলা প্রভৃতি মূল্যবান পাথরের জন্য পূর্বে ব্রহ্মদেশের খুব খ্যাতি ছিল। এখন এই সব পাথর খুব বেশী পাওয়া যায় না।



১৩৯নং চিত্র

কৃষিই ব্রহ্মবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। ধান্যই এই দেশের প্রধান ফসল। আরাকান ও টেনাসেরিম উপকূল এবং

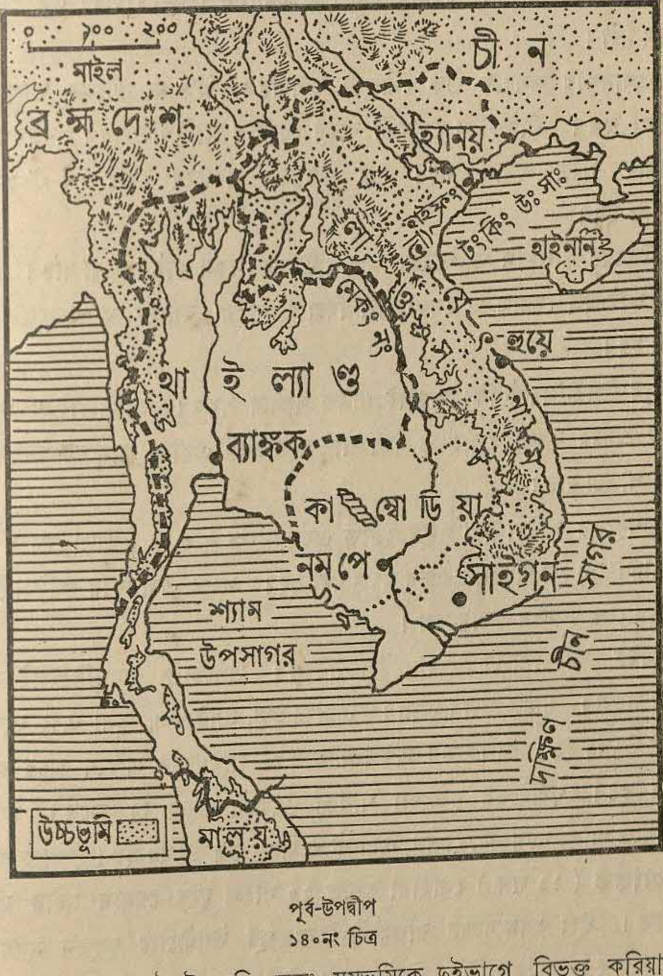
ইরাবতী উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ধান্যের প্রায় অর্ধেক বিদেশে রপ্তানী হয়। অন্যান্য ফসলের মধ্যে তৈলবীজ, তুলা, ভুট্টা এবং তামাকই প্রধান। দক্ষিণদিকে টেনাসেরিম অঞ্চলে আজকাল রবারের চাষ হইতেছে।

ব্রহ্মদেশের আয়তন ২৬১,৬১০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ। **রেঙ্গুন** (৬.১৩ লক্ষ) ইরাবতীর ব-দ্বীপে উহার একটি শাখার উপর অবস্থিত। ইহা ব্রহ্মদেশের রাজধানী এবং সর্বপ্রধান নগর ও বন্দর। ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এই বন্দর দিয়া কাঠ, চাউল ও খনিজ তৈল রপ্তানী হয়। এখানে চাউলের কল, দিয়াশলাইএর কারখানা, পেট্রোলিয়াম শোধনশিল্প ও কাষ্ঠ চেরাইএর কল আছে। এখানকার বৌদ্ধ মঠ ‘সোয়েডাগন প্যাগোডা’ বিখ্যাত। ইহা অষ্ট্রেলিয়া ও ইন্দোচীনগামী বিমানপথের একটি বড় ষ্টেশন। **বেসিন** ইরাবতীর তীরে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। **আকিয়াব** আরাকান উপকূলে অবস্থিত চাউল রপ্তানীর বন্দর। **মৌলমীন** (৭১,০০০) চাউল ও সেগুন কাঠ রপ্তানীর বন্দর। **মান্দালয়** (১,৬৩,০০০) দেশের মধ্যভাগে ইরাবতীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **ট্যাভয়** ও **মাগুই** টেনাসেরিম উপকূলে অবস্থিত বন্দর। ট্যাভয় হইতে টিন রপ্তানী হয়। **ভামো** উত্তর ব্রহ্মে ইরাবতীর তীরে অবস্থিত বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র।

পূর্ব-উপদ্বীপ

শ্যাম দেশ ও ইন্দোচীন লইয়া যে অঞ্চল উহাকে একত্রে পূর্ব উপদ্বীপ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই উপদ্বীপের উত্তরে ইউনানের উচ্চ মালভূমি এবং উত্তর-পূর্বে শান মালভূমি। উত্তরাংশে একটি অল্প-উচ্চ (২৫০০′-৩৫০০′) মালভূমি আছে। এই মালভূমি হইতে পূর্ব উপকূলের নিকট দিয়া একটি পাহাড় দক্ষিণ দিকে সাইগনের নিকট পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহার গড় উচ্চতা ৪০০০ ফুট। পশ্চিমদিকেও অনুরূপ একটি পাহাড় আছে। ইহা দক্ষিণদিকে টেনাসেরিমের পাহাড়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই দুই পাহাড়ের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি অল্প-পরিসর উচ্চ ভূমি আছে। এই উচ্চ ভূমির পশ্চিমদিকে মেনাম নদীর

সমভূমি এবং পূর্বদিকে মেকং নদীর সমভূমি। এই উচ্চভূমি হইতে (কোরাত শহরের দক্ষিণে) আর একটি উচ্চভূমি বাহির হইয়া পূর্বদিকে মেকং নদী পর্যন্ত



পূর্ব-উপদ্বীপ
১৪০নং চিত্র

চলিয়া গিয়াছে। এই উচ্চভূমি মেকং সমভূমিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরের অংশকে মধ্য-মেকং-সমভূমি ও দক্ষিণের অংশকে কাম্বোডিয়া-কোচিনচীনের সমভূমি বলা যাইতে পারে। উপরের মানচিত্রটি লক্ষ্য করিলে তোমরা ইহা

ভালভাবে বুঝিতে পারিবে। উত্তর-পূর্ব ভাগে লোহিত ও কৃষ্ণ নদী নিম্নপ্রবাহে মিলিত হইয়া টংকিংএর সমভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। এ ছাড়া পূর্ব উপকূলে একটি সঙ্কীর্ণ সমভূমিও আছে। মেনাম, মেকং ও লোহিত (Red river) এই অঞ্চলের প্রধান নদী।

এখানকার জলবায়ু উষ্ণ মৌসুমী জলবায়ু। শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রার পার্থক্য কম। গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বারিপাত হয়। বারিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। পূর্ব উপকূলে সবচেয়ে বেশী (৮০"-১২০") বৃষ্টিপাত হয়।

উত্তরের মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলে উৎকৃষ্ট সেগুন কাঠ পাওয়া যায়। বর্ষার সময় কাঠগুলি মেনাম ও মেকং নদী দিয়া ভাসাইয়া ব্যাঙ্কক ও প্নম্‌পেঁ পর্যন্ত আনা হয়।

পূর্ব উপদ্বীপের টংকিং অঞ্চলই খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। হ্যানয়-হাইফং অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা, লৌহ ও দস্তা পাওয়া যায়। এছাড়া হ্যানয়ের উত্তরদিকে টিনও পাওয়া যায়।

উপকূলের অধিবাসীরা সমুদ্র হইতে প্রচুর মৎস্য ধরে। এছাড়া তোঁলে সেপ (Tonle Sap) হ্রদ অঞ্চলেও প্রচুর মৎস্য ধরা হয়। মৎস্য এখানকার অধিবাসীদের নিত্য-খাদ্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

কৃষিই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। উপরোক্ত সমভূমিগুলিই কৃষি-প্রধান অঞ্চল। ধানই প্রধান ফসল। এছাড়া ইক্ষু, নারিকেল, তূলা এবং তামাক সর্বত্রই উৎপন্ন হয়। ব্যাঙ্ককের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও সাইগনের দক্ষিণে প্রচুর রবার উৎপন্ন হয়। পূর্বদিকের বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর চা জন্মে। টংকিং সমভূমিতে আলু, মটরশুটি, রেশম, এরারুট ও শন প্রচুর উৎপন্ন হয়।

ব্যাঙ্কক (১১ লক্ষ) মোহানা হইতে ২০ মাইল দূরে মেনাম নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা শ্যামদেশের রাজধানী এবং পূর্ব উপদ্বীপের বৃহত্তম নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। আন্তর্জাতিক বিমানপথের ইহা একটি বড় ষ্টেশন। এখানে সাবান, দিয়াশলাই, কাগজ ও চামড়ার কারখানা আছে। **সাইগন** মেকংএর ব-দ্বীপে উহার একটি শাখানদীর উপর অবস্থিত ইন্দোচীনের অন্যতম প্রধান বন্দর

ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে প্রচুর চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়। শহরে করাত কল, চাউলের কল, সাবান ও রংএর কারখানা আছে। **প্নম্পেঁ** (৩·৭৫ লক্ষ) কাম্বোডিয়ার রাজধানী ও অন্যতম প্রধান নগর। **হ্যানয়** টংকিংএর রাজধানী। **হাইফং** প্রসিদ্ধ বন্দর। **ভিয়েঁতিএঁ** লেয়সের রাজধানী। পূর্ব উপকূলে **হুয়ে** আন্নামের রাজধানী ও বন্দর।

মালয় উপদ্বীপ

ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব উপদ্বীপের দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপ। ক্রা যোজক ইহাকে ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশের সহিত যুক্ত করিয়াছে। উপদ্বীপটির মধ্যভাগ প্রশস্ত। উত্তর ও দক্ষিণে ইহা ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। মধ্যভাগে মালাক্কা হইতে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি পাহাড় (উচ্চতা ৩০০০′) আছে। ইহার পূর্ব ও পশ্চিমদিকে আরও কতকগুলি পাহাড় আছে। তাই উপকূলে প্রশস্ত সমভূমি নাই।

ইহা নিরক্ষীয় জলবায়ুর দেশ। সারা বৎসরই বৃষ্টিপাত হয়। উষ্ণতাও সারা বৎসর প্রায় একইরূপ থাকে। জানুয়ারী ও জুলাইএর তাপের প্রসর খুব কম।

খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানই প্রধান ফসল। এছাড়া নারিকেল, কলা, সুপারি, সাগু ও কমলা প্রচুর উৎপন্ন হয়। রবার উৎপাদনের জন্য মালয় বিখ্যাত। এত রবার আর কোথাও উৎপন্ন হয় না।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে টিনই প্রধান। এছাড়া লৌহ ও কয়লা সামান্য পাওয়া যায়। রবার ও টিন রপ্তানীর জন্য মালয় বিখ্যাত।

কুয়ালালামপুর মালয় ফেডারেশনের রাজধানী। **সিঙ্গাপুর** (১১ লক্ষ) মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণে একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর, পোতাশ্রয় ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে প্রচুর রবার ও টিন রপ্তানী হয়। ইহা আন্তর্জাতিক বিমানপথের একটি বিখ্যাত ষ্টেশন। ইহা প্রাচ্যে বৃটিশের একটি শ্রেষ্ঠ নৌঘাঁটি। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগপথে অবস্থিত বলিয়া ইহার সামরিক গুরুত্বও বেশী।

ফিলিপাইন সাধারণতন্ত্র

বোর্ণিওর উত্তর-পূর্বে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কতকগুলি দ্বীপ লইয়া ফিলিপাইন সাধারণতন্ত্র। এইগুলির মধ্যে উত্তরের লুজন ও দক্ষিণের মিণ্ডানাও দ্বীপই বৃহৎ। দ্বীপগুলির ভূমি পার্বত্য।

এখানকার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। কোথাও ৪০"র কম বারিপাত হয় না। ধান, ইক্ষু ও শন প্রধান ফসল। এ ছাড়া নারিকেল এবং ভুট্টাও প্রচুর জন্মে।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে স্বর্ণ, ক্রোমিয়াম, তাম্র ও কয়লা প্রধান।

ম্যানিলা (১২ লক্ষ) রাজধানী ও প্রধান বন্দর। শন ও চুরুট রপ্তানীর জন্য বিখ্যাত। কাগজ, চুরুট, শনের দড়ি তৈয়ারীর কারখানা শহরে আছে।

ইন্দোনেশিয়া*—জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও (¾ অংশ), সিলিবিস ও ছোট ছোট অনেকগুলি দ্বীপ লইয়া ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ত্র গঠিত। ইহার আয়তন ৫৭৫,৮৯৩ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। ধান, চা, ইক্ষু ও রবার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। **জাকার্তা** (২৫ লক্ষ) জাভা দ্বীপে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

বোর্ণিওর উত্তর-পশ্চিমাংশে **সারাওয়াক** বৃটিশ উপনিবেশভুক্ত রাজ্য। উত্তরাংশে **বৃটিশ বোর্ণিও** ইংরাজদের অধীন। এই দ্বীপে প্রচুর সাগু উৎপন্ন হয়।

দক্ষিণ এশিয়া

ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল দ্বীপ লইয়া দক্ষিণ এশিয়া। ভারত ও পাকিস্তানের বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে জানিতে পারিবে। নিম্নে সিংহল দ্বীপের ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া হইল।

সিংহল বা লঙ্কা দ্বীপ

ভারতের দক্ষিণে সিংহল বা লঙ্কা দ্বীপ। ইহার উত্তরভাগ সরু, দক্ষিণভাগ প্রশস্ত। অগভীর পক প্রণালী ইহাকে ভারত হইতে পৃথক করিয়াছে। সিংহলের দক্ষিণার্ধের মধ্যভাগের ভূমি পার্বত্য। ইহার উচ্চতম শৃঙ্গ পেড্রোটাল্লাগাল্লা

* মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়া ও নিকটবর্তী দ্বীপসমূহকে অষ্ট্রেলেশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তাই এখানে এইসকল দ্বীপের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল না।

(৮,২৯৫′)। জলবায়ু উষ্ণ। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম এই উভয় মৌসুমী বায়ু হইতেই এখানে বৃষ্টি হয়। তাই সারা বৎসরই এখানে বৃষ্টিপাত হয়। মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চলেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, চা, রবার, কফি, নারিকেল, লবঙ্গ ও দারুচিনি প্রধান।

সিংহলের আয়তন ২৫,৩৩২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৮১ লক্ষ। **কলম্বো** (৪·২৫ লক্ষ) সিংহলের রাজধানী, প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। ইহা আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথের একটি বড় ষ্টেশন। জাহাজগুলি এই বন্দর হইতে কয়লা লয়। **জাফনা, বাত্তিকালয়া, নেগম্বো** ও **গাল্লে** অন্যান্য প্রধান শহর।

তৃতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় ভাগ

ভারত (Bharat বা India)

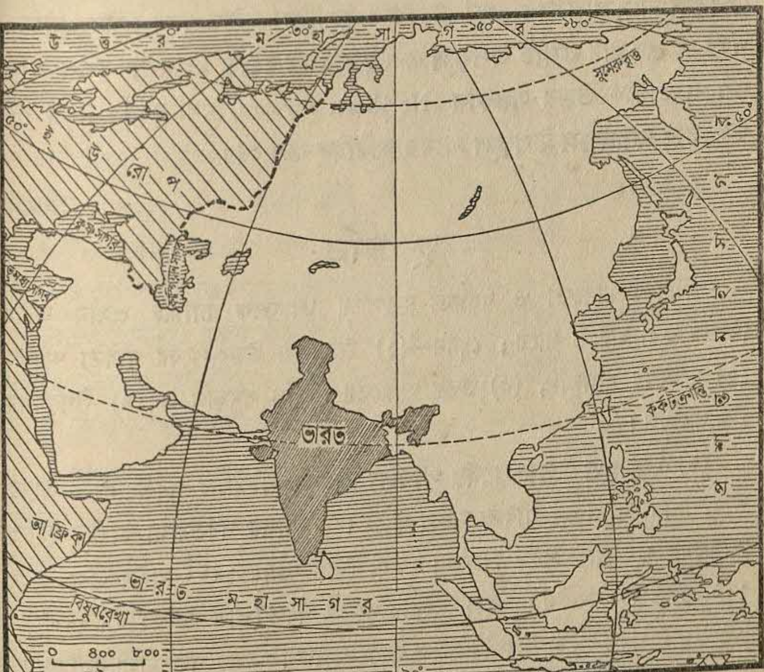
ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন সুসভ্য দেশ। ইহা বহুদিন বিদেশীদের পদানত ছিল। প্রায় দুই শতাব্দীকাল ইহা ইংরাজদের অধীনে ছিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ইহা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকেরা যে অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিতেন তাহা বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে বটে তবে ইহা ভারত ও পাকিস্তান—এই দুই রাষ্ট্রে খণ্ডিত হইয়াছে। ভারতের পশ্চিমাংশে মুসলমানপ্রধান অঞ্চল ও বঙ্গদেশের পূর্বভাগ লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। বাকী অংশ ভারত। ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী ভারত একটি সার্বভৌম গণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

এশিয়ার মত ভারতও একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। শিলা, ভূ-প্রকৃতি, জীব-জন্তু, উদ্ভিজ্জ, মানবগোষ্ঠী, লোকবসতি—সবকিছুরই চরম অবস্থা এদেশে দেখিতে পাইবে। একদিকে যেমন প্রাচীন শিলা-গঠিত দক্ষিণাপথের মালভূমি, অন্যদিকে তেমন নবীন শিলা-সৃষ্ট সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি আছে। এই দেশে অভ্রভেদী হিমালয় যেমন আছে তেমনি অল্প উচ্চ সমভূমি প্রান্তরেরও অভাব নাই। ভারতের একদিকে নিবিড় অরণ্য আছে অন্যদিকে বৃক্ষবিরল সীমাহীন প্রান্তরও আছে। এখানে বহুভাষাভাষী লোক, মানবগোষ্ঠীর বহু শাখা ও বহু ধর্মের লোক দেখিতে পাইবে। এখানে সুসভ্য অধিবাসীও যেমন অনেক আছে তেমনি অর্ধ-সভ্য ও অসভ্য জাতিরও অভাব নাই। পৃথিবীর যত কিছু বৈচিত্র্য সবই ভারতে আছে। তাই ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র পৃথিবী বলা হয়।

সীমা—কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত ভারতের সমগ্র উত্তরদিক ব্যাপিয়া অভ্রভেদী হিমালয় পর্বতমালা ইহার উত্তর সীমা রচনা করিয়াছে। হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী ভারতকে উত্তরের দেশগুলি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ইহা শুধু মনুষ্য চলাচলের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করে নাই। এই অত্যুচ্চ পর্বতমালা

অতিক্রম করিয়া বায়ুপ্রবাহও একদিক হইতে অন্যদিকে যাইতে পারে না। পশ্চিমদিকে পশ্চিম পাকিস্তান ও আরব সাগর। পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কোন স্বাভাবিক সীমারেখা নাই। ব্রহ্ম ও আসাম-সীমান্তের পর্বতমালা, পূর্ব পাকিস্তান ও বঙ্গোপসাগর ইহার পূর্ব সীমায় অবস্থিত। ভারত মহাসাগর ইহার দক্ষিণ সীমা।

অবস্থান ও আয়তন—এশিয়ার দক্ষিণে যে তিনটি উপদ্বীপ আছে তাহার মধ্যেরটি ভারত। ইহা দক্ষিণে প্রায় ৮° উঃ অক্ষরেখা (কুমারিকা অন্তরীপ)



ভারতের অবস্থান ও আয়তন
১৪১নং চিত্র

হইতে উত্তরে ৩৬½° উঃ অক্ষরেখা (কাশ্মীরের সর্বোত্তর অংশ) পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিমে ইহার বিস্তার ৬৮° পূঃ দেশান্তর হইতে ৯৭° পূঃ দেশান্তর পর্যন্ত। কর্কটক্রান্তি রেখা ভারতের প্রায় মধ্যভাগ দিয়া গিয়াছে।

ভারতের আয়তন* প্রায় ১১ লক্ষ ৩৯ হাজার বর্গমাইল। রাশিয়া বাদে সমগ্র ইউরোপ হইতে ভারত সামান্য ছোট। উত্তর-দক্ষিণে ইহার বৃহত্তম বিস্তার প্রায় ২০০০ মাইল। পূর্ব-পশ্চিমেও ইহার বৃহত্তম বিস্তার ২০০০ মাইল।

উপকূল—ভারতের উপকূল অভগ্ন। উপকূলে বেশী উপসাগর বা খাড়ি নাই। তাই আয়তনের তুলনায় তটরেখার দৈর্ঘ্য খুব কম—মাত্র ৪০০০ মাইল। বোম্বাই হইতে গোয়া পর্যন্ত পশ্চিম উপকূলের যে অংশ তাহা **কঙ্কণ উপকূল,** এবং গোয়া হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত পশ্চিম উপকূলের অবশিষ্ট অংশ **মালাবার উপকূল** নামে পরিচিত। পূর্ব উপকূলের কুমারিকা হইতে কৃষ্ণা নদীর মোহানা পর্যন্ত অংশের নাম **কর্ণাট উপকূল** এবং কৃষ্ণার মুখ হইতে মহানদীর বদ্বীপ পর্যন্ত উপকূল ভাগকে **উত্তর সরকার** (Northern Sircars) বলা হয়। সমগ্র পূর্ব উপকূলকে **করমণ্ডল উপকূল** নামেও অভিহিত করা হয়।

ভূ-প্রকৃতি

ভূমির উচ্চাবচতা ও বন্ধুরতা অনুসারে ভারতকে চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যেমন—(১) উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল, (২) দক্ষিণের মালভূমি, (৩) উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি ও (৪) উপকূলের নিম্ন সমভূমি।

(১) **উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল**—হিমালয় পর্বতমালা ও উহার শাখাপ্রশাখা লইয়া এই পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। হিমালয় পর্বতমালা কাশ্মীর হইতে আসামের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থে ১০০ হইতে ২০০ মাইল। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বত (গড় উচ্চতা ২০,০০০′)। অনেকগুলি পর্বত লইয়া হিমালয় গঠিত তাই ইহাকে হিমালয় পর্বতমালা বলা হয়।

উচ্চতা অনুসারে হিমালয় পর্বতমালাকে তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। সর্ব দক্ষিণে হিমালয়ের পাদদেশের পর্বতগুলিকে **অবহিমালয়** বলা যাইতে পারে। ইহার উচ্চতা ৩,০০০ ফুট হইতে ৫,৫০০ ফুট। কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত হিমালয়ের সম্পূর্ণ পাদদেশ ব্যাপিয়া অবহিমালয় অঞ্চল নাই।

* Vide Statesman's Year Book—1955, p. 143.

যেখানে দক্ষিণের সমভূমি হইতে হঠাৎ হিমালয়ের উচ্চ পর্বত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে সেখানে অবহিমালয় বলিয়া কোন অঞ্চল পাইবে না। পশ্চিম দিকেই অবহিমালয় অঞ্চল সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পশ্চিমাংশে ইহা **শিবালিক পাহাড়** নামে পরিচিত। অবহিমালয়ের উত্তরে **মধ্য হিমালয়** শ্রেণী (উচ্চতা ৬০০০′-১২,০০০′)। কাশ্মীর উপত্যকা মধ্য হিমালয় অঞ্চলেই অবস্থিত। এই অঞ্চল প্রায় ৫০ মাইল প্রশস্ত। ইহার পর হিমালয়ের তৃতীয় শ্রেণী। ইহাই সর্বোচ্চ শ্রেণী। ইহাকে **উচ্চ হিমালয়** (গড় উচ্চতা ১৬,০০০′-২০,০০০′) বলা যাইতে পারে। এই সকল পর্বতশ্রেণীর মধ্যে গভীর ও দীর্ঘ উপত্যকা আছে। হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলি এই উচ্চ হিমালয় শ্রেণীতেই অবস্থিত। ২২,০০০ ফুট অপেক্ষা উচ্চ ১০০টি ও ২৫,০০০ ফুট অপেক্ষা উচ্চ ৬টি শৃঙ্গ হিমালয়ে আছে। পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি যথাক্রমে—**নাঙ্গাপর্বত** (২৬,৬০০′), **নন্দাদেবী** (২৫,৬০০′), **ধবলগিরি** (২৬,৮০০′), **মাউন্ট এভারেষ্ট** (২৯,১৪১′), **গৌরীশঙ্কর** (২৩,৪৪০′) এবং **কাঞ্চনজঙ্ঘা** (২৮,২০০′)। উচ্চতায় এভারেষ্ট পৃথিবীতে প্রথম ও কাঞ্চনজঙ্ঘা তৃতীয়।

হিমালয় পর্বতমালায় কতকগুলি গিরিপথ আছে। এই সকল গিরিবর্ত্ম দিয়া হিমালয়ের উত্তরের স্থানগুলির সহিত ভারতের সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। গিরিপথের মধ্যে নিম্নোক্তগুলিই প্রধান।

(১) **জোজিলা** (শ্রীনগর, সোনমার্গ+লেহ্),* (২) **কারাকোরাম গিরিপথ** (লেহ্+খোটান), (৩) **বুর্জিল গিরিপথ** (শ্রীনগর+গিলগিট), (৪) **বড়া লাচা লা** (পাঞ্জাবের যোগীন্দ্রনগর+লেহ্), (৫) **শিপ্কি গিরিপথ** (সিমলা+মানস সরোবর), (৬) **জেলেপ লা** ও (৭) **নাথুলা** (গ্যাংটক+লাসা)।

হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত হইতে কতকগুলি পর্বত বাহির হইয়া ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চলের সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব দিকে **পাটকৈ, নাগা, বড়াইল, মণিপুরের পাহাড়** ও সর্ব দক্ষিণে **লুসাই** পাহাড় দেখিতে পাইবে। মণিপুরের

* এখানে যোগ (+) চিহ্নের অর্থ এই যে গিরিপথটি শ্রীনগর ও সোনমার্গ শহরের সহিত লেহ্ শহরের সংযোগ সাধন করিয়াছে।

পার্বত্যভূমির মধ্যভাগে সুদৃশ্য মণিপুর উপত্যকা অবস্থিত। বড়াইল পা হইতে পশ্চিমদিকে পর পর **জৈন্তিয়া, খাসিয়া** ও **গারো** পাহাড় বি হইয়াছে। এই সকল পাহাড়ের গড় উচ্চতা ৫০০০′ হইতে ৭০০০′। এ অঞ্চলে **টুজু, আন্** ও **টৌনগুপ** প্রভৃতি গিরিপথ দিয়া আসাম সীমান্ত হই ব্রহ্মদেশে যাওয়া যায়।

(২) **দক্ষিণের মালভূমি**—ভারতের প্রায় সমগ্র দক্ষিণাংশ জুড়িয়া এ বিশাল ত্রিভুজাকার মালভূমি আছে। ইহা অতি প্রাচীন আগ্নেয় ও রূপান্তরি শিলায় গঠিত। এই মালভূমির উত্তরভাগে **বিন্ধ্য পর্বত**। ইহার দক্ষি **সাতপুরা পাহাড়**। সাতপুরার পূর্বদিকে পর পর **মহাদেব** ও **মহাকা** পাহাড়, আরও কিছু পূর্বে ছোটনাগপুরের **পরেশনাথ** পাহাড় অবস্থিত। এই সকল পর্বতশ্রেণী দক্ষিণের মালভূমিকে দুইটি অংশে ভাগ করিয়াছে। উত্ত অংশকে বলা হয় **মধ্যভারতের মালভূমি**। ইহা আরাবল্লী হইতে পূর্বদিকে রাজমহলের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পশ্চিমাংশ **মালবের মালভূমি** এব পূর্বভাগ **ছোটনাগপুরের মালভূমি** নামে পরিচিত। উত্তরের এই মালভূমি উত্তরদিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গাঙ্গেয় সমভূমিতে মিশিয়াছে। মালভূমির গড় উচ্চতা ১৫০০ ফুট হইতে ২০০০ ফুট।

উপরোক্ত পাহাড়গুলির দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। ইহা ত্রিভুজাকার, দক্ষিণদিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া ইহা প্রায় কুমারিকা অন্তরীপে শেষ হইয়াছে। এই মালভূমির ঢাল পূর্ব দিকে। ইহার গড় উচ্চতা প্রায় ২০০০ ফুট। **পশ্চিমঘাট পর্বত** ইহার পশ্চিম সীমা। পশ্চিমঘাট প্রায় অর্ধমাইল উঁচু। পূর্বদিকে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ **পূর্বঘাট পর্বত**। ক্ষয়ীভবনের ফলে ইহা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই দুই পর্বত দক্ষিণে **নীলগিরি পর্বতে** মিলিত হইয়াছে। **ডোডাবেতা** (৮,৭৫০′) নীলগিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। নীলগিরির দক্ষিণে **আনা-মালাই** ও **পালনী** পাহাড়। **আনামুদি** (৮,৮৫০′) আনামালাই পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ইহাই দক্ষিণাপথের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। সর্ব দক্ষিণে **কার্ডামম্ পাহাড়**।

পশ্চিমে এইসকল পাহাড় থাকায় অভ্যন্তরভাগ হইতে পশ্চিম উপকূলে

যাতায়াতের অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছে। তবে কয়েকটি গিরিপথ এখানে আছে। এইগুলির মধ্য দিয়াই উপকূলের দিকে রেলপথ ও সড়ক গিয়াছে। গিরিপথগুলির মধ্যে নাসিকের নিকট **থলঘাট,** পুনার নিকট **ভোরঘাট** এবং নীলগিরির দক্ষিণে **পালঘাট** গিরিপথই প্রধান।

(৩) **উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি**—উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণের মালভূমির মধ্যভাগে উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থে ৯০ হইতে ২০০ মাইল। এই সমভূমি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ও ইহাদের উপনদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এই সমভূমির পশ্চিমভাগ দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। পূর্বভাগ ক্রমশঃ ঢালু হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। আরাবল্লী পর্বত ও উহার উত্তর-পূর্বের উচ্চভূমি ইহার জলবিভাজিকা, এই সমভূমি অঞ্চলে পলিমাটির স্তর অত্যন্ত গভীর, কোন কোন স্থানে এক হাজার ফুট মাটি খনন করিয়াও নিম্নের কঠিন শিলাস্তর পাওয়া যায় নাই। এত বিশাল ও ক্রমনিম্ন সমভূমি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। গঙ্গানদী মোহানা হইতে এক হাজার মাইল দূরেও সমুদ্রসমতল হইতে মাত্র ৫০০ ফুট উঁচু।

এই সমভূমির উত্তর-পশ্চিমাংশে থর মরু অঞ্চলের বিস্তীর্ণ সমভূমিও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির সহিত ইহার অনেক পার্থক্য আছে। গাঙ্গেয় সমভূমি পলিসৃষ্ট সঞ্চয়জাত ভূমি। কিন্তু থর মরুস্থলী ক্ষয়জাত সমভূমি।

(৪) **উপকূলের নিম্ন সমভূমি**—ভারতের উপকূলভাগে নিম্ন সমভূমি আছে। পশ্চিম উপকূলের সমভূমি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। কোন কোন স্থানে পশ্চিমঘাট পর্বত একেবারে সমুদ্রতট পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব উপকূলের সমভূমি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। উপকূলের এই সমভূমি পলিমাটি দ্বারা গঠিত বলিয়া অত্যন্ত উর্বর।

উত্তর ভারতের নদ-নদী

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু এই তিনটি উত্তর ভারতের প্রধান নদী।

গঙ্গা নদী (দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল)—ইহা উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নদী। ইহা হিমালয়ের গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে

প্রবেশ করিয়াছে। তারপর উত্তর প্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়া পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া রাজমহলের নিকট পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকট ইহা ভাগীরথী ও পদ্মা এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। পদ্মা পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেঘনার সহিত মিশিয়া বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। ভাগীরথী পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভাগীরথীর নিম্ন অংশ হুগলী নদী নামে পরিচিত।

উত্তর ও দক্ষিণ তীর হইতে অনেকগুলি উপনদী গঙ্গা নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ তীরে যমুনা ও শোণ এবং বাম তীরে রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা (সরযূ), গণ্ডকী ও কুশী নদীই প্রধান। চম্বল ও বেতোয়া নদী বিন্ধ্য পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া যমুনা নদীতে পড়িয়াছে। ছোট নাগপুরের মালভূমি হইতে অনেকগুলি নদী উৎপন্ন হইয়া ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। ইহাদের কথা তোমরা পরে জানিতে পারিবে।

গঙ্গা ও ইহার অনেকগুলি উপনদী হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট। এই জন্য গঙ্গা নদীতে বার মাস জল থাকে। জমির ঢাল খুব কম বলিয়া ইহা মোহানা হইতে প্রায় ১০০০ মাইল পর্যন্ত নৌ-চলাচলের উপযোগী। গঙ্গা নদীই উত্তর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যপথ। ভারতের অনেক প্রাচীন নগর এই নদীর তীরে অবস্থিত। **কলিকাতা, ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর** প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগর গঙ্গার তীরে অবস্থিত। গঙ্গা ও ইহার উপনদীগুলি প্রচুর পলিমাটি বহন করিয়া আনে। এই জন্য গঙ্গার উপত্যকা ভূমি অত্যন্ত উর্বর।

ব্রহ্মপুত্র নদ (দৈর্ঘ্য ১,৬৮০ মাইল)—ইহা তিব্বতের মানস সরোবরের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া তিব্বত মালভূমির দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। তিব্বতে ইহার নাম সান্-পু। তারপর ইহা গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়া সদিয়ার উত্তরে আসামে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তর-পূর্ব আসামে ইহা ডিহং নামে পরিচিত। ইহা আসামের মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে তিস্তা নদীর সহিত মিলিত হইয়া গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মায় মিশিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরের উপনদীর মধ্যে সুবর্ণশ্রী, মানস, টোর্সা,

তিস্তা, করতোয়া এবং বাম তীরের উপনদীর মধ্যে ডিবং, লোহিত ও ধনশ্রী নদীই প্রধান। ব্রহ্মপুত্রের স্রোত অপেক্ষাকৃত বেশী হইলেও ইহা মোহানা হইতে একেবারে আসামের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত নৌ-বাহনযোগ্য। আসাম প্রদেশের পণ্য-দ্রব্যের অধিকাংশই এই নদীপথে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। **ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটি, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী** প্রভৃতি আসামের প্রধান প্রধান নগর এই নদীর তীরেই অবস্থিত।

সিন্ধু নদ—সিন্ধু ও উহার উপনদীগুলির অতি সামান্য অংশই ভারতে অবস্থিত। সিন্ধু ও উহার উপনদীগুলি প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের নদী।

দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী

নর্মদা ও তাপ্তী ভিন্ন দক্ষিণ ভারতের সব নদীই পূর্ব-বাহিনী। **নর্মদা**, অমর কণ্টক পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া বিন্ধ্য ও সাতপুরা পাহাড়ের মধ্য দিয়া এবং **তাপ্তী** নদী মহাদেব পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া সাতপুরা পাহাড়ের দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন বন্দর **সুরাট** তাপ্তীর তীরে অবস্থিত।

পূর্ব-বাহিনী নদীগুলির মধ্যে মহানদী, গোদাবরী ও কাবেরী নদীই প্রধান। **মহানদী** (৫২০ মাইল) সাতপুরা পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহা মোহানায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। মহানদীর উপনদীগুলির মধ্যে **ব্রাহ্মণী** ও **বৈতরণী** নদীই প্রধান। **সম্বলপুর** ও **কটক** মহানদীর তীরে অবস্থিত। **গোদাবরী** (৯০০ মাইল) পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বোম্বাই ও অন্ধ্র রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **প্রাণহিতা, মঞ্জীরা** ও **শবরী** ইহার প্রধান উপনদী, গোদাবরী ব-দ্বীপের মুখে **রাজমাহেন্দ্রী** শহর অবস্থিত। গোদাবরীই দক্ষিণাপথের বৃহত্তম নদী। **কৃষ্ণা** নদী পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **ভীমা** ও **তুঙ্গভদ্রা** ইহার প্রধান উপনদী। **সাতারা** ও **বেজোয়াদা** কৃষ্ণার তীরে অবস্থিত। **কাবেরী** নদী মহীশূর ও মাদ্রাজ রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

ত্রিচিনপল্লী ও **কুম্ভকোণম্** শহর কাবেরীর তীরে অবস্থিত। এই নদীতে অনেক জলপ্রপাত আছে, তন্মধ্যে **শিবসমুদ্রম্** জলপ্রপাতই বিখ্যাত।

দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি অল্প-উচ্চ পাহাড় হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা বরফগলা জল পায় না। বৃষ্টির জলের উপরেই ইহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়—তাই বর্ষাকালে ইহারা জলে পূর্ণ থাকে এবং শীতকালে স্থানে স্থানে শুকাইয়া যায়। বর্ষাকালে ইহারা অত্যন্ত খরস্রোতা হয় ও ভীষণ আকার ধারণ করে। তাই এই নদীগুলি নৌ-চলাচলের অনুপযোগী। নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যও বিশেষ হয় না। এজন্য এই সকল নদীর তীরে উত্তর ভারতের নদীর মত বড় নগর নাই। তবে খরস্রোতা বলিয়া এই নদীগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত প্রশস্ত। অনেকগুলি নদীর ঊর্ধ্ব প্রবাহের জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ তৈয়ারী করা হইতেছে।

জলবায়ু

ভারত ক্রান্তীয় উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। ইহা উষ্ণ মৌসুমী জলবায়ুর দেশ। মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কি তাহা তোমরা দ্বিতীয় খণ্ডে পড়িয়াছ। ভারতের জলবায়ুর উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। ভারত বিশাল দেশ, তাই সকল স্থানের জলবায়ু একরূপ নহে। স্থান বিশেষে জলবায়ু বিভিন্ন হইলেও মোটামুটিভাবে এই দেশে বৎসরকে তিন ঋতুতে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন—গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতু। মার্চ মাসের শেষার্ধ হইতে জুন মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল, জুন মাসের শেষার্ধ হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষাকাল এবং অক্টোবর হইতে মার্চ মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শীতকাল।

গ্রীষ্মকালীন অবস্থা—মার্চ মাসের প্রথম হইতেই ভারতের অধিকাংশ স্থানে শীত কমিতে আরম্ভ করে এবং মার্চের মাঝামাঝি হইতে গরম বাড়িতে থাকে। সূর্য যত উত্তরে সরিতে থাকে গরমও তত বাড়িতে থাকে। এপ্রিল ও মে মাসে সূর্য ভারতের স্থলভাগের উপর লম্বভাবে কিরণ দিতে থাকে, তাই তখন সমগ্র ভারতেই তাপমাত্রা চরমে উঠে। অধিকাংশ স্থানে মে মাসেই তাপ সর্বাধিক হয়। পশ্চিমবঙ্গে মে মাসের গড় উত্তাপ ৮৫° ফাঃ হয়। যতই পশ্চিমে

যাওয়া যায় তাপ ততই বাড়িতে থাকে। উত্তর বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশের গড় তাপমাত্রা তখন ৯০° ফাঃ-র অধিক, আরও পশ্চিমে পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিম ভাগে তখন তাপ ৯৫° ফাঃ-র কাছাকাছি।

দাক্ষিণাত্যের অবস্থা তখন অন্যরূপ। সেখানে মার্চের শেষে এবং এপ্রিলের প্রথমেই তাপ সর্বোচ্চে উঠিয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের দুই দিকেই সমুদ্র, তাই বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকে। প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে পরিচলন বৃষ্টি হয়। সন্ধ্যার পর প্রায়ই বৃষ্টি নামে। বায়ুমণ্ডলও তখন কিছুটা শীতল হয়। এই বৃষ্টি কফি ও আম চাষের বিশেষ অনুকূল।

উত্তর ভারতে তখন প্রচণ্ড গরম। দিবাভাগে কলিকাতার উত্তাপই কোন কোন দিন ১০৬°-১০৭° ফাঃ-এ উঠে। উত্তর ও মধ্য ভারতে তখন দিনের উত্তাপ ১১৮° ফাঃ-১২৫° ফাঃ পর্যন্ত হয়। এই সময়ে একটি উষ্ণ বায়ুও প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাকে 'লু' বলে। প্রচণ্ড গরমের জন্য মধ্যাহ্নে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকে। পথঘাটে জনপ্রাণী বিশেষ দেখা যায় না। আবার সন্ধ্যা বেলায় আরম্ভ হয় দুরন্ত আঁধি বা বালির ঝড়। এই প্রবল ঝড়ে শুধু বালিই উড়ে, বৃষ্টি হয় না, আর হইলেও দুই এক ফোঁটার বেশী নয়। আকাশ এখানে মেঘমুক্ত, বায়ুতে জলীয় বাষ্পও খুব কম, তাই রাত্রে তাপ অনেক কমিয়া যায়, শেষরাত্রে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। অধিবাসীরা উন্মুক্ত আকাশের নীচেই শয়ন করে। বাঙ্গালা দেশে কিন্তু তা হয় না, এখানকার বায়ু আর্দ্র থাকে, তাই রাত্রে তাপ তেমন কিছু বেশী কম হয় না। পশ্চিমাঞ্চলের বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity) ৫%-১০%এর বেশী হয় না। বঙ্গদেশে তাপ অপেক্ষাকৃত কম থাকিলেও আর্দ্রতার জন্য ইহা অসহ্য হইয়া উঠে। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে ও আসামে মধ্যে মধ্যে কালবৈশাখীর ঝড় দেখা দেয়। তখন হঠাৎ শীতল বাতাস বহিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপের জন্য ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে বায়ুর চাপ খুব কমিয়া যায়, সেখানে একটি লঘু-চাপ কেন্দ্রের উৎপত্তি হয়। তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্দ্রের শক্তিও বাড়িতে থাকে। জুন মাসের প্রথমভাগে ইহা প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়। লঘু-চাপ মণ্ডল তখন দক্ষিণাপথের দিকেও বিস্তার লাভ করে। তখন হঠাৎ

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। এই বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা নামে এবং ভারতে বর্ষা ঋতুর আবির্ভাব হয়।

বর্ষাকালীন অবস্থা—নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে আয়নবায়ু প্রবাহিত হয় একথা তোমরা জান। ভারত মহাসাগরে নিরক্ষরেখার দক্ষিণে দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। পশ্চিম ভারতের লঘু-চাপ কেন্দ্রের ক্ষমতা যখন খুব বেশী হয় তখন এই আয়নবায়ু নিরক্ষরেখার নিকটে আসিতে না আসিতেই লঘু-চাপ মণ্ডলের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই পরিবর্তন হঠাৎ ঘটে, তাই মৌসুমী বায়ুও হঠাৎ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। পৃথিবীর আবর্তনের জন্য এই বায়ু সোজা উত্তর দিকে প্রবাহিত না হইয়া উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাই আমাদের পরিচিত **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু**। ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের দশভাগের প্রায় নয় ভাগই এই বায়ুপ্রবাহের জন্য হয়। বৃষ্টিপাতের উপর ভূ-প্রকৃতির কতখানি প্রভাব তাহা তোমরা এখনই জানিতে পারিবে। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের এক অংশ আরব সাগরের উপর দিয়া এবং অপর অংশ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারতে পৌঁছায়।

আরব সাগরীয় মৌসুমী শাখা প্রথমে আসিয়া পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধা পায়। পশ্চিম উপকূলে ইহা প্রচুর বারিবর্ষণ করে। পশ্চিম উপকূলের স্থানে স্থানে ১০০" পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। ইহার ফলে বায়ুর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। তাই পশ্চিমঘাটের অপর পার্শ্বে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে (বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক কম—মাত্র ২০"-২৫"। এই বায়ুর যে শাখা উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় তাহা হইতে বৃষ্টিপাত হয় না বলিলেই চলে। রাজস্থান ও মধ্য পশ্চিম ভারতে এই বায়ু হইতে বৃষ্টিপাত হয় না, আর হইলেও খুব সামান্যই হয়।

মৌসুমী বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা বঙ্গদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসামের খাসিয়া পাহাড়ে ও বঙ্গদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতে প্রতিহত হয়। খাসিয়া পাহাড়ের ভূমির বিশেষ বিন্যাসের জন্য এই বায়ু পর্বতের অনুবাত পার্শ্বে প্রচুর বারিবর্ষণ করে। এই অঞ্চলে চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত (গড়ে ৫০০") হয়। পাহাড়ের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে অবশ্য অনেক কম বৃষ্টিপাত

হয়। হিমালয়ের পাদভূমিতেও প্রচুর বৃষ্টি হয়। তারপর এই বায়ু গাঙ্গেয় উপত্যকা বাহিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এদিকে বৃষ্টির পরিমাণ পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। আসাম ও পূর্ববঙ্গে গড়পড়তা ৮০"-র অধিক বৃষ্টিপাত হয়, পশ্চিমবঙ্গে ৬০"-র কাছাকাছি, বিহারে প্রায় ৪০"-৪৫", উত্তর প্রদেশে আরও কম। উত্তর প্রদেশে পূর্বভাগে ৩৫"-৩৬", পশ্চিমার্ধে প্রায় ৩০" এবং পাঞ্জাবে ২৫"র কাছাকাছি। হিমালয়ের সানুদেশে সমভূমি অপেক্ষা বেশী বৃষ্টি হয়। উপরোক্ত মৌসুমী বায়ু যখন পশ্চিম ভারতে পৌঁছায় তখন ইহাতে জলীয় বাষ্প খুব কমই থাকে। ইহার যে অংশ থর মরুর দিকে যায় সেখানে উত্তাপের জন্য উহার আপেক্ষিক আর্দ্রতা আরও কমিয়া যায়। তাই এই বায়ু হইতে সেখানে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না।

বৃষ্টি সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সর্বত্র তাপমাত্রা কমিয়া যায়। কয়েকদিন বৃষ্টি না হইলেই তাপ বাড়ে, আবার এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলেই তাপ নামিয়া যায়। অক্টোবরে খুব সামান্যই বৃষ্টি হয়।

শীতকালীন অবস্থা—অক্টোবরে তাপ কমিয়া যায়। নভেম্বরের প্রথম হইতেই মৃদু শীত বোধ হইতে থাকে। ডিসেম্বর মাসে রীতিমত শীত পড়ে। জানুয়ারী মাসে তাপমাত্রা সবচেয়ে নীচে নামে। তখন পূর্ব ভারতের গড় উত্তাপ ৬৫° ফাঃ-৭৫° ফাঃ, তাপমাত্রা পশ্চিমদিকে কমিতে কমিতে পাঞ্জাবে প্রায় ৫৫° ফাঃ-এ নামে। পশ্চিম উপকূলে এবং পূর্ব উপকূলের দক্ষিণাংশে তাপ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। তথায় জানুয়ারীর গড় উত্তাপ ৭৫° ফাঃ-র বেশী।

শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক হইতে একটি মন্দগতি বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাই শীতের মৌসুমী বা **উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু**। এই বায়ু স্থলভাগ হইতে আসে বলিয়া ইহাতে জলীয় বাষ্প বেশী থাকে না—তাই এই বায়ু হইতে বৃষ্টিপাত হয় না। তবে ইহা যখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে তখন ইহা প্রচুর জলীয় বাষ্প শোষণ করে এবং মাদ্রাজের উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটায়—তাই মাদ্রাজে শীতকালেও বৃষ্টিপাত হয়।

শীতকালে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। ইহার কারণ তোমরা জান কি? ভূমধ্যসাগরে শীতকালে অনেক ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। এইগুলি

পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাদের কোন কোন অংশ কখন কখন পশ্চিম পাকিস্তান অতিক্রম করিয়া গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রবেশ করে। সেইজন্যই শীতকালে পূর্ব পাঞ্জাবে, উত্তর প্রদেশে এবং কখন কখন বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গেও বৃষ্টিপাত হয়। তবে এই বৃষ্টির পরিমাণ খুব সামান্য। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি হইতে শীত কমিতে থাকে এবং গরম বাড়িতে বাড়িতে মার্চের শেষার্ধ হইতে গ্রীষ্মের আরম্ভ হয়।

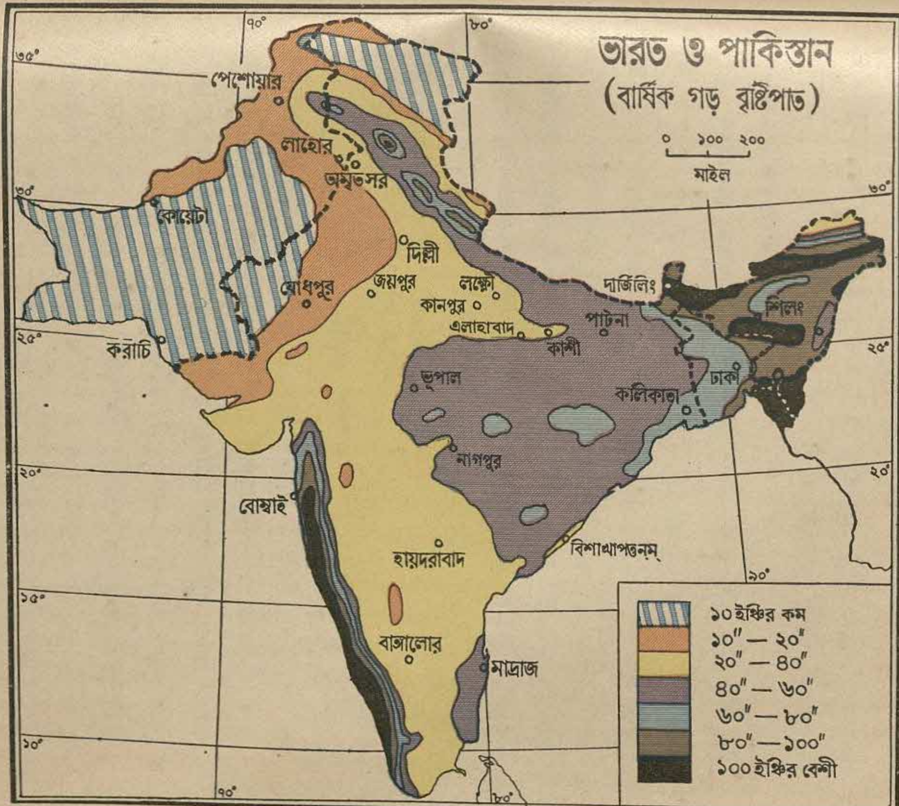
স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ

উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির সহিত জলবায়ু ও মৃত্তিকার সুনিবিড় সম্বন্ধ। জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে উদ্ভিজ্জের উপর উত্তাপ ও বারিপাতের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা অধিক। ভারত উষ্ণ দেশ। এই দেশের প্রায় সর্বত্রই তাপমাত্রা বৃক্ষ-উৎপাদনের অনুকূল। এইজন্য এই দেশে বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুযায়ী উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়াছে। বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি অনুযায়ী ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জকে নিম্নলিখিত বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি**—যে সকল অঞ্চলে বার্ষিক বারিপাত ৮০"-র অধিক তথায় নিরক্ষীয় অঞ্চলের মত চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। আসাম, হিমালয়ের পাদভূমি, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিম পার্শ্ব ও পশ্চিম উপকূলে এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এরূপ বনভূমি আছে। এই অরণ্যে বিশপ, গর্জন, তুন, শিশু প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান। এই সকল বৃক্ষ হইতে ভাল কাঠ হয়।

(২) **পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যভূমি**—যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ৪০" হইতে ৮০" তথায় শাল, সেগুন, অর্জুন, জারুল, আবলুস, খয়ের, সিরিষ, শিমুল, আম, জাম, বট প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষই অধিক। এইগুলি হিমালয়ের চিরহরিৎ অরণ্যের দক্ষিণ অঞ্চল, ছোট নাগপুরের মালভূমি, মহানদী উপত্যকা, মালব ও মধ্য প্রদেশের পার্বত্যভূমি, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও পূর্বঘাট পর্বতের প্রধান উদ্ভিজ্জ। শুষ্ক ঋতুতে এই সকল বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া পড়ে, তাই ইহাদিগকে পর্ণমোচী বৃক্ষ বলে।

(৩) **ক্রান্তীয় তৃণভূমি**—যে সকল স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০" হইতে ৪০" সেই সকল স্থানে সাভানা জাতীয় তৃণই প্রধান উদ্ভিজ্জ। পাঞ্জাব,


ভারত ও পাকিস্তান
(বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত)
০ ১০০ ২০০
মাইল
পেশোয়ার
লাহোর
অমৃতসর
কোয়েটা
দিল্লী
যোধপুর
জয়পুর
লক্ষ্ণৌ
কানপুর
এলাহাবাদ
দার্জিলিং
পাটনা
কাশী
শিলং
ঢাকা
করাচি
ভূপাল
কলিকাতা
নাগপুর
বোম্বাই
হায়দরাবাদ
বিশাখাপত্তনম্
বাঙ্গালোর
মাদ্রাজ
১০ ইঞ্চির কম
১০" — ২০"
২০" — ৪০"
৪০" — ৬০"
৬০" — ৮০"
৮০" — ১০০"
১০০ ইঞ্চির বেশী

উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থান ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে এই তৃণভূমি দেখা যায়। আজকাল অনেক স্থানে তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া চাষ আবাদ করা হইতেছে।

(৪) **গুল্মভূমি**—বৃষ্টিপাত যেখানে ২০"র কম তথায় কাঁটাগাছের ঝোপ-ঝাড় এবং সরু পাতা বিশিষ্ট ছোট ছোট বৃক্ষই প্রধান উদ্ভিজ্জ। এইসব বৃক্ষের মধ্যে বাবলা গাছই সবচেয়ে বিখ্যাত। রাজস্থান (বিশেষতঃ রাজস্থানের পশ্চিমাংশ) এবং পাঞ্জাবের রোটক, গড়গাঁও ও হিস্‌সার প্রভৃতি অঞ্চলে এই জাতীয় গুল্মরাজিই প্রধান উদ্ভিজ্জ।

(৫) **ব-দ্বীপীয় বনভূমি**—নদীর ব-দ্বীপে যে সকল স্থান জোয়ারের জলে প্লাবিত হয় ও কাদায় ভরিয়া থাকে তথায় ম্যান্‌গ্রোভ জাতীয় বৃক্ষ জন্মে। ম্যান্‌গ্রোভ জাতীয় উদ্ভিজ্জভূমির পশ্চাতে বঙ্গদেশে গঙ্গার ব-দ্বীপে বিখ্যাত সুন্দরবন অবস্থিত। সুন্দরী গাছের নাম হইতেই এই বনভূমির নাম সুন্দরবন হইয়াছে।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ উচ্চতা অনুযায়ী বিভিন্ন হইয়া থাকে। প্রায় ৫,০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাইবে। তারপর ১২,০০০ ফুট পর্যন্ত সরলবর্গীয় বৃক্ষ এবং ইহার পর হিমরেখার নীচু পর্যন্ত তৃণভূমি দেখা যায়।

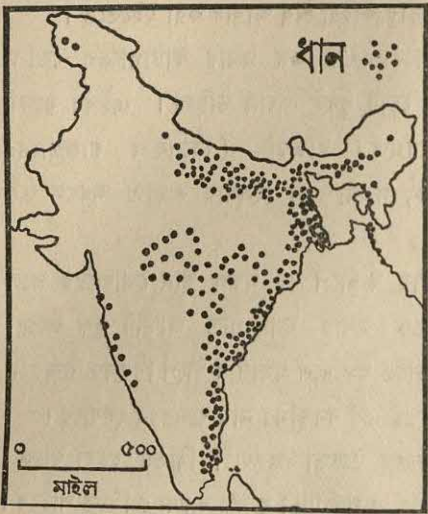
বনজ সম্পদ

ভারতের বনভূমি হইতে শাল, সেগুন, আবলুস, দেবদারু, পাইন ও চন্দন প্রভৃতি বহু মূল্যবান কাষ্ঠ পাওয়া যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জ্বালানী কাষ্ঠও প্রচুর পরিমাণে এই সকল বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয়। বাঁশ, বেত, শোলা, হোগলা, কুশ, বেনা ঘাস প্রভৃতিও বনভূমি হইতে আসে। এছাড়া লাক্ষা, রজন, তার্পিন, ধূনা, রেশম, মধু, মোম, গোলপাতা, বিড়ির পাতা প্রভৃতি বনজ সম্পদও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

কৃষিকার্য

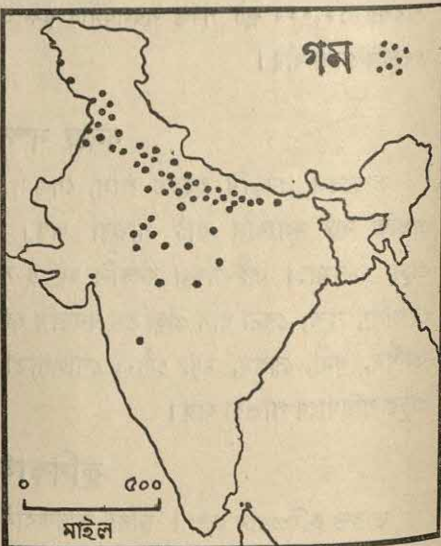
ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিই ভারতবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। ভারতের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক লোক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। খাদ্যশস্যের মধ্যে ভারতে ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ও ডালই প্রধান।

ধান—কি রকম ভৌগোলিক পরিবেশ ধান চাষের পক্ষে অনুকূল তাহা তোমরা দ্বিতীয় খণ্ডে পড়িয়াছ। ধানই ভারতের প্রধান ফসল। ভারতের যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক ও ভূমি সমতল তথায় ধান্য জন্মে। নদী-উপত্যকার পলিভূমি ধান্য উৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশের পূর্ব ভাগ, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিম উপকূলে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। ধান্য উৎপাদনে মাদ্রাজের স্থানই প্রথম। ইহার পরে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের স্থান। ধান্য উৎপাদনে চীন দেশ পৃথিবীতে প্রথম, উহার পরেই ভারতের স্থান।



ভারতের ধান্য উৎপাদক অঞ্চল
১৪২নং চিত্র

গম—গম চাষের পক্ষে কি রকম জলবায়ু প্রয়োজন তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে। ভারতে খাদ্যশস্য হিসাবে ধানের পরেই গমের স্থান। ভারতের যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ২৫"-৩৫", এবং অল্পবৃষ্টি অঞ্চলের যে সকল স্থানে জলসেচের সুবিধা



ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল
১৪৩নং চিত্র

আছে তথায় প্রচুর গম জন্মে। পূর্ব পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশেই সবচেয়ে বেশী গম উৎপন্ন হয়। ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এই দুই প্রদেশে উৎপন্ন হয়। এছাড়া বিহার, নর্মদা উপত্যকা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মধ্যভারত এবং রাজস্থানেও গম উৎপন্ন হয়।

জোয়ার-বাজরা—যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ২০"-৪০", সেই সকল অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমিতে জোয়ার ও বাজরার চাষ হয়। বোম্বাই এবং অন্ধ্র রাজ্যের পশ্চিমভাগেই সবচেয়ে বেশী জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, রাজস্থান ও পাঞ্জাবেও ইহার চাষ হয়।

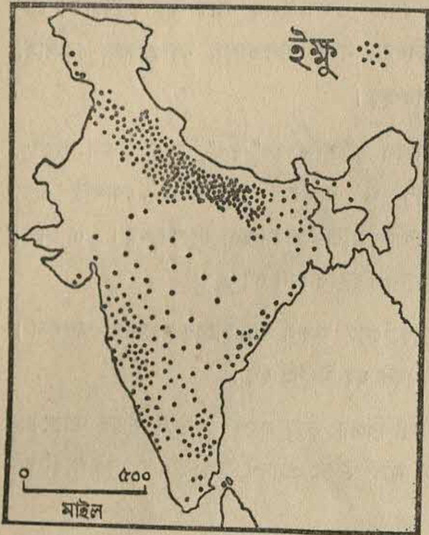
যব—যে অঞ্চলে গম উৎপন্ন হয়, সেই অঞ্চল যব চাষের পক্ষেও অনুকূল। উত্তর প্রদেশ এবং বিহারেই সবচেয়ে বেশী যব উৎপন্ন হয়।

ভুট্টা—ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্প-বিস্তর ভুট্টা জন্মে। তবে উত্তর ভারতেই ভুট্টার চাষ অধিক। উত্তর ভারতের মধ্যে উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং পূর্ব পাঞ্জাবেই সবচেয়ে অধিক ভুট্টা উৎপন্ন হয়।

ডাল—মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, অড়হর, খেঁসারি প্রভৃতি ডাল ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্পাধিক উৎপন্ন হয়। ছোলা সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয় উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশে। অড়হর বিহার ও উত্তর প্রদেশেই অধিক জন্মে।

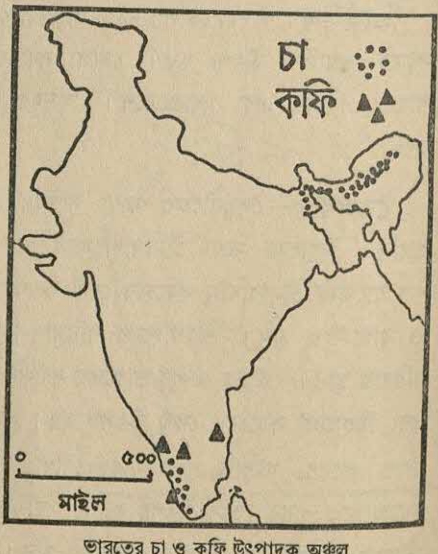
তৈলবীজ—তৈলবীজের মধ্যে সরিষা, তিল, তিসি এবং চীনাবাদামই প্রধান। ইহাদের মধ্যে চীনাবাদামের চাষই সবচেয়ে বেশী। মাদ্রাজ এবং অন্ধ্র রাজ্যেই চীনাবাদাম সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয়। মাদ্রাজের পরে মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইএর স্থান। উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে চীনাবাদামের পরেই রাই ও সরিষার স্থান। উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বত্রই ইহা উৎপন্ন হয়, তবে উত্তর প্রদেশ এবং বিহারেই সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয়। তিল সবচেয়ে অধিক উৎপন্ন হয় উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র এবং বোম্বাই রাজ্যে। উত্তর প্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে প্রচুর তিসি উৎপন্ন হয়। রেড়ির চাষ সবচেয়ে বেশী হয় মাদ্রাজে, তারপর বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের স্থান।

ইক্ষু—ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই উত্তর প্রদেশ ও উত্তর বিহারে উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং বোম্বাই রাজ্যেও ইক্ষু উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইক্ষু উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান প্রথম।



ভারতের ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল
১৪৪নং চিত্র

চা—ভারতের বৃষ্টিবহুল উষ্ণ অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে যেখানে জল দাঁড়াইতে পারে না তথায় চা জন্মে। চা উৎপাদনে আসামের স্থান প্রথম। ভারতের অর্ধেকের চেয়েও বেশী চা এই প্রদেশে উৎপন্ন হয়। তাহার পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। মোট উৎপাদনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়। এছাড়া বিহারের হাজারিবাগ, রাঁচি ও পূর্ণিয়া জেলায়, উত্তর প্রদেশের আলমোড়া ও গাড়োয়াল অঞ্চলে, পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায়, দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কুর্গ এবং বোম্বাইএর সাতারা জেলায় অল্পবিস্তর চা উৎপন্ন হয়। চা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।



ভারতের চা ও কফি উৎপাদক অঞ্চল
১৪৫নং চিত্র

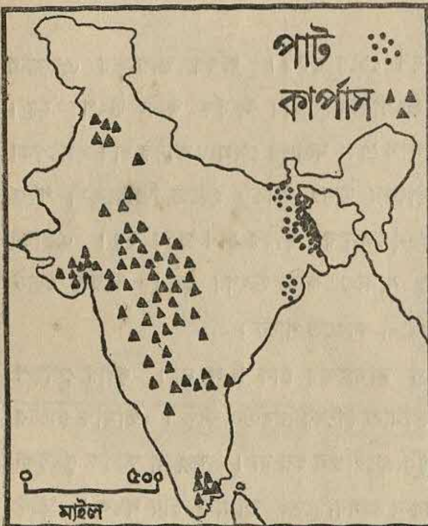
কফি—মন্দোষ্ণ জলবায়ু এবং মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত (৪০" হইতে ৮০") কফি চাষের পক্ষে অনুকূল। যে সকল জমিতে ভালভাবে জলনিকাশ হয় এবং মৃত্তিকাও উর্বর সেই সকল জমিই কফি চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। ভারতে প্রায় ২ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে কফির চাষ হয় এবং প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড কফি উৎপন্ন হয়।

দক্ষিণ ভারতেই কফির চাষ সব চেয়ে বেশী। দক্ষিণ ভারতের একমাত্র মহীশূর রাজ্যেই ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক কফি উৎপন্ন হয়। মহীশূর রাজ্যের কাডুর, সিমোগা, হাসান এবং মহীশূর জেলায় কফির চাষ সর্বাপেক্ষা অধিক। নীলগিরি পর্বত, কুর্গ, মাদ্রাজের উত্তর আর্কট হইতে তিন্নেভেল্লী পর্যন্ত অঞ্চল, এবং অন্ধ্র রাজ্যের বিশাখাপত্তনম্ জেলায়ও কফির চাষ প্রচুর হয়। এছাড়া বোম্বাই রাজ্যের সাতারা জেলায়ও সামান্য কফি উৎপন্ন হয়। ভারত মোট উৎপন্ন কফির প্রায় অর্ধেক বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে।

তামাক—আমাদের দেশে পূর্বে তামাকের চাষ ছিল না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা ভারতে প্রথম তামাক চাষের প্রবর্তন করে। তামাক চাষের জন্য বিশেষ কোন এক প্রকার জলবায়ুর প্রয়োজন হয় না। অল্প বা অধিক বৃষ্টিযুক্ত এবং অতিউষ্ণ বা নাতিউষ্ণ সব রকম জলবায়ুতেই তামাক চাষ সম্ভব। তাই ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর তামাকের চাষ আছে। তবে বিহার, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই এবং দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর রাজ্যেই সবচেয়ে বেশী তামাক উৎপন্ন হয়। বিহারের মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া জেলা ; পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা ; অন্ধ্র রাজ্যের গুণ্টুর, বিশাখাপত্তনম্, পূর্ব-গোদাবরী জেলা এবং মাদ্রাজ রাজ্যের কোয়েম্বাটুর ও মাদুরা জেলায় তামাকের চাষ খুব বেশী। বোম্বাই রাজ্যের বেলগুয়াম্, বরোদা এবং সাতারা জেলায় তামাকের চাষ অনেক আছে। এছাড়া পাঞ্জাবের জলন্ধর, হোসিয়ারপুর, গুরুদাসপুর জেলায়ও যথেষ্ট তামাক উৎপন্ন হয়। ভারতে প্রায় ১০ লক্ষ একর জমিতে তামাক চাষ হয়। গড়ে প্রতি বৎসর ভারতে প্রায় ৪ লক্ষ টন তামাক উৎপন্ন হয়।

কার্পাস—কার্পাস চাষের পক্ষে কিরূপ জলবায়ু ও মৃত্তিকা প্রয়োজন তাহা

দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্যভারতই ভারতে কার্পাস উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী কার্পাস উৎপন্ন হয়। মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, অন্ধ্র, মাদ্রাজ এবং পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যে বেশী কার্পাস জন্মে। দেশীয় কার্পাসের আঁশ ছোট ও ইহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। আজকাল পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে জলসেচের সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর (American Type) কার্পাসের চাষ হইতেছে। ভারতের অর্থকরী ফসলের (Cash Crop) মধ্যে কার্পাসের স্থানই প্রথম।



ভারতের পাট ও কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল
১৪৬নং চিত্র

পাট—পাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম, তারপর আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার স্থান। পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী-হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, বিহারের পূর্ণিয়া এবং উড়িষ্যার কটক জেলায় পাটের চাষ খুব বেশী হয়। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও পাট চাষ হয়। পাট উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান দ্বিতীয়।

রবার—দক্ষিণ ভারতেই রবারের চাষ সীমাবদ্ধ। মাদ্রাজ, কুর্গ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও মহীশূর রাজ্যে রবারের চাষ আছে। ভারতে উৎপন্ন রবারের পরিমাণ খুবই কম।

মশলা—লঙ্কা, হলুদ, আদা, মৌরী প্রভৃতি মশলা ভারতের প্রায় সর্বত্রই উৎপন্ন হয়। গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাতা, জৈত্রী, জায়ফল প্রভৃতি মশলা মালাবর উপকূল এবং মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণদিকে প্রচুর উৎপন্ন হয়। এই সকল মশলার জন্য অতীতে ভারতের খুব খ্যাতি ছিল।

এই সকল উৎপন্ন দ্রব্য ছাড়া ভারতে আরও অনেক কৃষিজ দ্রব্য আছে।

তন্মধ্যে আলু, শণ, নারিকেল, সুপারি, সিঙ্কোনা, আফিং এবং আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আঙ্গুর, বেদানা, আপেল ও কমলালেবু প্রভৃতি ফলের নাম করা যাইতে পারে।

জলসেচ-ব্যবস্থা*

ভারতে বৎসরের সব সময় বৃষ্টিপাত হয় না এবং সব বৎসর সমান বৃষ্টিপাত হয় না। এই সকল কারণে কৃষিকার্যের জন্য কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ভারতের সেচ-ব্যবস্থা তিন প্রকারের। যথা—

(১) **কূপ** ও **নলকূপ,** (২) **জলাশয়** ও (৩) **খাল।** সেচ-জমির অর্ধেক ভাগে খাল হইতে জলসেচ করা হয়। সিকি ভাগ জমিতে কূপ হইতে এবং এক-অষ্টমাংশ জমিতে জলাশয় হইতে জলসেচ করা হইয়া থাকে।

(১) **কূপ ও নলকূপ**—কূপ হইতে জমিতে জলসেচের প্রথা ভারতের অনেক স্থানেই প্রচলিত। তবে উত্তর ও পশ্চিম ভারতেই ইহার প্রচলন বেশী। উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং সৌরাষ্ট্রেই কূপের সংখ্যা অধিক। এছাড়া বিহার, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমভাগ (বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায়), বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশেও কূপ হইতে জমিতে জলসেচ করা হয়। আজকাল অনেক স্থানে কূপের পরিবর্তে নলকূপের ব্যবহার করা হইতেছে। নলকূপের সংখ্যা উত্তর প্রদেশেই অধিক। সেখানে বিদ্যুতের সাহায্যে নলকূপ চালান হইতেছে। বৈদ্যুতিক নলকূপ বসান ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া সর্বত্র ইহার প্রচলন হয় নাই।

(২) **জলাশয়**—জলাশয় হইতে জলসেচের প্রথা বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত আছে। বর্ষার জল জলাশয়ে ধরিয়া রাখা হয় এবং তথা হইতে খাল কাটিয়া জমিতে জলসেচ করা হয়। জলসেচের এই প্রথা দক্ষিণ ভারতেই বেশী প্রচলিত। মাদ্রাজ, বোম্বাই, অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশে এইরূপ অসংখ্য জলাশয় আছে। উত্তর ভারতেও কিছুসংখ্যক জলাশয় আছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় এরূপ অনেক জলাশয় ছিল। আজকাল সংস্কারের অভাবে অনেক জলাশয়ই মজিয়া গিয়াছে।

---

* জলসেচ-ব্যবস্থা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিজ্ঞাপিত সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে জলসেচের উপর কৃষি অনেকটা নির্ভরশীল, তাই এখানে সেচ-ব্যবস্থার খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

(৩) **খাল**—নদী হইতে খাল কাটিয়া জমিতে জলসেচের প্রথাও কম প্রাচীন নয়। মধ্যযুগেও ভারতে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। উত্তর ভারতের অনেক খাল মুসলমান আমলে কাটা হইয়াছিল। সেই সেচ-খাল আবার দুই প্রকার। যে সকল খালে শুধু বর্ষার সময় জল থাকে তাহাদিগকে **প্লাবন খাল**[১] এবং যেগুলিতে সারাবৎসরই জল থাকে সেইগুলিকে **নিত্যবহা খাল** বলে। আজকাল ভারতের প্রায় সর্বত্রই খালের সাহায্যে জলসেচ করা হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খালগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

পাঞ্জাবের খালঃ—খালের দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করায় পাঞ্জাবে কৃষির অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক জনবিরল শুষ্ক মরুপ্রায় ভূমি এখন জনবহুল উর্বর কৃষি অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। পাঞ্জাবের খালের মধ্যে নিম্নোক্তগুলিই প্রধান।

(১) **উচ্চ বড়িদোয়াব খাল**—ইরাবতী নদী হইতে এই খাল কাটিয়া ইরাবতী ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী দোয়াবে জলসেচ করা হইতেছে। (২) **সিরহিন্দ্ খাল**—শতদ্রু নদী হইতে এই খাল কাটিয়া ফিরোজপুর, হিস্‌সার, নাভা, লুধিয়ানা ও পাতিয়ালা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে জলসেচ করা হইতেছে। (৩) **পশ্চিম যমুনা খাল**—যমুনা হইতে এই খাল কাটিয়া পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাবের অনেক স্থানে জলসেচ করা হয়।

উত্তর প্রদেশের খাল ঃ

(১) **পূর্ব যমুনা খাল**—নওশেরা নামক স্থানে যমুনা হইতে এই খাল কাটিয়া উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগে প্রায় ৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হইতেছে। (২) **উচ্চ গঙ্গা খাল**—হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা হইতে ইহা কাটা হইয়াছে। (৩) **নিম্ন গঙ্গা খাল**—নারোরা নামক স্থান হইতে ইহা বাহির হইয়া উচ্চ গঙ্গা খালের প্রান্তভাগে মিশিয়াছে। এই দুই খালের জলে গঙ্গা ও যমুনার দোয়াবে জলসেচ করা হইতেছে। (৪) **আগ্রা খাল**—দিল্লীর নিকটে ওখ্‌লা নামক স্থানে যমুনা হইতে এই খাল কাটা হইয়াছে। ইহা হইতে আগ্রা ও মথুরা জেলায় জল-

[১] আজকাল প্রায় সব প্লাবন খালকেই নিত্যবহা খালে পরিণত করা হইয়াছে। তাই প্লাবন খাল আজকাল খুব কমই আছে।

সেচ করা হয়। (৫) **সারদা খাল**—এই খালের সাহায্যে গঙ্গা ও ঘর্ঘরার মধ্যবর্তী অঞ্চলের জমিতে সেচকার্য চলে। (৬) **বেতোয়া খাল**—চম্বল ও



ভারতের জলসেচ অঞ্চল

১৪৭নং চিত্র

যমুনার সংগমস্থলের নিকট হইতে এই খাল কাটা হইয়াছে। ইহা হইতে জৌনপুর, ঝান্সী, হামিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জলসেচ করা হয়।

মধ্যপ্রদেশের খালের মধ্যে **মহানদী, উয়েন গঙ্গা, তান্দুলা খালের** নাম করা যাইতে পারে।

দাক্ষিণাত্যের খাল :

(১) **পেরিয়ার খাল**—দাক্ষিণাত্যে কার্ডামম পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে পেরিয়ার নদীতে বাঁধ দিয়া বৃহৎ জলাশয় সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই জল ৫,৭০০ ফুট লম্বা একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া পর্বতের পূর্বদিকে লইয়া যাওয়া হইতেছে। এই জল হইতে মাদুরা অঞ্চলের সমভূমিতে জলসেচ করা হয়। (২) **কুর্ণূল-কুদ্দাপা খাল**—ইহা তুঙ্গভদ্রা ও পেন্নার এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে জলসেচের সাহায্য করিতেছে। এছাড়া অন্যান্য খালের মধ্যে (৩) **গোদাবরী ব-দ্বীপ খাল,** (৪) **কৃষ্ণা ব-দ্বীপ খাল,** (৫) **কাবেরী ব-দ্বীপ খাল**ই উল্লেখযোগ্য।

ভারতে অন্যান্য খালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের **মেদিনীপুরের খাল, দামোদর খাল, ইডেন খাল** ও **বক্রেশ্বর খালের** নাম করা যাইতে পারে।

এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন নদী-পরিকল্পনার সাহায্যে যেসকল অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে।

জলবিদ্যুৎ

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কতকগুলি অনুকূল পরিবেশ থাকা চাই। যেমন—(১) **প্রচুর বৃষ্টিপাত,** (২) **বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি** এবং (৩) **অবিরাম জলধারা।**

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে জলবিদ্যুতের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে কয়লা-শক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক অসুবিধা আছে। ভারতে কয়লার পরিমাণ অত্যন্ত কম। তাছাড়া কয়লাখনিগুলি প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারেই সীমাবদ্ধ। এজন্য এদেশে তাপ-বিদ্যুতের পরিবর্তে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

আমাদের দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে দাক্ষিণাত্যেই অগ্রণী। দক্ষিণ-ভারতের মহীশূর রাজ্যে প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। কোলার স্বর্ণখনিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ১৯০২ সালে কাবেরী নদীর **শিবসমুদ্রম্** জলপ্রপাত হইতে ৫০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। আজকাল এখানে প্রায়

৫০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। সবরমতী নদীর **যোগ জলপ্রপাত** হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে। ইহার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২,২০,০০০ কিলোওয়াট। শিবসমুদ্রমের নিকটে শিমসা নামক স্থানে প্রায় ১৬,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে। এই সকল কেন্দ্র হইতে মহীশূর রাজ্যের অনেক শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ১৯১৫ সালে টাটা কোম্পানী বোম্বাই রাজ্যে **খোপোলি** জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই কেন্দ্রে ৪৮,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। তাছাড়া **ভিবপুরী** (প্রাথমিক ক্ষমতা ৪৮,০০০ কিলোওয়াট) ও **ভীরা** নামক স্থানে আরও দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। ভীরা কেন্দ্রের প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা ৮৮,০০০ কিলোওয়াট। এই সকল কেন্দ্র হইতে বোম্বাই শহরে, বোম্বাইয়ের বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীতে এবং কাপড়ের কলগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।



ভারতের জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র
১৪৮নং চিত্র

মাদ্রাজে প্রথমে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় কাবেরী নদীর পাইকারা উপনদী হইতে। **পাইকারা** কেন্দ্রের প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪০,০০০ কিলোওয়াট। পাইকারা নদীতে **মোয়ার** নামক স্থানে আরও একটি কেন্দ্র

(ক্ষমতা ২০,০০০ কিলোওয়াট) স্থাপিত হইয়াছে। **মেত্তুরের** জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে প্রায় ৪২,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। দক্ষিণ দিকে **পাপনাশম্** বিদ্যুৎকেন্দ্র (১৮,০০০ কিলোওয়াট) অবস্থিত।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে **পল্লীবসল** নামক স্থানে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (২১,০০০ কিলোওয়াট) আছে।

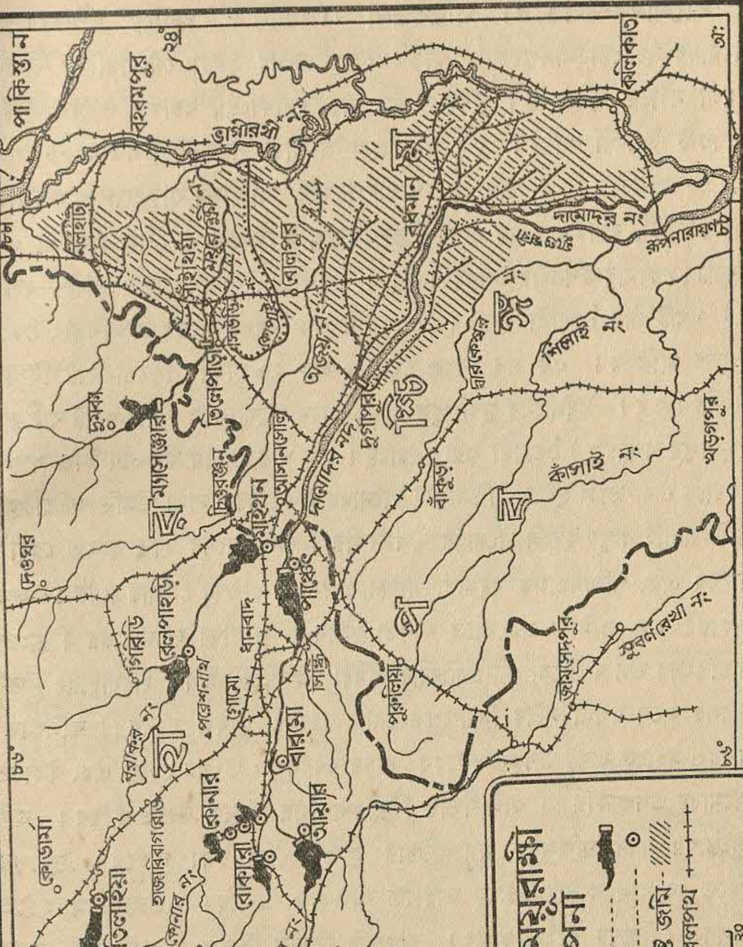
পাঞ্জাবের **যোগীন্দ্রনগর** জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা ৪৮,০০০ কিলোওয়াট। কাশ্মীরেও একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। ইহা বিতস্তা নদীতে **বুনিয়ার** নামক স্থানে অবস্থিত। ইহার উৎপাদন ক্ষমতা কম—মাত্র ৫০০০ কিলোওয়াট।

উত্তর প্রদেশে উচ্চ গঙ্গা খালের বিভিন্ন অংশে কৃত্রিম জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়া প্রায় ১৯,০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি **বাহাদুরাবাদ, নিরগজনী, চিতৌরা, সালাওয়া, ভোলা, পালরা, সুমেরা** এই সাতটি স্থানে অবস্থিত।

এছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। আজকাল যে সকল বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা কার্যকরী হইয়াছে তাহা হইতেও অনেক জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে। ইহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা

ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। নদীই দুই পার্শ্বের প্লাবন ভূমিতে পলিমাটি সঞ্চয় করিয়া এবং জলসেচের সুবিধা করিয়া এই দেশকে সুজলা, সুফলা করিয়াছে। অন্যদিকে বর্ষার অতিরিক্ত জলরাশি আবার কখন কখন কূল ছাপাইয়া বন্যার সৃষ্টি করে। বৃষ্টির অভাবে আবার কোন কোন নদী শুকাইয়া যায়। তাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নানা উপকারে লাগান হইতেছে। এজন্য ভারতে অনেক বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা হইতে একই সঙ্গে বহুবিধ উপকার পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা বলা হয়। ইহাতে **বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, নৌ-চলাচল** ও **মৎস্যচাষের** সুবিধা প্রভৃতি বহু উপকার হয়। ভারতে যেসকল নদী-পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।



দামোদর ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

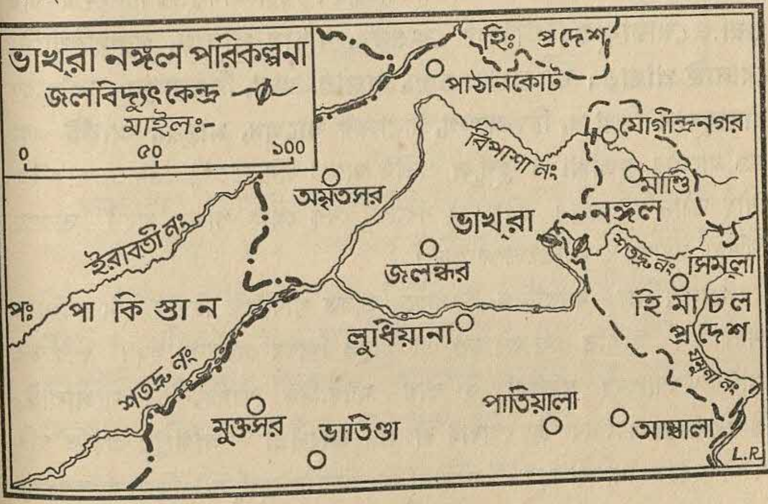
দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনা (Damodar Valley Project)—দামোদর নদ ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া গেঁয়োখালির নিকট হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। বিহারে কোনার, বোকারো, বরাকর প্রভৃতি ইহার কয়েকটি উপনদী আছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদর উপত্যকাতে দশটি বাঁধ দেওয়া হইবে। দামোদরের উপরে **পাঞ্চেৎ পাহাড়, বারমো** ও **আয়ার** এই তিনটি; বরাকর নদীর উপর **তিলাইয়া, মাইথন** ও **বেলপাহাড়ী** এই তিনটি; কোনার উপনদীর উপর তিনটি এবং বোকারো উপনদীর উপর একটি—মোট এই দশটি বাঁধ তৈয়ারী হইবে। প্রায় প্রত্যেক বাঁধের সঙ্গেই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযুক্ত থাকিবে। এই সব কেন্দ্রে মোট ২ লক্ষ ২৬ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। বর্ধমানের **দুর্গাপুর** নামক স্থানে দামোদরের উপর একটি ব্যারেজ (দুর্গাপুর ব্যারেজ) তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কতকটা কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং তাহা হইতে ইতিমধ্যেই দামোদর উপত্যকার নানা উন্নতি ঘটিয়াছে। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইলে দামোদর উপত্যকার নিম্নাংশ বন্যার হাত হইতে রেহাই পাইবে এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলায় মোট ১০ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। তাছাড়া দামোদরের নিম্নাংশে সারাবৎসর জল থাকিবে, নৌ-চলাচলের সুবিধা হইবে, এমন কি দামোদরের নূতন খালের জলে হুগলী নদীর নিম্নাংশেও নৌ-চলাচলের সুবিধা হইবে। কলিকাতা বন্দরও ইহাতে যথেষ্ট উপকৃত হইবে। প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে এবং ইহাতে দামোদর উপত্যকার ও কলিকাতার শিল্পাঞ্চলগুলির অনেক উন্নতি হইবে। জল নিয়ন্ত্রণের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবে। দুর্গাপুর হইতে যে খাল কাটা হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দরের অভ্যন্তরভাগ হইতে মালপত্র প্রেরণের সুবিধা হইবে। বাঁধগুলি বিশাল বিশাল জলাশয় সৃষ্টি করায় ঐগুলিতে মৎস্যের চাষ করা যাইবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা—ময়ূরাক্ষী নদীর উপর বিহারে ম্যাসেঞ্জোরে একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এখানে একটি জলবিদ্যুৎ যন্ত্রও বসান হইয়াছে। বর্তমানে এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। যন্ত্রটি পূর্ণ ক্ষমতায় চালু হইলে ইহা হইতে ৪,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। ময়ূরাক্ষীর আরও নিম্নপ্রবাহে সিউড়ী

শহর হইতে তিন মাইল দূরে তিলপাড়াতে একটি ব্যারেজ তৈয়ারী করা হইয়াছে। জমিতে জল সরবরাহের জন্য ইহার দুই পাশ হইতে দুইটি খাল কাটা হইয়াছে। ইহাতে বীরভূম জেলার প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে সেচের সুবিধা হইবে।

মহানদী পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনা অনুসারে মহানদীর উপর হিরাকুঁদ, তিক্কেরপাড়া এবং নারাজ এই তিন স্থানে তিনটি বাঁধ দেওয়া হইবে। বাঁধের কাজ প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে সম্বলপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রায় ১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের সুবিধা হইবে। এখানে দুইটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও স্থাপন করা হইবে। ইহারা মোট ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবে।

কুশী পরিকল্পনা—কুশী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া নেপাল ও বিহারের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা নদীতে পড়িয়াছে। এই নদী বন্যার জলে বহুবার উত্তর বিহারের ক্ষতির কারণ হইয়াছে। তাই ইহাকে 'বিহারের দুঃখের নদী' বলা হয়। তাই নেপালের ছত্রপথ নামক স্থানে কুশীর উপর একটি বাঁধ তৈয়ারী করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণই ইহার প্রধান কাজ, তবে জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাও ইহাতে থাকিবে।



১৫০নং চিত্র

ভাখ্‌রা ও নঙ্গল পরিকল্পনা—শতদ্রু নদীর উপর ভাখ্‌রা ও নঙ্গল নামক স্থানে দুইটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে পাঞ্জাব ও বিকানীরে মোট ৬৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের সুবিধা হইয়াছে। এখান হইতে প্রায় ৪ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

এই সকল ভিন্ন আরও অনেক নদী-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে **শোণ পরিকল্পনা, তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা, গোদাবরী পরিকল্পনা, নর্মদা ও তাপ্তী পরিকল্পনা** ও **গঙ্গা পরিকল্পনাই** প্রধান।

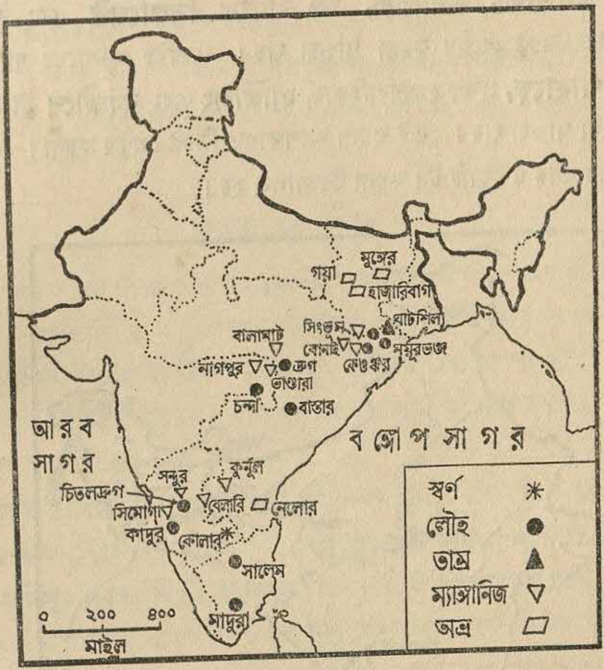
ভারতের খনিজ সম্পদ

ভারতে নানাবিধ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, কয়লা এবং স্বর্ণ ই প্রধান।

লৌহ—ভারতে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ পাওয়া যায়; তবে উৎপন্ন লৌহের পরিমাণ অন্যান্য সমৃদ্ধ দেশের তুলনায় অনেক কম। ভারতের সর্বত্রই অল্পবিস্তর লৌহ প্রস্তর পাওয়া যায়। তবে সবগুলি হইতে লৌহ উৎপাদন সম্ভব নয়। ভারতের আকরিক লৌহ নিম্নলিখিত অঞ্চলে পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের সিংভূম জেলার **গুয়া** ও **নোয়ামুণ্ডি**; উড়িষ্যার **কেওঞ্ঝর, বাদাম পাহাড়, গরুমহিষাণি, বোনাই পাহাড়**; মধ্যপ্রদেশের **চন্দা, বাস্তার, দ্রুগ, বিলাসপুর**; মহীশূরের **বাবাবুদান, তিপ্পুর, চিতলদ্রুগ,** মাদ্রাজের **সালেম, মাদুরা, আর্কট** এবং অন্ধ্র রাজ্যের **কুডাপ্পা** ও **কুর্ণুল** প্রভৃতি স্থানের খনি হইতেই বর্তমানে আকরিক লৌহ উঠান হইতেছে। বিহারেই সবচেয়ে বেশী লৌহ পাওয়া যায়। তারপর উড়িষ্যা, মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশের স্থান।

ম্যাঙ্গানিজ—ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য এই ধাতুর বিশেষ প্রয়োজন হয়। ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ মধ্যপ্রদেশের **বালাঘাট, চিন্দওয়ারা** এবং নবগঠিত বোম্বাই রাজ্যের **ভাণ্ডারা** ও **নাগপুর** প্রভৃতি খনি অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্ধ্ররাজ্যের **কুর্ণুল, বিশাখাপত্তনম্‌,** বোম্বাই রাজ্যের **পাঁচমহল, রত্নগিরি,** মহীশূর রাজ্যের **চিতলদ্রুগ, সিমোগা,**

বেলারি, উড়িষ্যার **গঙ্গাপুর**, **কোরাপুট** এবং বিহারের **সিংভুম** জেলায়ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ বিদেশে রপ্তানী হয়।



ভারতের খনিজ সম্পদ
১৫১নং চিত্র

অভ্র—অভ্র উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। ভারত হইতে প্রচুর অভ্র বিদেশে রপ্তানী হয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণেই অভ্রের অধিক ব্যবহার হয়। ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক অভ্র বিহারের **গয়া**, **হাজারিবাগ** ও **মুঙ্গের** জেলায় পাওয়া যায়। এ ছাড়া রাজস্থানের **আজমীঢ়-মাড়ওয়ার**, **উদয়পুর**, **কিষণগড়**, **জয়পুর**, **টঙ্ক** এবং অন্ধ্র রাজ্যের **নেলোর** ও **বিশাখাপত্তনমে**ও অভ্র পাওয়া যায়।

কয়লা—কয়লা সম্পদে ভারত বিশেষ সমৃদ্ধ নয়। পৃথিবীতে কয়লা উৎপাদনে ভারতের স্থান নবম। পশ্চিমবঙ্গের **রাণীগঞ্জ** এবং বিহারের **ঝরিয়া**, **গিরিডি**,

বোকারো, করণপুরা খনি হইতেই ভারতের অধিকাংশ কয়লা উত্তোলিত হয়। এ ছাড়া মধ্যপ্রদেশের **পেঞ্চ উপত্যকা, ছত্রিশগড়,** বৃহত্তর বোম্বাই রাজ্যের **ওয়ার্ধা উপত্যকা, উমারিয়া,** অন্ধ্র রাজ্যের **সিঙ্গারেণী** এবং উড়িষ্যার **রায়পুরে**ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আসামের **গারো** ও **খাসিয়া পাহাড়ে,** ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায়, **দার্জিলিং** এবং **কাশ্মীরে** টারশিয়ারী যুগের কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৪ কোটি টন কয়লা উত্তোলিত হয়।



ভারতের পেট্রোলিয়াম ও কয়লার খনি অঞ্চল
১৫২নং চিত্র

স্বর্ণ—ভারতে স্বর্ণ বেশী পাওয়া যায় না। ভারতে উৎপন্ন স্বর্ণের প্রায় সবটুকুই মহীশূরের **কোলার** স্বর্ণখনি হইতে পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়াম—খনিজ তৈল ভারতে খুব কম পাওয়া যায়। ভারতে

উৎপন্ন তৈল ভারতের চাহিদার এক-দশমাংশ মাত্র পূরণ করিতে পারে। আসামের **ডিগবয়** অঞ্চলেই খনিজ তৈলের প্রায় সবটুকু পাওয়া যায়। সম্প্রতি আসামের **নাহারকাটিয়া** অঞ্চলে তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এ ছাড়া ভারতে বিভিন্ন জাতীয় **খনিজ লবণ, তাম্র, বক্সাইট, ক্রোমাইট, ইলমেনাইট, মোনাজাইট,** রৌপ্য, সীসা, দস্তা, গন্ধক, টিন প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়।

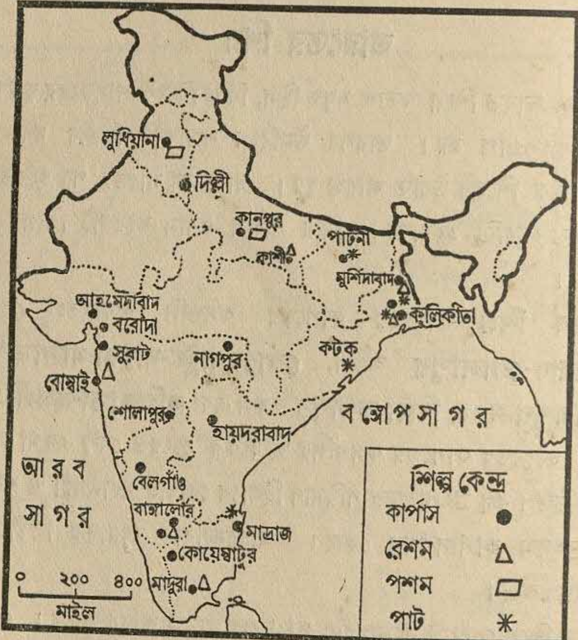
ভারতের শিল্প

এক সময়ে ভারত শিল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু বিদেশী শাসকদের কূট চক্রান্তে সেই শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে ভারতের যান্ত্রিক শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হয়। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে বিভিন্ন শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটি শিল্পের বিবরণ দেওয়া হইল।

বস্ত্রবয়ন শিল্প—ভারতের কাপড়ের কলগুলি প্রধানতঃ **বোম্বাই-আহমেদাবাদ-শোলাপুর** অঞ্চল, **কোয়েম্বাটুর-মাদুরা-মাদ্রাজ** অঞ্চল, **বেরার-নাগপুর** অঞ্চল, **দিল্লী-কানপুর** অঞ্চল এবং **কলিকাতা-হুগলী** অঞ্চলেই অবস্থিত। ভারতের কাপড়ের কলগুলির অর্ধেকের চেয়েও বেশী একমাত্র বোম্বাই রাজ্যে অবস্থিত। বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে বোম্বাই মহানগরী ও শহরতলীই ভারতের বৃহত্তম কার্পাস-শিল্প কেন্দ্র। আহমেদাবাদ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম কার্পাস-শিল্প কেন্দ্র।

বস্ত্রবয়ন শিল্পে বোম্বাই মহানগরীর প্রাধান্যের অনেক কারণ আছে। বোম্বাইএর জলবায়ু আর্দ্র, তাই উহা বস্ত্রবয়ন শিল্পের অনুকূল। বোম্বাই বন্দর দিয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উৎপন্ন কার্পাস বিদেশে রপ্তানী হয়। তাই এখানে সব সময়ই কার্পাস মজুত থাকে। তূলা আমদানী করার জন্য কাপড়ের কলের কর্তৃপক্ষদের একটুও মাথা ঘামাইতে বা অর্থব্যয় করিতে হয় না। বোম্বাই অতি উৎকৃষ্ট বন্দর এবং ভারতের অন্যান্য প্রধান বন্দরের তুলনায় ইহা হইতে ইউরোপের দূরত্ব অনেক কম। তাই বস্ত্রবয়নের যন্ত্রপাতি আমদানী করার পক্ষে বোম্বাইএর অবস্থান অন্যান্য

স্থানের চেয়ে অধিক অনুকূল। তাছাড়া এখান হইতে জলপথে অল্পব্যয়ে বিদেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে বস্ত্র ও সূতা পাঠাইবার যথেষ্ট সুবিধা আছে। বোম্বাই অঞ্চলে অন্যান্য বহু শিল্প ও শিল্পপতি থাকায় এখানে কাপড়ের কল তৈয়ারী করার মূলধনের কখনও অভাব হয় নাই। এখানে অনেক বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে। এইসকল হইতেও মূলধন পাওয়া যায়। বৃহৎ শিল্পাঞ্চল বলিয়া এখানে শ্রমিকের অভাবও নাই। নিকটে কোথাও কয়লা না থাকায় বোম্বাইএর কিছুটা অসুবিধা



ভারতের শিল্প
১৫৩নং চিত্র

ছিল। প্রথমদিকে বোম্বাইএর কলগুলিকে রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া হইতেও কয়লা আমদানী করিতে হইত। আজকাল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ায় এই অসুবিধা দূর হইয়াছে।

বোম্বাইএর মত আহমেদাবাদেও বস্ত্রশিল্পের অনুকূল অনেক সুবিধা আছে।

আহমেদাবাদ ভারতের অন্যতম প্রধান কার্পাস উৎপাদন অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তাই তুলা আমদানীর জন্য শিল্পপতিদের কোন অর্থব্যয় করিতে হয় না, এখানেও মূলধনের অভাব নাই। তাছাড়া বর্তমান যুগের যান্ত্রিক বস্ত্রবয়ন শিল্প চালু হওয়ার আগেও এই অঞ্চলে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র তৈয়ারী হইত। তাই এখানে অনেক নিপুণ শ্রমিকও ছিল। এছাড়া অন্যান্য অনেক অনুকূল পরিবেশও আহমেদাবাদে ছিল। সে সম্বন্ধে তোমরা বড় হইলে জানিতে পারিবে।

অতীতে ভারতের রেশমী বস্ত্রের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এখনও ভারতে তসর, এণ্ডি, মুগা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। রেশম শিল্পের কেন্দ্রের মধ্যে অমৃতসর, জলন্ধর, কাশী, মির্জাপুর, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ভাগলপুর, বাঙ্গালোর, পুনা এবং শ্রীনগরই প্রধান। আজকাল কৃত্রিম রেশম (রেওন) বস্ত্রের প্রচলন হওয়ায় এই শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

ভারতে পশমীবস্ত্র প্রস্তুতের কলগুলি প্রধানতঃ ধারিওয়াল, কানপুর, অমৃতসর, শ্রীনগর, বাঙ্গালোর, আগ্রা, মির্জাপুর শহরে অবস্থিত। কাশ্মীরের কুটিরশিল্পজাত শাল এবং আলোয়ানের চাহিদা খুব বেশী। বিকানীর রাজ্যেও অনেক পশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

পাট শিল্প—ভারতের পাটকলগুলির প্রায় সবই কলিকাতার নিকটে হুগলী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। উৎপাদন অঞ্চল হইতে নদীপথে অল্পব্যয়ে পাট আমদানী করার সুবিধা ছিল বলিয়া হুগলী নদীর উভয় পার্শ্বে অসংখ্য পাটকল গড়িয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতা বৃহৎ শিল্পাঞ্চল বলিয়া এখানে মূলধন ও শ্রমিকের প্রাচুর্যও ছিল। এখানকার পরিবহন ব্যবস্থাও অত্যন্ত উন্নত। তাছাড়া কলিকাতা বন্দর দিয়া যন্ত্রপাতি আমদানী ও পাট এবং চট ও চটের জিনিস রপ্তানীর সুবিধা ছিল। পাটকলগুলিতে ব্যবহার করার জন্য নিকটবর্তী রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাখনি অঞ্চল হইতে অল্পব্যয়ে অনায়াসে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এই সকল সুবিধা থাকায় হুগলী নদীর উভয় তীরে পাটশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। উত্তরে বাঁশবেড়িয়া হইতে দক্ষিণে বিড়লাপুরের মধ্যে হুগলী নদীর উভয় তীরে ১০৬টি পাটকল আছে। পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি পূর্ববঙ্গের পাট ব্যবহার করিত। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে পাট আমদানী করায় অনেক বিঘ্ন জন্মে। তাই

ভারতের পাট শিল্পের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। ভারতে এখন প্রচুর পাট উৎপন্ন হইতেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় পাট দেশের পাটকলগুলির চাহিদা মিটাইতে পারিবে।

শর্করা শিল্প—ভারতে প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয়। এই ইক্ষুর রস হইতে চিনি বা শর্করা প্রস্তুত করা হয়। ইক্ষু উৎপাদন অঞ্চলেই অধিকাংশ চিনির কল অবস্থিত। উত্তর বিহার এবং উত্তর প্রদেশই শর্করা শিল্পের প্রধান অঞ্চল। ইহার পরেই মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর স্থান। তা'ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব পাঞ্জাব এবং অন্ধ্ররাজ্যেও অনেকগুলি চিনির কল আছে। উত্তর প্রদেশের কানপুর, গোরক্ষপুর, লক্ষ্মৌ, এলাহাবাদ; বিহারের চম্পারণ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর; মাদ্রাজের কোয়েম্বাটুর; বোম্বাইএর বেলাপুর এবং পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসরই শর্করা শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

চা শিল্প—চা শিল্প ভারতের একটি প্রধান শিল্প। ভারত হইতে প্রতি বছর বহু চা বিদেশে রপ্তানী হয়। আমাদের দেশ হইতেই বিশ্বের বাজারে সবচেয়ে বেশী চা রপ্তানী হইয়া থাকে। যে অঞ্চলে চা বাগানগুলি অবস্থিত চা শিল্পও সেই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। প্রায় প্রত্যেক বাগানেই চা পাতা কাটার ও শুকাইবার ব্যবস্থা আছে। পাতাগুলি কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া চা পাতা প্রস্তুত করা হয়। আসাম উপত্যকা এবং উত্তর বঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা চা শিল্পের প্রধান অঞ্চল।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—জামসেদপুর বা টাটানগর লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বৃহত্তম কেন্দ্র। এখানেই টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ-এর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা অবস্থিত। লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য যে সকল কাঁচামাল প্রয়োজন হয় সেইগুলি অতি অল্পব্যয়ে এবং অনায়াসে জামসেদপুরে একত্রিত করা যায় বলিয়া এখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। জামসেদপুরের প্রায় ৫০ মাইলের মধ্যেই গরুমহিষানি, সলাইপাত, বাদামপাহাড় ও নোয়ামুণ্ডি খনি অঞ্চলে অতি উৎকৃষ্ট আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চল হইতে অনায়াসে আকরিক লৌহ একেবারে কারখানার ভিতরে লইয়া যাওয়া হয়। নোয়ামুণ্ডির প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। চূণা পাথর ও ডলোমাইট সিংভূম জেলা হইতে আসে। ঝরিয়া খনি হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোক

কয়লা পাওয়া যায়। রেল লাইন থাকায় পরিবহন ব্যবস্থাও ভাল হইয়াছে। সুবর্ণরেখা ও খড়খাই নদী থাকায় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থাও আছে। তাছাড়া ছোটনাগপুর ও নিকটবর্তী ছত্রিশগড় অঞ্চল হইতে অতি অল্প মূল্যে প্রচুর শ্রমিকও পাওয়া যায়। এই সকল সুবিধা থাকার জন্যই এখানে এত বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

আসানসোলের নিকটে বার্ণপুর ও কুলটিতে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ-এর কারখানাগুলি অবস্থিত। ইহা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র।

দক্ষিণ ভারতে মহীশূর রাজ্যের ভদ্রাবতীতে মহীশূর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস্ লিঃ-এর কারখানা অবস্থিত। ইহা বাবাবুদান পাহাড়ের আকরিক লৌহ ব্যবহার করে।

উপরোক্ত লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলিতে কড়ি, বরগা, রেলের পাত, রেলগাড়ীর চাকা, লোহার পাত, তার, পেরেক, ছোটখাটো কলকব্জা প্রভৃতি নানাবিধ জিনিস প্রস্তুত হয়। এই সকল কারখানা ভারতের চাহিদা পূরণ করিতে পারে না। তাই সম্প্রতি আরও তিনটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। উড়িষ্যার রৌরকেলা, মধ্য প্রদেশের ভিলাই (দ্রুগ জেলা) এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর—এই তিনটি স্থানে তিনটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহারা ভারতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

কাচ শিল্প—ভারতের প্রায় সর্বত্রই কাচের জিনিস তৈয়ারী করার কারখানা আছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই এবং উত্তর প্রদেশে কাচের কারখানা অধিক আছে।

কাগজ শিল্প—ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই (টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, রাণীগঞ্জ, নৈহাটি) সবচেয়ে বেশী কাগজ প্রস্তুত হয়। পশ্চিমবঙ্গের পর বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশের স্থান। এছাড়া অন্যান্য স্থানেও দুই একটি কাগজের কল আছে।

সিমেণ্ট—বিহার রাজ্যের ডালমিয়ানগরে ভারতের বৃহত্তম সিমেণ্ট কারখানা অবস্থিত। এ ছাড়া গুজরাট (দ্বারকা, পোরবন্দর, জামনগর), মধ্যপ্রদেশ (কাটনি, কাইমুর, গোয়ালিয়র), মাদ্রাজের ডালমিয়াপুর এবং অমৃতসর ও

সাহাবাদে সিমেণ্টের কারখানা আছে। এখনও ভারতকে বিদেশ হইতে সিমেণ্ট আমদানী করিতে হয়। তাই সরকারী সাহায্যে আরও কয়েকটি কারখানা স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।

জাহাজ, রেল ইঞ্জিন, বিমান ও মোটরগাড়ী নির্মাণ শিল্প—বিশাখাপত্তনমে স্টীমার ও জাহাজ, চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন, বাঙ্গালোরে বিমান, কানপুরে এবং কলিকাতার নিকটে উত্তরপাড়ায় মোটরগাড়ী নির্মাণের কারখানা আছে। বোম্বাই রাজ্যের কুর্লা এবং মাদ্রাজের এনোরেও মোটরগাড়ী প্রস্তুত হয়।

অ্যালুমিনিয়াম শিল্প—বিহারের মুরী এবং পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের নিকটে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুতের কারখানা আছে।

সিন্ধ্রিতে সার প্রস্তুতের একটি বিরাট কারখানা আছে। ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি শিল্পপ্রধান অঞ্চলে ছোটবড় রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই সকল শিল্প ভিন্ন ভারতে ছোটখাট আরও অনেক শিল্প আছে।

ভারতের লোকবসতি

ভারতের আয়তন ১,১৩৮,৮১৪ বর্গমাইল। ১৯৫১ সালের লোক-গণনা অনুযায়ী ইহার লোকসংখ্যা ৩৫৬,৮৯১,৬২৪।* এই হিসাবে ভারতে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ৩১৩ জন লোক বাস করে। ভারতের লোকবসতি সর্বত্র সমান নহে। লোকবসতির উপর দেশের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, কৃষি ও শিল্পের প্রভাব অতি সহজেই বোঝা যায়। ভূ-প্রকৃতি যেখানে সমতল সেখানে বেশী লোক বাস করে, আবার ভূ-প্রকৃতি যেখানে বন্ধুর তথায় লোকসংখ্যা কম। আসামের পার্বত্য অঞ্চলে, হিমালয়ের পার্বত্যভূমিতে, ছোটনাগপুরের পাহাড় অঞ্চলে লোকবসতি কম, অথচ নিকটবর্তী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও উত্তর ভারতের সমভূমিতে লোকবসতি কত ঘন। সমভূমির সর্বত্র বসতি সমান ঘন নয়। যেখানে জলবায়ু অনুকূল তথায় বেশী লোক এবং যেখানে জলবায়ু প্রতিকূল তথায় কম লোকের বাস। তাই পাঞ্জাব ও রাজস্থান হইতে বিহার ও উত্তর প্রদেশে লোকবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। তা'ছাড়া যেখানে কৃষিভূমি উর্বর সেখানে বসতি খুব ঘন। এজন্য দাক্ষিণাত্যের

*Statesman's Year-Book, 1955, p. 143.

মধ্যভাগ অপেক্ষা উপকূল ভাগে অধিক লোক বাস করে। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ঘনবসতি শিল্পাঞ্চলেই দেখিতে পাইবে।

১৯৫১ সালের লোক-গণনা অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোকসংখ্যা ও ঘনত্ব

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ভারতের রাজ্যগুলির সীমানার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের বিষয় পরে বলা হইয়াছে। ভারতে প্রতি দশ বৎসর পর পর লোক-গণনা করা হয়। ১৯৫১ সালেই সর্বশেষ লোক-গণনা হইয়াছে। এই লোক-গণনা অনুযায়ী বর্তমান ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোকবসতি কিরূপ তাহার একটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

রাজ্যের নাম	লোকসংখ্যা	প্রতি বর্গমাইলে কত লোক বাস করে
রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য		
আসাম	৯,১২৯,৪৪২	১৬৯
পশ্চিমবঙ্গ	২৬,১৬০,০০০	৭৮৬
বিহার	৩৮,৭৭৬,৮৬০	৫৭৭
উড়িষ্যা	১৪,৬৪৪,২৯৩	২৪৫
উত্তর প্রদেশ	৬৩,২৫৪,১১৮	৫৬২
পাঞ্জাব	১৬,০০০,০০০	৩৪৩
বোম্বাই	৪৮,২৬৫,১৭৪	২৫৪
মধ্যপ্রদেশ	২৬,১০০,০০০	১৫২
মাদ্রাজ	৩০,০০০,০০০	৫৯৮
অন্ধ্র	৩২,২০০,০০০	২৯২
জম্মু ও কাশ্মীর	৪,০২১,৬১৬*	৪৯
মহীশূর	১৯,০০০,০০০	২৬১
রাজস্থান	১৬,০০০,০০০	১২১
কেরল	১৩,৬০০,০০০	৯১৫

* ১৯৪১ সালের লোক-গণনা অনুসারে।

সিকিম রাজ্যের লোকসংখ্যা ১৩৫, ৬৪৬, এবং প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি ৪৯।

রাজ্যের নাম	লোকসংখ্যা	প্রতি বর্গমাইলে কত লোক বাস করে
কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত রাজ্য		
দিল্লী	১,৭৪৩,৯৯২	৩,০৩৮
হিমাচল প্রদেশ	৯৮৯,৪৩৭	৯৩
মণিপুর	৫৭৯,০৫৮	৬৭
ত্রিপুরা	৬৪৯,৯৩০	১৬১
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীঃ পুঃ	৩০,৯৬৩	১০
লাক্ষাদ্বীপ ও আমীনদ্বীপপুঞ্জ	২১,১৯৫	

ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা

ভারতের পরিবহন ব্যবস্থাকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন—**রাস্তা, জলপথ, রেলপথ** ও **বিমানপথ**।

রাস্তা—ভারতে প্রায় ৯৬,০০০ মাইল পাকা রাস্তা এবং ১,৪৬,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। দেশের আয়তনের তুলনায় ইহা খুবই কম। ভারতে বর্তমানে চারিটি ট্রাঙ্ক রোড আছে। প্রথমটি কলিকাতা হইতে দিল্লী হইয়া পাকিস্তানের পেশোয়ার পর্যন্ত গিয়াছে। ইহা **গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড** নামে পরিচিত। দ্বিতীয় পথ কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয় পথ মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই পর্যন্ত গিয়াছে এবং চতুর্থ বোম্বাই ও দিল্লীকে সংযুক্ত করিয়াছে। উভয় পার্শ্ব হইতে অসংখ্য কাঁচা-পাকা রাস্তা এই ট্রাঙ্ক রোডগুলিতে মিলিত হইয়াছে।

বর্তমানে ভারতীয় রাস্তাঘাটকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন—(১) জাতীয় রাজপথ (National Highways), (২) প্রাদেশিক রাজপথ (State Highways), (৩) জেলাবোর্ড রাস্তা (District Board Roads) এবং (৪) গ্রাম্য রাস্তা (Village Roads)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমস্ত পথঘাটের অনেক সম্প্রসারণ ঘটিবে।

জলপথ—জলপথগুলির মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রই প্রধান। ব্রহ্মপুত্র নদ মোহানা হইতে ডিব্রুগড় পর্যন্ত স্টীমার ও নৌকা চলাচলের উপযোগী। গঙ্গা নদীতেও মোহানা হইতে কানপুর পর্যন্ত ছোট স্টীমার চলাচল করিতে পারে।

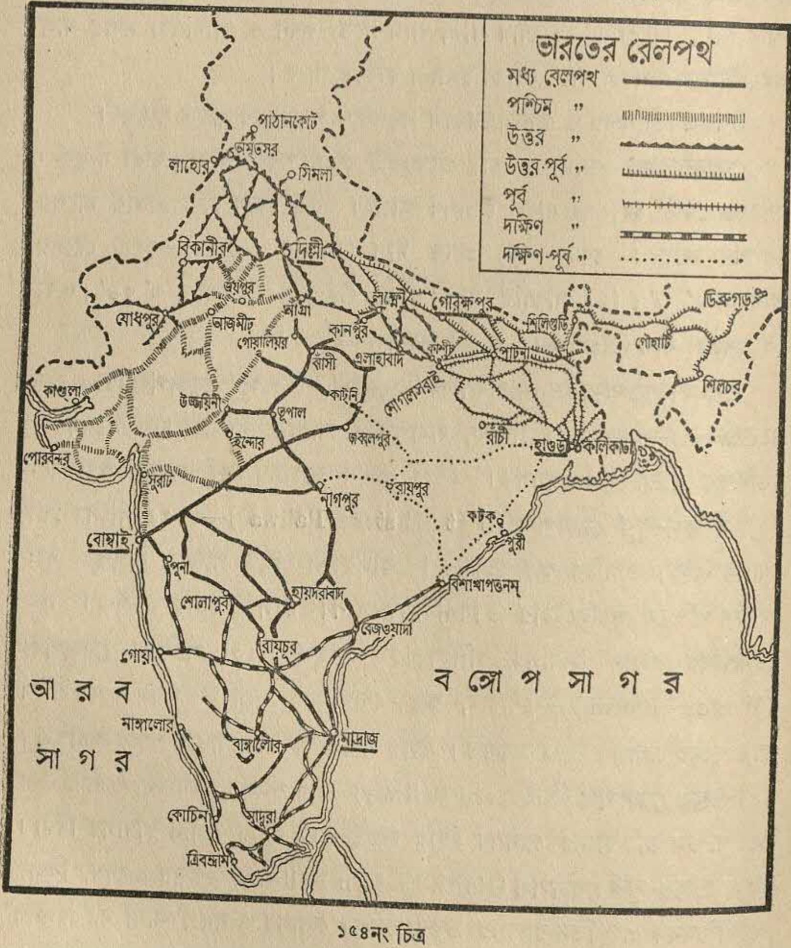
হরিদ্বার পর্যন্ত নৌকা চলাচল করে। দাক্ষিণাত্যের নদীগুলির নিম্নাংশ নাব্য। নৌ-চলাচলের উপযোগী খালের সংখ্যা এদেশে খুব বেশী নয়। খালের মধ্যে পূর্ব পাঞ্জাবে যমুনা ও সিরহিন্দ্ খাল, উত্তর প্রদেশে গঙ্গার খাল, বিহারে শোণ নদীর খাল, উড়িষ্যায় মহানদীর খাল, দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর খাল এবং উড়িষ্যা-উপকূল-খালে নৌকা চলাচল করিতে পারে।

উপকূলবর্তী বন্দর ও পোতাশ্রয়গুলি সমুদ্রপথে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত।

রেলপথ—ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান শহর রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। ভারতে মোট ৩৫,২৭৫ মাইল রেলপথ আছে। এই দেশে তিন প্রকার মাপের রেলপথ আছে। যেমন—(১) প্রশস্ত মাপ (Broad Gauge)—দুইটি রেলের ব্যবধান ৫′ ৬″; (২) মাঝারি মাপ (Metre Gauge)—ব্যবধান ৩′ ৩⅜″; এবং (৩) সঙ্কীর্ণ মাপ (Narrow Gauge)—ব্যবধান ২′ ৬″।

রেলপথের আঞ্চলিক বিন্যাস—(১) **পূর্ব রেলপথ** (Eastern Railway)—হাওড়া, শিয়ালদহ, দানাপুর ও আসানসোল এই চারিটি রেলওয়ে ডিভিসন লইয়া পূর্ব রেলপথ। ইহার প্রধান কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত। (২) **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ** (South-Eastern Railway)—১৯৫৫ সালের ১লা আগষ্ট এই বিভাগটির সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতা হইতে পশ্চিমে নাগপুর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ওয়ালটেয়ার ও বিশাখাপত্তনম্ পর্যন্ত রেলপথ ইহার অন্তর্গত। এই রেলপথের প্রধান কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত। (৩) **পশ্চিম রেলপথ** (Western Railway)—সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, বোম্বাই রাজ্যের উত্তরভাগ এবং দক্ষিণ রাজস্থানের রেলপথ ইহার অন্তর্গত। ইহার প্রধান কার্যালয় বোম্বাই শহরে অবস্থিত। (৪) **উত্তর রেলপথ** (Northern Railway)—পূর্ব পাঞ্জাব, হিমাচল, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম রাজস্থানের রেলপথ ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রধান কার্যালয় দিল্লী। (৫) **উত্তর-পূর্ব রেলপথ** (North-Eastern Railway)—উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ এই তিন রাজ্যের উত্তর ভাগের রেলপথ ও সমগ্র আসামের রেলপথ ইহার অন্তর্গত। ইহার প্রধান কার্যালয় উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর। (৬) **মধ্য রেলপথ** (Central Railway)—বোম্বাই রাজ্যের মধ্য ভাগ, মধ্য প্রদেশের পশ্চিম ভাগ, মধ্য ভারতের অধিকাংশ এবং অন্ধ্র রাজ্যের পশ্চিম দিকের রেলপথ

লইয়া ইহা গঠিত। বোম্বাই ইহার প্রধান কার্যালয়। (৭) **দক্ষিণ রেলপথ** (Southern Railway)—মহীশূর, কেরল (ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন) এবং মাদ্রাজের দক্ষিণাংশের রেলপথ ইহার অন্তর্গত। ইহার প্রধান কার্যালয় মাদ্রাজ।



১৫৪নং চিত্র

প্রত্যেক রেলপথের বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তোমরা উপরের রেলপথের মানচিত্রটি ভালভাবে লক্ষ্য করিলে প্রত্যেক রেলপথের বিস্তৃতি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

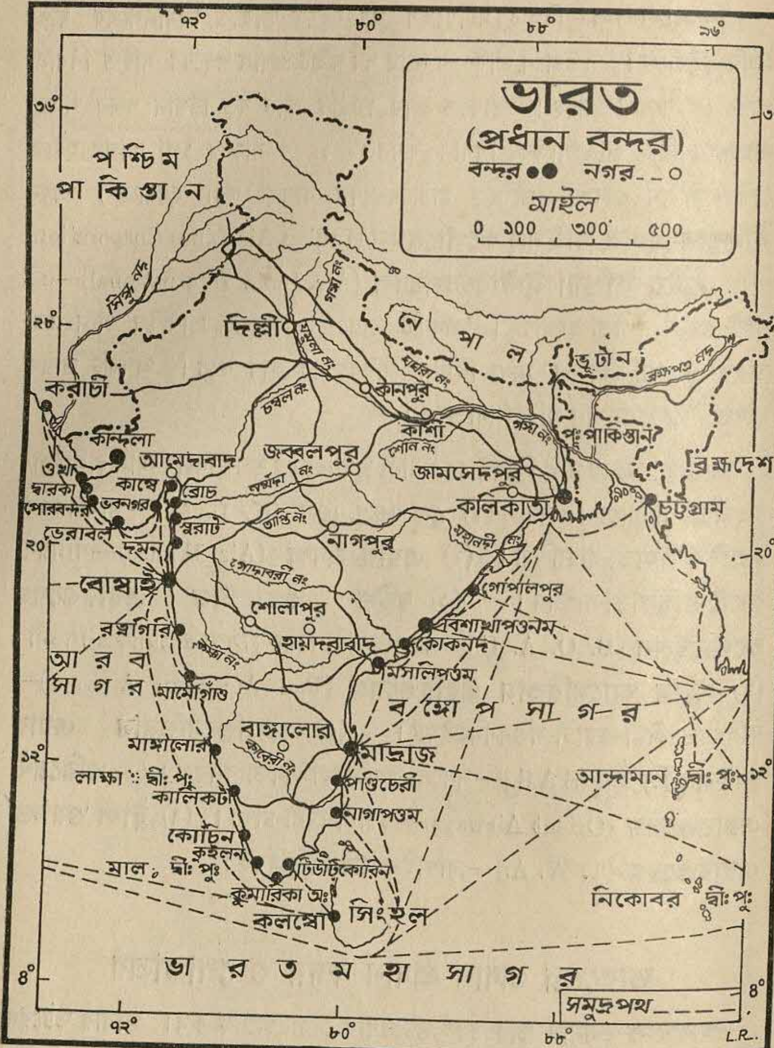
বিমানপথ—বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতে বিমানপথের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। বর্তমানে ভারতের প্রায় সব কয়টি প্রধান শহরের সহিত বিমান-পথের যোগাযোগ আছে। ভারতে প্রায় ১৪৪টি ছোট বড় বিমান বন্দর আছে, তন্মধ্যে চারিটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। ১৯৫৩ সালের ১লা আগষ্ট হইতে দেশীয় বিমান কোম্পানীগুলিকে রাষ্ট্রীয়করণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখন **ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশন** (Indian Air Lines Corporation) এবং **এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশন্যাল** (Air India International)—এই দুইটি প্রতিষ্ঠান গড়া হইয়াছে। প্রথমটি ভারতের অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিমান পরিবহনের কার্য করে। অপরটি ভারত হইতে বিদেশে বিমান পরিচালনা করে।

এ ছাড়া অনেকগুলি বিদেশী কোম্পানীও ভারতের উপর দিয়া বিমান চালাইবার অনুমতি পাইয়াছে। যথা—(১) **কে. এল্. এম.** (K. L. M.)—আমষ্টারডম-করাচী-কলিকাতা-বাটাভিয়া। (২) **এয়ার ফ্রান্স** (Air France)—প্যারিস-করাচী-কলিকাতা-সাইগন। (৩) **বৃটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন** (B. O. A. C.)—লণ্ডন-করাচী-দিল্লী-কলিকাতা-টোকিও-সিডনী। (৪) **প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ** (Pan American Airways)—কলিকাতা-দিল্লী-করাচী-লণ্ডন-নিউইয়র্ক। (৫) **স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান এয়ার লাইনস্ সিষ্টেম্** (S.A.S.)—অসলো-করাচী-কলিকাতা-ব্যাঙ্কক। (৬) **ওরিয়েণ্ট এয়ারওয়েজ** (Orient Airways)—করাচী-দিল্লী-ঢাকা। (৭) **ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ** (T. W. A.)—বোম্বাই-প্যারিস-নিউইয়র্ক।

ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও পোতাশ্রয়

আয়তনের তুলনায় ভারতের তটরেখার দৈর্ঘ্য অনেক কম। আবার তটরেখা অভগ্ন বলিয়া বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা আরও কম।

কলিকাতা—সমুদ্র হইতে ৮০ মাইল দূরে হুগলী নদীর বাম তীরে অবস্থিত কলিকাতা ভারতের বৃহত্তম বন্দর ও নগর। হুগলী নদীর মুখে বালি জমে।



১৫৫নং চিত্র

তাই ড্রেজারের সাহায্যে এই বালি পরিষ্কার করিয়া নদীমুখকে জাহাজ চলাচলের উপযোগী রাখিতে হয়। হুগলী নদী অগভীর বলিয়া জোয়ারের সময় ভিন্ন বড়

জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না। সমগ্র পূর্ব ভারত এবং উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানের মালপত্র এই বন্দর দিয়া আমদানী-রপ্তানী করা হয়।

বিশাখাপত্তনম্—কলিকাতা হইতে ৫৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশাখাপত্তনম্ বন্দর। ইহা একটি উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। এখানে জাহাজ নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই বন্দরের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এই বন্দর দিয়া তৈলবীজ, কাষ্ঠ ও ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানী হয়।



বিশাখাপত্তনম্ বন্দরের অবস্থান

১৫৬নং চিত্র

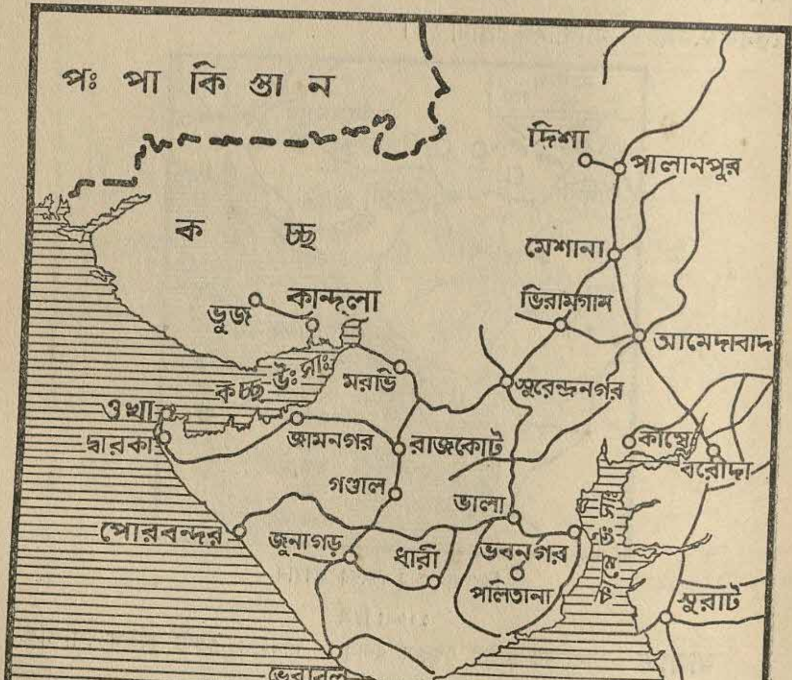
মাদ্রাজ—ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর। এখানে একটি কৃত্রিম পোতাশ্রয় তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। এই বন্দর দিয়া তামাক, চীনাবাদাম, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, কফি ও চামড়া রপ্তানী হয়।

এই তিনটি বন্দর ছাড়া পূর্ব উপকূলে আরও কয়েকটি বন্দর আছে। তন্মধ্যে **পণ্ডিচেরী, নাগাপত্তম্** ও **টিউটিকোরিণের** নাম করা যাইতে পারে।

বোম্বাই—ভারতের পশ্চিম উপকূলের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ও পোতাশ্রয়। ইহা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর ও নগর। ইহা একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত। এই বন্দর দিয়া পশ্চিম ভারতের সব এবং দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ মালপত্র আমদানী

রপ্তানী হইয়া থাকে। ভারত হইতে বিদেশ যাওয়ার যাত্রিবাহী জাহাজ এই বন্দর হইতেই ছাড়ে।

কান্দলা—কচ্ছ উপসাগরের পূর্বে কান্দলা নামক সমুদ্র-খাড়ির পার্শ্বে এই বন্দর অবস্থিত। এই বন্দর নির্মাণের কাজ এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। এই বন্দর চালু হইলে বোম্বাই বন্দরের চাপ অনেকটা কমিবে।



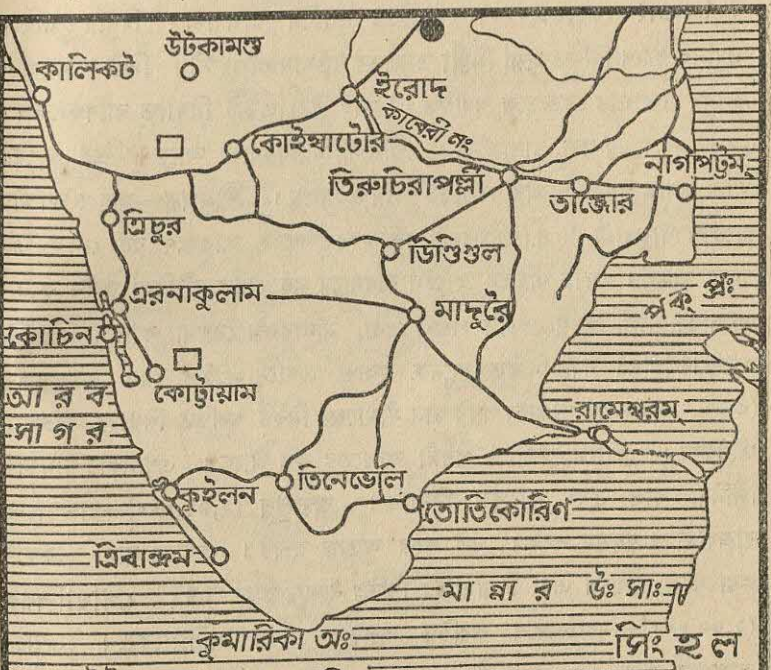
কান্দলা ও ওখা বন্দরের অবস্থান
১৫৭নং চিত্র

ওখা—কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত তৈল আমদানীর বন্দর। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস ও তৈলবীজই প্রধান।

এ ছাড়া সৌরাষ্ট্রে **ভবনগর** ও **পোরবন্দর** নামে আরও দুইটি উৎকৃষ্ট বন্দর

আছে। পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য বন্দরের মধ্যে **সুরাট, ম্যাঙ্গালোর, কালিকট** ও **কোচিন** প্রধান।

পশ্চিম উপকূলের সুরাট অতি প্রাচীন নদী-বন্দর। অতীতে ইহা অত্যন্ত সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। সে যুগের ছোট ছোট বাণিজ্য জাহাজ অনায়াসে নদীমুখ দিয়া বন্দরে



দক্ষিণ ভারতের বন্দর

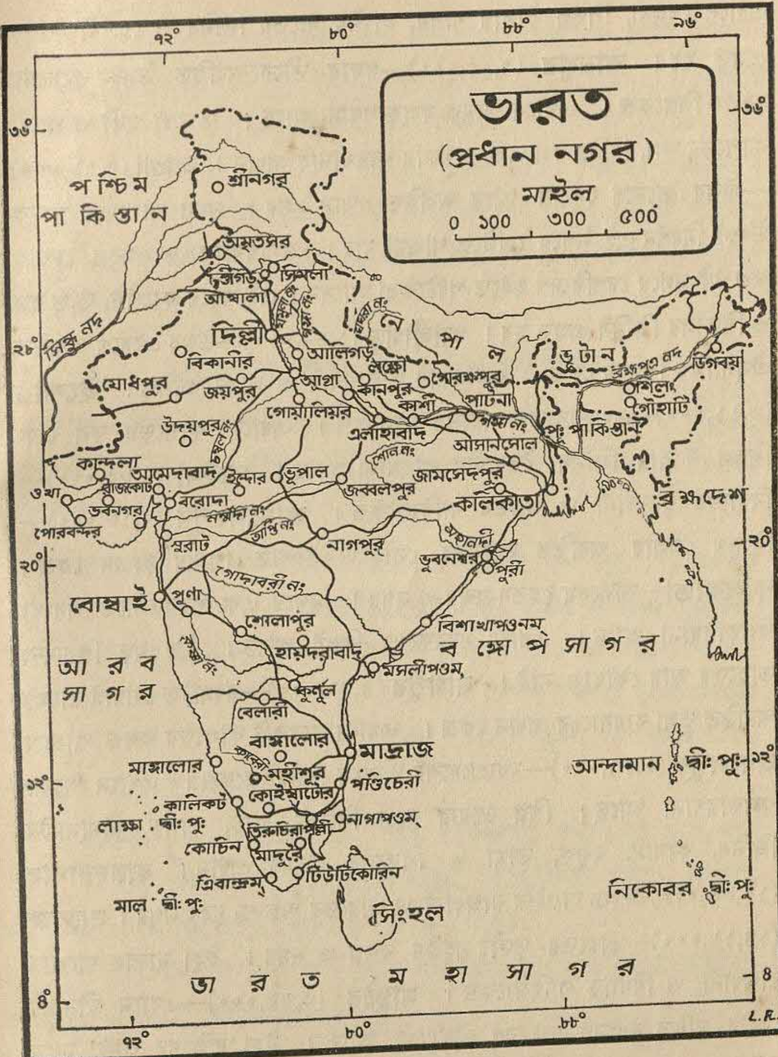
১৫৮নং চিত্র

প্রবেশ করিতে পারিত। বর্তমান কালের জাহাজগুলি অনেক বড়, তাছাড়া চড়া পড়িয়া নদীমুখও অগভীর হইয়া গিয়াছে। তাই সুরাট বন্দরে আর সমুদ্রের জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না। বন্দরের প্রাচীন সমৃদ্ধিও এখন আর নাই।

পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য বন্দরের মধ্যে **ম্যাঙ্গালোর, কালিকট** ও **কোচিন** প্রধান।

ভারতের প্রধান প্রধান নগর

দিল্লী (১১,৯১,০০০)—ভারতের প্রাচীন রাজধানী। দিল্লীর বাহিরে আধুনিক ধরণে নির্মিত **নয়া দিল্লী** ভারতের বর্তমান রাজধানী। দিল্লী অনেকগুলি রেলপথ ও রাস্তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তাই ইহা একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে কাপড়ের কল, রাসায়নিক ও পেনিসিলিন কারখানা আছে। এই শহরের সোনা-রূপার গহনা ও জরি কাপড়ের খ্যাতি আছে। **শ্রীনগর**—জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে বহু লোক এই শহরে আসে। তাই এখানে হোটেল ব্যবসায়ে বহু লোক জীবিকা অর্জন করে। তা'ছাড়া শাল, কম্বল প্রভৃতি পশমী দ্রব্য, নানারকম রেশমী কাপড়, কার্পেট, কারুকার্য-বিশিষ্ট কাষ্ঠ-নির্মিত অনেক দ্রব্যও এখানে প্রস্তুত হয়। **অমৃতসর** (৩,২৬,০০০)—পূর্ব পাঞ্জাবে পাকিস্তান সীমান্তের নিকট অবস্থিত শিখদের সর্বপ্রধান তীর্থস্থান। এখানে সূতী ও পশমী কাপড়ের কল আছে। এখানকার চামড়ার জিনিস, শাল এবং কার্পেট বিখ্যাত। **জয়পুর** (২,৯১,০০০)—রাজস্থানের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। এই শহর অত্যন্ত সুন্দর। এখানে নানা কারুকার্য করা কাঁসা, পিতল এবং চীনামাটির বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হয়। **গোয়ালিয়র** (২,৪২,০০০)—মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে কাপড়ের কল এবং চীনামাটির বাসন তৈয়ারীর কারখানা আছে। **লক্ষ্ণৌ** (৪,৯৭,০০০)—উত্তর প্রদেশের রাজধানী এবং অযোধ্যার কৃষিজ দ্রব্যের প্রধান বাণিজ্য স্থান। সোনা, রূপা, কাঠ এবং হাতীর দাঁতের সূক্ষ্ম কাজের জন্য এই শহরের খ্যাতি আছে। **এলাহাবাদ** (৩,৩২,০০০)—উত্তর প্রদেশে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এলাহাবাদ বা প্রয়াগ হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। এখানে কুম্ভমেলা উপলক্ষে অনেক যাত্রীর সমাবেশ হয়। এখানে কাচের কারখানা, তেল এবং আটা-ময়দার কল আছে। ইহা উত্তর প্রদেশের অন্যতম প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। **বারাণসী বা কাশী** (৩,৫৬,০০০)—উত্তর প্রদেশে গঙ্গার তীরে অবস্থিত হিন্দুদের



১৫৯নং চিত্র

সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান ও অতি প্রাচীন নগর। তীর্থ উপলক্ষে এখানে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। ইহা হিন্দুশাস্ত্র ও সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।

এখানে খেলনা, পিতল কাঁসার বাসন, হাতীর দাঁতের জিনিস ও রেশমী কাপড় প্রস্তুত হয়। **কানপুর** (৭,০৫,০০০)—গঙ্গার তীরে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র। এখানে অনেক কলকারখানা আছে। তন্মধ্যে সূতী ও পশমী কাপড়ের কল, চিনির কল এবং চামড়ার কারখানাই প্রধান। **আগ্রা** (৩,৭৬,০০০) —উত্তর প্রদেশে যমুনার তীরে অবস্থিত প্রধান নগর। মুঘল স্থাপত্যের অনেক উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই নগরে দেখিতে পাওয়া যায়। জগদ্বিখ্যাত তাজমহল দেখার জন্য এই নগরে দেশবিদেশ হইতে পর্যটকেরা আসেন। এই শহরে কার্পেট, তাঁত বস্ত্র ও পিতলের জিনিস প্রস্তুত হয়। **আলীগড়** (১,৪২,০০০)—উত্তর প্রদেশে অবস্থিত ঐস্লামিক শিক্ষার কেন্দ্র। এখানকার তালা-চাবি ও মাখন প্রসিদ্ধ। **ইন্দোর** (৩,১১,০০০)—মধ্যভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র। এখানে কাপড়ের কল এবং পিতল কাঁসার জিনিস তৈয়ারীর কারখানা আছে। **পাটনা** (২,৮৩,০০০)—বিহারের রাজধানী ও অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। **জামসেদপুর** (২,১৮,০০০)—সিংভূম জেলায় অবস্থিত ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বৃহত্তম কেন্দ্র। **কলিকাতা**—ভারতের বৃহত্তম বন্দর ও নগর। নগরে এবং শহরতলীতে অসংখ্য কলকারখানা আছে। এখানে সবরকমের শিল্পই আছে। এত বড় শিল্পাঞ্চল ভারতের আর কোথাও নাই। **নাগপুর** (৪,৪৯,০০০)—নবগঠিত বোম্বাই রাজ্যে অবস্থিত তূলা ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। এখানে কয়েকটি কাপড়ের কলও আছে। **জব্বলপুর** (২,৫৭,০০০)—মধ্যপ্রদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র। এখানে অনেক কলকারখানা আছে। শিল্প দ্রব্যের মধ্যে সিমেণ্ট, কাচ, কাপড়, চীনামাটির জিনিস, কামান, বন্দুক, তামা ও পিতলের বাসনই প্রধান। **হায়দরাবাদ** (১০,৮৬,০০০)—অন্ধ্র রাজ্যের রাজধানী ও ভারতের অন্যতম বৃহৎ নগর। **মাদ্রাজ** (১৪,১৬,০০০)—ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর ও নগর। ইহা মাদ্রাজ রাজ্যের রাজধানী ও বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। **মাদুরৈ** (৩,৬২,০০০)—এখানে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির দর্শনের জন্য বহু তীর্থযাত্রী আসে। ইহা 'দক্ষিণের কাশী' নামে পরিচিত। এখানে সূতী ও রেশমী বস্ত্রের কল আছে। **কোইম্বাটুর** (১,৯৮,০০০) —মাদ্রাজ রাজ্যে অবস্থিত, বস্ত্র ও শর্করা শিল্পের জন্য বিখ্যাত। **বাঙ্গালোর** (৭,৭৯,০০০)—মহীশূর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। শিল্পের মধ্যে

কার্পাস, রেশম, মৃৎপাত্র, সাবান, তৈল, বিমান ও রাসায়নিক শিল্পই প্রধান। **মহীশূর** (২,৪৪,০০০)—মহীশূর রাজ্যের রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **শোলাপুর** (২,৬৬,০০০)—বোম্বাই রাজ্যে অবস্থিত তূলা ব্যবসায়ের ও কার্পাস শিল্পের কেন্দ্র। **বোম্বাই** (২৮,৩৯,০০০)—ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর, বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। এখানে অনেক কলকারখানা আছে। এর মধ্যে কাপড়ের কলের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। **আহমেদাবাদ** (৭,৮৮,০০০)—বোম্বাই রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও কার্পাস শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

ভারতের আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্য

ভারত হইতে বিদেশে কাঁচা মালই বেশী রপ্তানী হইত এবং ভারত শিল্পদ্রব্য আমদানী করিত। দেশে শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যেরও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

আমদানী দ্রব্য—ইংলণ্ড, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডা হইতে **যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ী, রেল ইঞ্জিন, মোটর-গাড়ী, জাহাজ, বিমান, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ** ও **কাচের জিনিস** ও **কাগজ**ই প্রধান আমদানী দ্রব্য। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে **খনিজ তৈল,** যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, সুদান এবং পাকিস্তান হইতে **তুলা** এবং মালয় হইতে **রবার** আমদানী করা হয়।

রপ্তানী দ্রব্য—রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে **পাট-জাত দ্রব্য** (চট, থলে, বস্তা ইত্যাদি), **চা, পশম, চামড়া, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, মশলা, তামাক** এবং **নারিকেল ছোবড়ার জিনিস**ই প্রধান।

মূল্য হিসাবে ধরিতে গেলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের সহিতই ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য সবচেয়ে বেশী হয়।

রাজ্য পুনর্গঠন ও ভারতের নূতন রাষ্ট্রীয় রূপ

রাজ্য পুনর্গঠন ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর দিনটি ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া

থাকিবে। এই দিন হইতেই ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের ব্যাপার লইয়া এতদিন যে জল্পনা কল্পনা, দ্বন্দ্ব বিবাদ এবং আন্দোলন চলিতেছিল এই দিন হইতেই সেই সবের অবসান ঘটিয়াছে। তাছাড়া প্রাক্তন করদরাজ্য এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে যে সামান্যতম শাসনতান্ত্রিক ব্যবধান ছিল তাহাও ঐ দিন হইতে ঘুচিয়া গিয়াছে।

রাজ্য পুনর্গঠনের গোড়ার কথা তোমাদের অনেকেরই হয়ত জানা নাই। তাই অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইতেছে।

১৯২০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এর পর হইতে জাতীয় কংগ্রেস বরাবরই জনগণকে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতেছেন। ইংরাজ আমলে এই রাজ্য পুনর্গঠন সম্ভব হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর বহুদিনের এই আশাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য জনসাধারণ ব্যগ্র হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার দুইটি কমিটি (Dar Committee এবং J.V.P Committee) নিয়োগ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বাস্তহারাদের সমস্যায় কেন্দ্রীয় সরকার তখন জর্জরিত। তাই আইন ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় উভয় কমিটিই এই বিষয়টি তখনকার মত স্থগিত রাখিতে উপদেশ দেন। মাদ্রাজের তেলেগু ভাষাভাষীদের তীব্র আন্দোলনের ফলে মাদ্রাজের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চলকে পৃথক করিয়া ১৯৫৩ সালের ১লা অক্টোবর অন্ধ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর পর হইতেই ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠে। তাই ভারতের প্রধান মন্ত্রী ১৯৫৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। একমাত্র ভাষাকেই ভিত্তি না করিয়া শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সর্বোপরি জাতীয় ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজ্যগুলির সীমানা কি ভাবে পরিবর্তন করা যায় তাহা বিবেচনা করার ভারই কমিশনকে দেওয়া হয়। কমিশন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন এবং অসংখ্য নেতৃস্থানীয় লোকের সংগে আলাপ আলোচনা ও তাহাদের মতামত লিপিবদ্ধ করেন। তাছাড়া বহুশত প্রতিষ্ঠানের স্মারকলিপিও গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কমিশন উহার মতামত পেশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইহা ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেন। পরে কমিশনের প্রস্তাবিত সীমানার অনেকটা রদবদল করিয়া পার্লামেন্টে রাজ্যপুনর্গঠন আইন পাশ হয়। ইহা ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে কার্যকরী হইয়াছে। তাই এই দিন হইতে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রেরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

ভারতের রাজ্যগুলির পরিবর্তন পর পর কিভাবে ঘটিয়াছে তাহা বলিতেছি। ইংরাজদের ভারত ত্যাগ করার সময়ে ভারতবর্ষে ৩টি প্রেসিডেন্সী প্রদেশ (যেমন—বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশ), ৮টি প্রদেশ (যেমন আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, ও মধ্যপ্রদেশ), এবং ছোট বড় ছয় শতাধিক দেশীয় রাজ্য ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়। তখন ভারতে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় ৬০০ দেশীয় রাজ্য এবং

৯টি প্রদেশ (আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশ) ছিল। কিছুদিন পর দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটে। ইহাদের মধ্যে বড়গুলিকে (যেমন—হায়দরাবাদ, মহীশূর ইত্যাদি) পৃথক প্রদেশ বা রাজ্যে পরিণত করা হয়। ছোট ছোট অনেকগুলি রাজ্যকে একত্রিত করিয়া রাজ্যসমবায় গঠন করা হয়। এইভাবে পরিবর্তন করার পর ভারতের রাজ্যগুলিকে নিম্নোক্তভাবে সাজান হয়।

'ক' শ্রেণীর রাজ্য (Part A States)

১। আসাম, ২। পশ্চিমবঙ্গ, ৩। বিহার, ৪। উড়িষ্যা, ৫। উত্তর প্রদেশ, ৬। পাঞ্জাব, ৭। বোম্বাই, ৮। মধ্যপ্রদেশ, ৯। মাদ্রাজ, ১০। অন্ধ্র।

'খ' শ্রেণীর রাজ্য (Part B States)

১। হায়দরাবাদ, ২। জম্মু ও কাশ্মীর, ৩। মধ্যভারত, ৪। মহীশূর, ৫। পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য সমবায় (পেপসু—PEPSU), ৬। রাজস্থান ইউনিয়ন, ৭। সৌরাষ্ট্র, ৮। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন।

'গ' শ্রেণীর রাজ্য (Part C States)

১। আজমীঢ়, ২। ভূপাল, ৩। বিলাসপুর, ৪। কুর্গ, ৫। দিল্লী, ৬। হিমাচল প্রদেশ, ৭। কচ্ছ, ৮। মণিপুর, ৯। ত্রিপুরা, ১০। বিন্ধ্য প্রদেশ।

'ঘ' শ্রেণীর রাজ্য ও আশ্রিত রাজ্য (Part D States and other territories)

১। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ২। সিকিম[১]।

রাজ্য পুনর্গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো উক্তরূপই ছিল।

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ভারতের রাজ্যগুলির সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন ভারতকে ১৪টি রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যে এবং ৬টি কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত রাজ্যে, এই মোট ২০টি রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক বিভাগগুলি নিম্নোক্তরূপ হইয়াছে।

[১] আশ্রিত রাজ্য।

রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য—

রাজ্যের নাম	রাজধানী	রাজ্যের নাম	রাজধানী
১। আসাম	শিলং	৮। বোম্বাই	বোম্বাই
২। পশ্চিমবঙ্গ	কলিকাতা	৯। মহীশূর	মহীশূর
৩। বিহার	পাটনা	১০। কেরল	ত্রিবান্দ্রম্
৪। উড়িষ্যা	ভুবনেশ্বর	১১। মাদ্রাজ	মাদ্রাজ
৫। উত্তরপ্রদেশ	লক্ষ্ণৌ	১২। অন্ধ্র	হায়দরাবাদ
৬। পাঞ্জাব	চণ্ডীগড়	১৩। মধ্যপ্রদেশ	ভূপাল
৭। রাজস্থান	জয়পুর	১৪। জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর

কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত রাজ্য—

রাজ্যের নাম	রাজধানী
১। হিমাচলপ্রদেশ	সিমলা
২। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	পোর্টব্লেয়ার
৩। মণিপুর	ইম্ফল
৪। ত্রিপুরা	আগরতলা
৫। দিল্লী	দিল্লী
৬। আমীন দ্বীপ ও লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ	

শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য লইয়া কতকগুলি আঞ্চলিক বিভাগ করা হইয়াছে। যেমন—

(ক) **পশ্চিম অঞ্চল**—বোম্বাই ও মহীশূর।

(খ) **উত্তর অঞ্চল**—রাজস্থান, পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর।

(গ) **মধ্য অঞ্চল**—মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ।

(ঘ) **পূর্ব অঞ্চল**—বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম।

(ঙ) **দক্ষিণ অঞ্চল**—কেরল, মাদ্রাজ ও অন্ধ্র।

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির সীমানারই অধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে—

(১) প্রাক্তন নিজাম-শাসিত হায়দরাবাদ রাজ্যের পৃথক অস্তিত্ব চিরতরে লোপ পাইয়াছে। এই রাজ্যের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল অন্ধ্র রাজ্যের, মারাঠা ভাষাভাষী অঞ্চল বোম্বাই রাজ্যের এবং অবশিষ্ট অংশ মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(২) বোম্বাই, অন্ধ্র, মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশের আয়তন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৩) প্রাক্তন কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র রাজ্য সম্পূর্ণ এবং প্রাক্তন মধ্যপ্রদেশ ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মারাঠা ভাষাভাষী অঞ্চল বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এমন কি পূর্বতন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুর শহরও বোম্বাই রাজ্যের সীমানার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে।

(৪) প্রাক্তন মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্রদেশ ও ভুপাল রাজ্যের প্রায় সবটুকুই মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(৫) পূর্বতন বোম্বাই রাজ্যের চারিটি জেলা, হায়দরাবাদের তিনটি জেলা, কুর্গরাজ্য এবং মাদ্রাজের কিছুটা অংশ মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

(৬) হায়দরাবাদের আটটি জেলা অন্ধ্ররাজ্যের মধ্যে আসিয়াছে।

(৭) পেপসু বলিয়া স্বতন্ত্র কোন রাজ্য রহিল না; সবকয়টা রাজ্যই এখন পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(৮) বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমার কতক অংশ এবং মানভূম জেলার পুরুলিয়া মহকুমার প্রায় সবটুকু (তিনটি থানা বাদে) পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ভাগের সহিত দক্ষিণ ভাগের সংযোগ সাধিত হইয়াছে।

(৯) আসাম, উড়িষ্যা, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ও উত্তরপ্রদেশের সীমানা ও আয়তনের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

(১০) ত্রিপুরা, মণিপুর, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রাজ্যেরও কোন পরিবর্তন হয় নাই।

ভারতের রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পাঞ্জাব—ইহা পশ্চিম পাকিস্তান এবং যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত। ইহার উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীর, দক্ষিণে রাজস্থান, পূর্বে উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমে



১৬০নং চিত্র

পশ্চিম পাকিস্তান। পাতিয়ালা ও পূর্বপাঞ্জাব রাজ্য সমবায়ের সবটুকুই এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহার আয়তন ৪৬,৬১৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা

প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ। অধিবাসীদের প্রায় শতকরা ৬৬ ভাগ হিন্দু ও প্রায় ৩১ ভাগ শিখ।

পাঞ্জাবকে তিনটি প্রাকৃতিক ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—(১) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল**—হিমালয় পর্বতের পাদদেশের পাহাড় লইয়া ইহা গঠিত। (২) **উত্তরের আর্দ্র সমভূমি**—ইহা পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণেই অবস্থিত। এখানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। জলসেচ ছাড়াও এখানকার কোন কোন স্থানে কৃষিকার্য করা সম্ভব। (৩) **দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক সমভূমি**—জলসেচ ভিন্ন এখানে চাষ অসম্ভব।

কৃষিকার্যের জন্য পাঞ্জাবে অনেক খাল আছে। ইহাদের বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে **গম, যব, ভুট্টা, সরিষা, বাজরা, ধান্য** ও **ইক্ষুই** প্রধান। কাংড়া উপত্যকায় **চা** জন্মে।

শিল্পের মধ্যে **কার্পাস, পশম** ও **রেশম বস্ত্র** শিল্পই প্রধান।

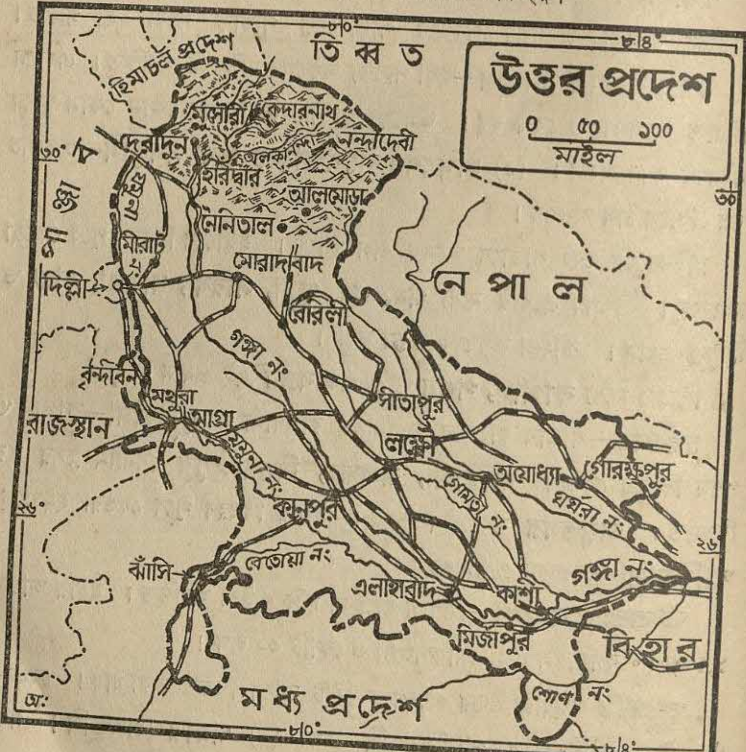
চণ্ডীগড়—পাঞ্জাব রাজ্যের নবনির্মিত রাজধানী। **লুধিয়ানা**—কার্পাস ও পশম শিল্পের কেন্দ্র। **আম্বালা, জলন্ধর, ফিরোজপুর** সেনানিবাসের জন্য বিখ্যাত। **অমৃতসর** সর্বপ্রধান শহর। ইহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। **পাতিয়ালা**—অন্যতম প্রধান শহর।

উত্তর প্রদেশ—নেপাল রাজ্যের দক্ষিণে ইহা অবস্থিত। ইহার আয়তন ১,১৩,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬ কোটি ৩২ লক্ষ।

ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী উত্তর প্রদেশকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—(১) **উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্যভূমি** এবং (২) **গঙ্গার সমভূমি।** গঙ্গার সমভূমিকে আবার দুই অংশে ভাগ করা যায়। পাঞ্জাব সীমান্ত হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত অংশ **ঊধ্ব-গঙ্গা-উপত্যকা** (Upper Ganges Valley) এবং বাকী অংশ **মধ্য-গঙ্গা-উপত্যকা** (Middle Ganges Valley)।

উর্ধ্ব-গঙ্গা-উপত্যকায় গ্রীষ্মে বেশ গরম পড়ে এবং শীতকালে শীতও বেশ অনুভূত হয়। বারিপাত ৪০"র কম, তাই কৃষির জন্য এই অংশে অনেক খাল কাটা হইয়াছে। মধ্য অংশে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী, শীতগ্রীষ্মের উত্তাপের প্রসরও অনেকটা কম। এই রাজ্যের সেচ-খালের বিষয় আগেই বলা হইয়াছে।

গঙ্গার উপত্যকা অত্যন্ত উর্বর কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে **গম, যব, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, ছোলা, সরিষা, ইক্ষু** ও **ধান** প্রচুর উৎপন্ন হয়। তাছাড়া **তৈলবীজ, তুলা, আফিং** এবং **চা**-ও এখানে উৎপন্ন হয়।

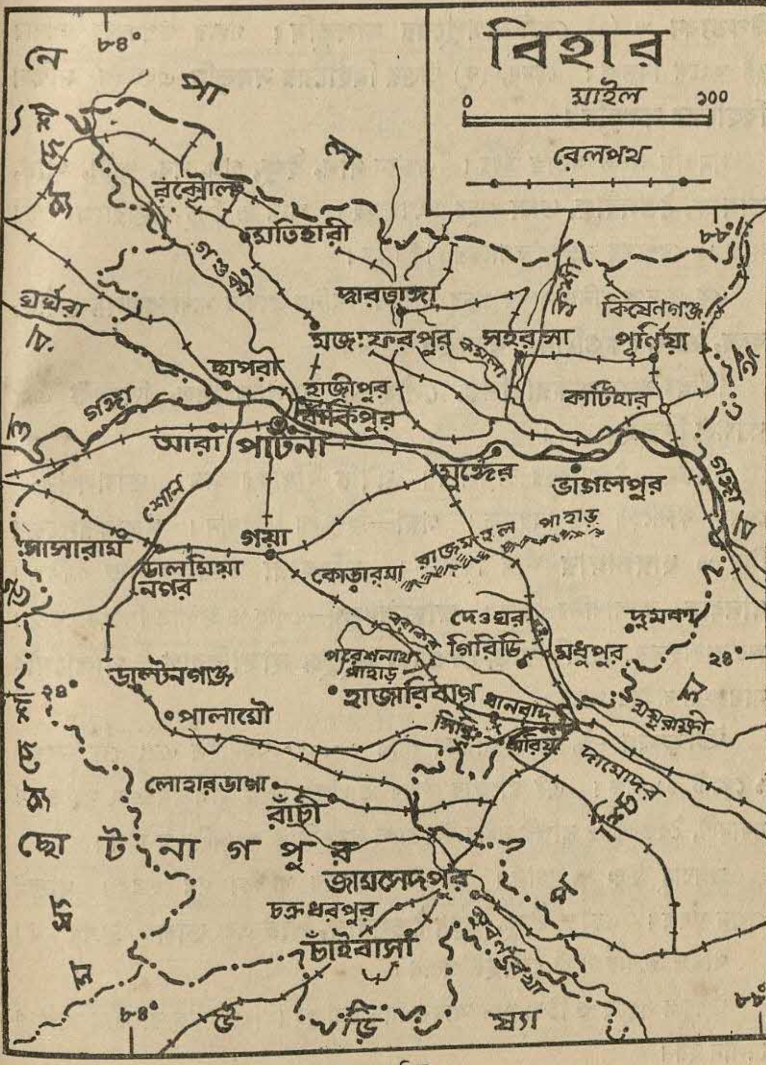


১৬১নং চিত্র

উত্তর প্রদেশে বিভিন্নপ্রকার শিল্প আছে। তন্মধ্যে **কার্পাস, পশম, রেশম, শর্করা, চর্ম** ও **দিয়াশলাই** শিল্পই প্রধান। তাছাড়া আটা-ময়দার কল ও তেলের কল প্রায় সর্বত্রই আছে।

নগরের মধ্যে **লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, কাশী, আগ্রা, আলীগড়** প্রভৃতিই প্রধান। ইহাদের বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। **হরিদ্বার** ও **মথুরা** হিন্দু তীর্থস্থান। **মির্জাপুর**—এখানকার কার্পেট প্রসিদ্ধ। **মীরাট**—প্রাচীন

শহর ও সেনানিবাস। **মোরাদাবাদ**—পিতল ও কাঁসার জিনিসের জন্য বিখ্যাত। **নৈনিতাল, মুসৌরী, আলমোড়া, দেরাতুন** পাহাড়ের উপর অবস্থিত স্বাস্থ্যকর স্থান।



১৬২নং চিত্র

বিহার—নেপালের দক্ষিণে ও উড়িষ্যার উত্তরে এই রাজ্য। ইহার আয়তন প্রায় ৬৭,১৬৩ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ।

এই রাজ্যকে দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) **গঙ্গার উপত্যকা** ও (২) **ছোটনাগপুরের মালভূমি।** গঙ্গার উপত্যকা আবার দুই অংশে বিভক্ত। যেমন, (ক) **উত্তর বিহারের সমভূমি** এবং (খ) **দক্ষিণ বিহারের সমভূমি।**

সমভূমি অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর। এখানে **ধান, ইক্ষু, গম, যব, ভুট্টা, পাট, তামাক, তৈলবীজ, ডাল** প্রচুর উৎপন্ন হয়। আম ও লিচু এই রাজ্যে প্রচুর জন্মে। রেশমের জন্য তুঁতগাছের চাষও হয়।

এই প্রদেশে খনিজ সম্পদ প্রচুর আছে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে **কয়লা, লৌহ, অভ্র, তাম্র, কেওলিন** ও **বক্সাইট** প্রধান।

শিল্পের মধ্যে **শর্করা শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, সিমেণ্ট** এবং **কাগজ শিল্পই** প্রধান।

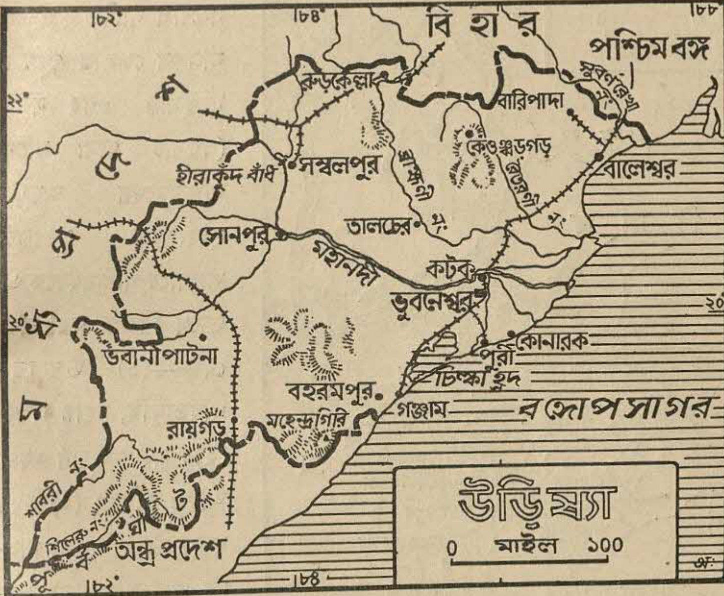
পাটনা এই রাজ্যের রাজধানী। **রাঁচি** স্বাস্থ্যকর স্থান। **ভাগলপুর**—রেশমী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। **গয়া**—হিন্দুদের তীর্থস্থান। **মজঃফরপুরের** লিচু ও **দ্বারভাঙ্গার** আম বিখ্যাত। **মতিহারী** তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ। **ধানবাদ**—কয়লাখনির কেন্দ্র। **জামসেদপুর**—লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র। অন্যান্য শহরের মধ্যে **গিরিডি, দেওঘর, মধুপুর, হাজারিবাগ** ও **পালামৌর** নাম করা যাইতে পারে।

উড়িষ্যা—উড়িষ্যার আয়তন প্রায় ৬০,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি ৪৬ লক্ষ। এই রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মালভূমি এবং মধ্যভাগে মহানদী, বৈতরণী ও ব্রাহ্মণী নদীর উপত্যকা সমভূমি ও মহানদীর ব-দ্বীপ।

জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা খুব উর্বর। **ধান্যই** প্রধান ফসল। এছাড়া **ইক্ষু, ভুট্টা, তৈলবীজ, পাট** এবং **ডাল**ও উৎপন্ন হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে **লৌহই** প্রধান।

উপকূল সমুদ্রে ও চিল্কা হ্রদে অনেক মাছ ধরা হয়। এই মাছ রাজ্যের বাহিরে চালান হয়।

শিল্পের মধ্যে নানাবিধ **কুটিরশিল্প**ই প্রধান। তা'ছাড়া কয়েকটা আটা-ময়দার কল, **কাপড় ও চিনির কল,** তেলের কল এবং **সাবানের কারখানা**ও আছে। **রৌরকেলা**তে একটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা তৈয়ারী হইতেছে।

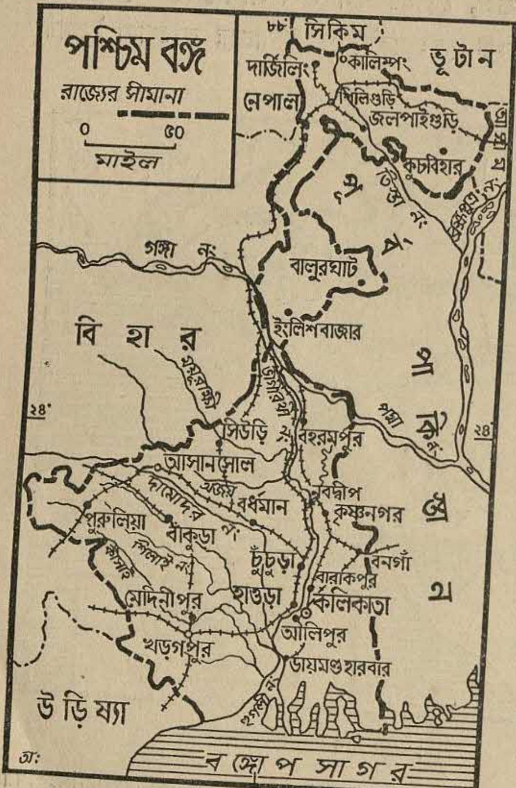


১৬৩নং চিত্র

পুরী—সমুদ্রের তীরে অবস্থিত, হিন্দু তীর্থস্থান। এখানকার জগন্নাথদেবের মন্দির প্রসিদ্ধ। **ভুবনেশ্বর**—পুরীর কিছু উত্তরে অবস্থিত। ইহা উড়িষ্যার রাজধানী। এখানকার লিঙ্গরাজ মন্দির বিখ্যাত। **কটক**—উড়িষ্যার পূর্বতন রাজধানী, প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **সম্বলপুর**—অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। অন্যান্য শহরের মধ্যে **বালেশ্বর, বহরমপুর** ও **গঞ্জাম**ই প্রধান।

পশ্চিমবঙ্গ—পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩৩,২৭৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৬২ লক্ষ। পূর্বে এই রাজ্যের উত্তরের অংশ দক্ষিণ দিক হইতে বিচ্ছিন্ন

ছিল। কিন্তু বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমার কতক অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এখন এই রাজ্যের উত্তর ভাগের সহিত দক্ষিণ অংশের সংযোগ সাধিত হইয়াছে। মানভূম জেলার পুরুলিয়া মহকুমার প্রায় সবটুকু (তিনটি থানা বাদে) পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গকে ৬টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—(১) উত্তরের পার্বত্যভূমি, ইহার দক্ষিণে (২) তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল, আরও দক্ষিণে (৩) উত্তর বঙ্গের উচ্চভূমি, (৪) মালদহ ও দিনাজপুরের সমভূমি। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভূভাগের পশ্চিমাংশ (৫) ছোটনাগপুরের মালভূমির পূর্বাংশ, অবশিষ্ট অংশ (৬) গঙ্গা-ভাগীরথীর পলিস্পৃষ্ট সমভূমি।



১৬৪নং চিত্র

এই রাজ্যের জলবায়ু উষ্ণ এবং আর্দ্র। বৃষ্টিপাত বেশী হয়। ভূমি খুব উর্বর। **ধান** এবং **পাট**ই এখানকার প্রধান ফসল। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচুর **চা** জন্মে। এছাড়া **তৈলবীজ, তামাক, ইক্ষু**ও এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়। রেশমের জন্য তুঁতগাছের চাষও হয়।

খনিজ সম্পদের মধ্যে **কয়লা**ই প্রধান।

শিল্প বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে কলিকাতা মহানগরী ও উপকণ্ঠে এবং হুগলী নদীর উভয় তীরে অসংখ্য কলকারখানা আছে। উত্তর-পশ্চিমদিকে আসানসোল, রাণীগঞ্জ অঞ্চলেও অনেক কলকারখানা আছে। এইগুলির মধ্যে **লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা; পাট ও কাপড়ের কল; ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা; কাগজ, দিয়াশলাই, সিগারেট, রবার, চামড়া ও জুতার কারখানা; রেলইঞ্জিন, ছোটখাট যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা; লোহা, পিতল, তামা, কাঁসা প্রভৃতি ধাতু-নির্মিত জিনিসের কারখানা** এবং **বিমান ও জাহাজ মেরামতের কারখানাই** উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানের নিকটে **দুর্গাপুরে** নূতন একটি লৌহ কারখানা খোলা হইতেছে।

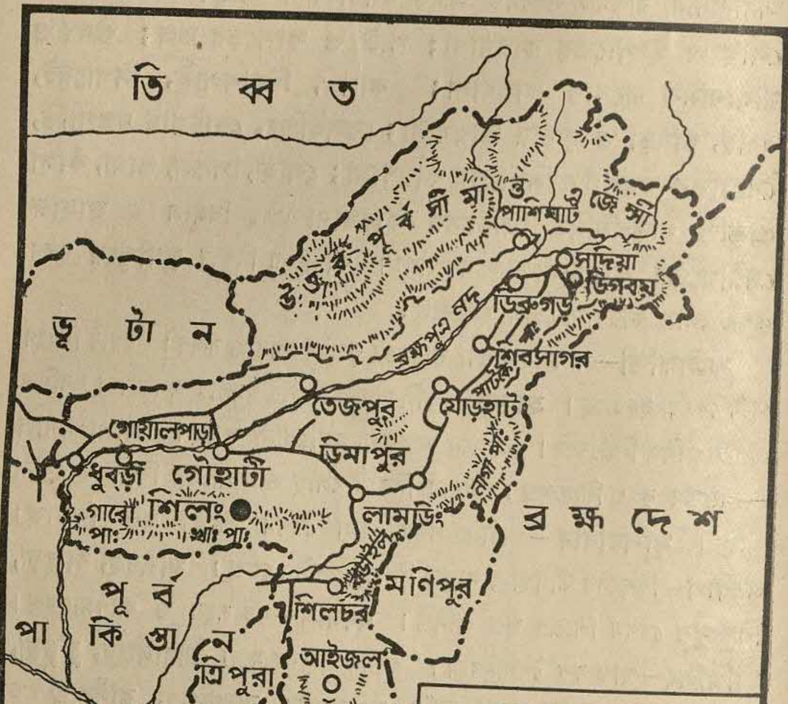
কলিকাতা—পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বৃহত্তম নগর ও বন্দর। ইহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। **হাওড়া**—কলিকাতার নিকটে হুগলীর অপরতীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র। এখানে অনেক কলকারখানা আছে। **আসানসোল**—অন্যতম বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। ইহার নিকটে লৌহ ও ইস্পাতের বিরাট কারখানা আছে। **মুর্শিদাবাদ**—প্রাচীন শহর, ইহা রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। **নবদ্বীপ**—হিন্দুদের তীর্থস্থান, সংস্কৃত শিক্ষার প্রাচীন কেন্দ্র। **মালদহ, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর** রেশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **বর্ধমান**—বড় শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **দার্জিলিং**—স্বাস্থ্যকর শৈলনিবাস। অন্যান্য শহরের মধ্যে **শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, চন্দননগর, মেদিনীপুর, সিউড়ি, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রাণীগঞ্জ** ও **কালিম্পং**-এর নাম করা যাইতে পারে।

আসাম—ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৮৫,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৯০ লক্ষ (উপজাতীয় এলাকা বাদে)।

আসামকে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) **উত্তরের উচ্চ পার্বত্যভূমি,** (২) **দক্ষিণের পার্বত্যভূমি** এবং (৩) **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা।**

এখানে বৃষ্টিপাত খুব বেশী হয়। গ্রীষ্মকাল উষ্ণ। শীতে পার্বত্য অঞ্চলে বেশ শীত পড়ে। কৃষিকার্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেই বেশী হয়। **ধান, পাট** এবং

চা এই রাজ্যের প্রধান ফসল। **শাল, সেগুন** প্রভৃতি বনজ সম্পদও এ রাজ্যে প্রচুর আছে।



১৬৫নং চিত্র

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ডিগবয় ও নাহারকাটিয়া অঞ্চলের **পেট্রোলিয়ামই** প্রধান। খাসিয়া, গারো পাহাড় ও অন্যান্য অঞ্চলে **কয়লা** পাওয়া যায়।

শিল্পের মধ্যে **খনিজতৈল-শোধন, চা** এবং **রেশম শিল্পই** প্রধান। আসামের **এণ্ডি, মুগা** ও **তসর** প্রসিদ্ধ।

শিলং—আসামের রাজধানী ও বিখ্যাত শৈলনিবাস। **গৌহাটি**—আসামের বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **ডিগবয়**—খনিজ তৈলশিল্পের কেন্দ্র। **শিলচর**—চা ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। অন্যান্য শহরের মধ্যে **সদিয়া, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, তেজপুর** ও **ধুবড়ী**র নাম করা যাইতে পারে।

অন্ধ্র—১৯৫৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে পূর্বতন মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে উত্তর দিকের তেলেগু-ভাষী অঞ্চলকে অন্ধ্র নামে একটি পৃথক রাজ্যে পরিণত



১৬৬নং চিত্র

করা হয়। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে প্রাক্তন হায়দরাবাদ রাজ্যের পূর্বাংশের প্রায় আটটি তেলেগু-ভাষী অঞ্চল অন্ধ্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে এই

রাজ্যের আয়তন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান অন্ধ্র রাজ্যের আয়তন প্রায় ১,১০,২৫০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ২২ লক্ষ। এই রাজ্য ২০টি জেলায় বিভক্ত।

এই রাজ্যের উত্তরে উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই, পশ্চিমে বোম্বাই ও মহীশূর, দক্ষিণে মহীশূর ও মাদ্রাজ এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর। এই রাজ্যের উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০০ মাইল।

এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব অংশে পাহাড় আছে। ইহা পূর্বঘাট পর্বতেরই একটি খণ্ডিত অংশ। দক্ষিণ অংশের সর্ব পশ্চিমে মালভূমি। তারপর নাল্লামালাই ও ভেলিকোণ্ডা পাহাড়। উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই পাহাড়িয়া অঞ্চলের মধ্যভাগে গোদাবরী ও কৃষ্ণার ব-দ্বীপ ও সমভূমি, অবশিষ্ট অংশ উপকূল সমভূমি।

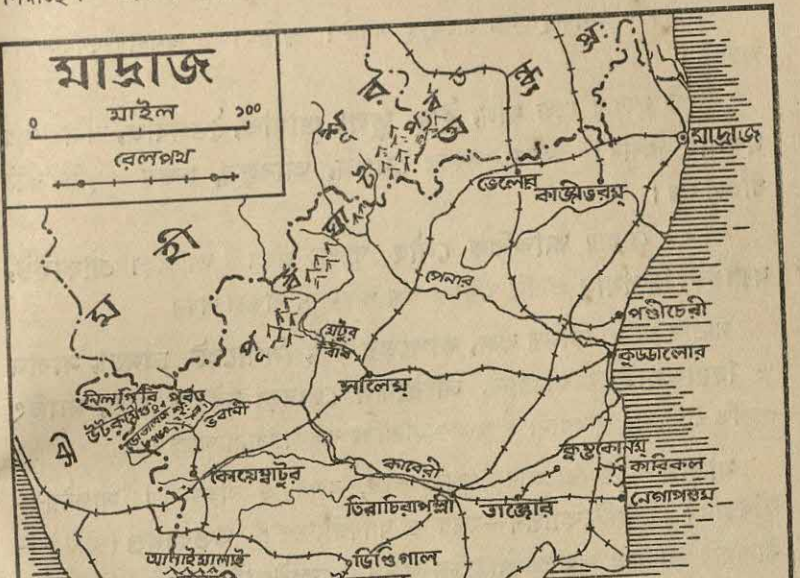
জলবায়ু উষ্ণপ্রধান। শীত-গ্রীষ্ম দুই ঋতুতেই এখানে বৃষ্টিপাত হয়। উপকূলের সমভূমি ও ব-দ্বীপ অত্যন্ত উর্বর। এই রাজ্যে **ধান্য, ইক্ষু, তামাক, চীনাবাদাম, তৈলবীজ** ও **তুলা** উৎপন্ন হয়।

এই রাজ্যে প্রায় ৯০০ মাইল নৌ-বাহনযোগ্য খাল, ৯১৬ মাইল জাতীয় রাজপথ এবং ১৩৪৯ মাইল প্রাদেশিক রাজপথ আছে। এই রাজ্যের রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০০ মাইল। কাজেই এই রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই বলা চলে।

খনিজ সম্পদের মধ্যে **অভ্র, কয়লা** এবং **ম্যাঙ্গানিজ**ই প্রধান। এই রাজ্যে **চিনির কল** এবং **কাগজ, কাচ** ও **সিমেণ্টের** কারখানা আছে।

হায়দরাবাদ—অন্ধ্র রাজ্যের রাজধানী এবং ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম নগরী। ইহা অন্ধ্র রাজ্যের অন্যতম প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। **সেকেন্দ্রাবাদ**—বিখ্যাত সেনানিবাস। **কুর্ণুল**—দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত প্রাক্তন রাজধানী ও অন্যতম প্রধান শহর। **বিশাখাপত্তনম্**—বন্দর ও জাহাজনির্মাণ কেন্দ্র। **ওয়ালটেয়ার**—সমুদ্রের উপকূলে স্বাস্থ্যকর স্থান। **কোকনদ**—গোদাবরীর ব-দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত বন্দর। অন্যান্য শহরের মধ্যে **নেলোর, গুণ্টুর, বিজয়ওয়াদা, মসলিপত্তম্** ও **রাজমাহেন্দ্রী**র নাম করা যাইতে পারে।

মাদ্রাজ—রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে এই রাজ্যের আয়তন কিছুটা কমিয়া গিয়াছে। প্রাক্তন মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণ কানাড়া জেলা, মহীশূর এবং মালাবার



১৬৭নং চিত্র

জেলা কেরল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তামিল ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া এই রাজ্য গঠিত। এই রাজ্যের আয়তন ৫০,১৭০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায়

৩ কোটি। এই রাজ্যের পশ্চিমাংশে মালভূমি, পূর্বঘাট পর্বত, আন্নামালাই ও কার্ডামম পর্বত। পূর্বাংশ সমভূমি।

এখানকার জলবায়ু অন্ধ্র রাজ্যের মতই। মৃত্তিকা ও জলবায়ু কৃষিকার্যের অনুকূল।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে **ধান, ইক্ষু, তুলা, তামাক, তৈলবীজ,** নানাপ্রকার **মশলাই** প্রধান। অরণ্য অঞ্চলে **সেগুন, আবলুস, চন্দন** প্রভৃতি কাঠ পাওয়া যায়।

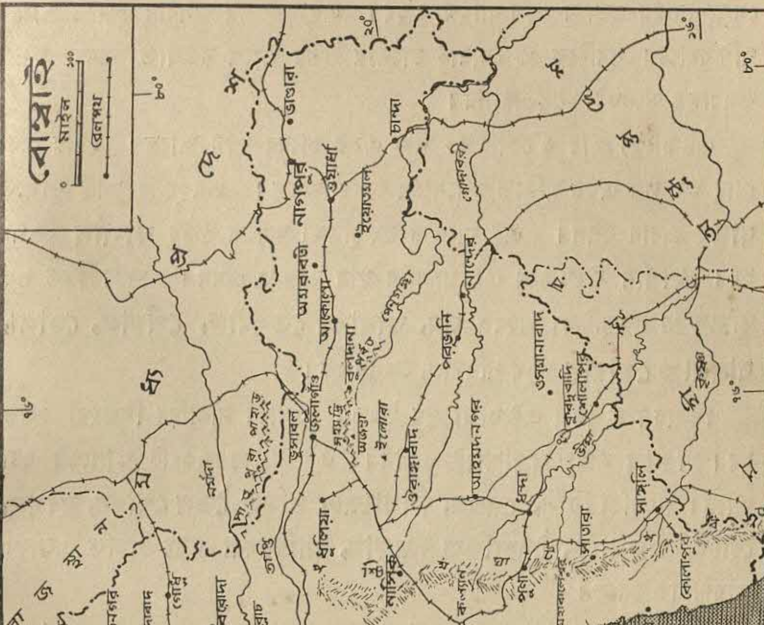
সালেম জেলায় **আকরিক লৌহ** পাওয়া যায়। তা'ছাড়া **গ্রাফাইট, বক্সাইট, জিপসাম্** প্রভৃতি খনিজও অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

মাদ্রাজ রাজ্যে **চিনির কল, কাপড়ের কল, সিগারেট, চামড়া, সাবান** ও **দিয়াশলাই**এর কারখানা, **নারিকেল ছোবড়া হইতে দড়ি, ম্যাটিং** প্রভৃতি তৈয়ারীর কারখানা ও অন্যান্য নানাবিধ কলকারখানা আছে।

মাদ্রাজ—এই রাজ্যের প্রধান শহর, বন্দর ও রাজধানী। **মাদুরৈ**—তীর্থস্থান। **টিউটিকোরিণ**—বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **উতকামণ্ড** (উটি)—নীলগিরি পাহাড়ে অবস্থিত স্বাস্থ্যকর স্থান। **কোইম্বাটুর**—প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র। **তাঞ্জোর**—বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। অন্যান্য শহরের মধ্যে **রামেশ্বরম্, কুম্ভকোণম্, কঞ্জীভরম্, কালিকট** ও **সালেম** প্রধান।

বোম্বাই—রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বোম্বাই রাজ্যের আয়তন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে একথা আগেই বলা হইয়াছে। প্রাক্তন মধ্যপ্রদেশ ও হায়দরাবাদের অনেক অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রও এখন এই রাজ্যের অন্তর্গত। এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ১,৯০,৬৯০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ।

রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়াতে এই রাজ্যে ৪৩টি জেলা হইয়াছে এবং রাজ্যটিকে ছয়টি শাসনতান্ত্রিক বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। নাগপুর, রাজকোট, ঔরঙ্গাবাদ, আহমেদাবাদ, পুনা ও বোম্বাই নগরী এই বিভাগগুলির প্রধান কার্যালয়।



১৬৮নং চিত্র

এই রাজ্যের মধ্য-পশ্চিম ভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পশ্চিমঘাট পর্বত অবস্থিত। পশ্চিমদিকে উপকূলের সমভূমি, পূর্বদিকে মালভূমি।

এই রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে দক্ষিণ-পশ্চিম

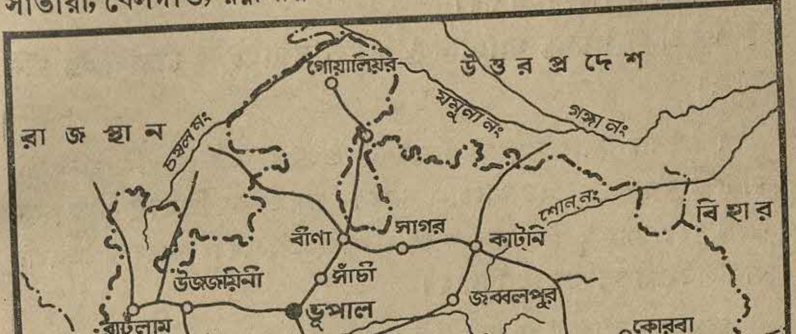
মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে প্রচুর বারিপাত হয়। এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। পশ্চিমঘাটের পূর্বদিকে ও বোম্বাই রাজ্যের উত্তর অংশে বৃষ্টিপাত অনেক কম। জলবায়ুও অনেকটা চরমভাবাপন্ন।

এই রাজ্যে প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর চাষের জমি আছে। ইহার মধ্যে প্রায় ৩২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। উপকূলের আর্দ্র ভূমিতে **ধান্যই** প্রধান ফসল। এই রাজ্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর **কার্পাস** উৎপন্ন হয়। কার্পাস উৎপাদনে এই রাজ্যের স্থান ভারতে প্রথম। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ভূমিতে ও কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে **গম, তামাক, তৈলবীজ, পেঁয়াজ, ছোলা, বাজরা** ও **জোয়ার** প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

শিল্পের দিক দিয়া এই রাজ্য খুব উন্নত। এখানে নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়। শিল্পের মধ্যে **বস্ত্রশিল্পই** প্রধান। এই রাজ্যে ২৩০টি কাপড়ের কল আছে। এছাড়া **চিনি, রেশম, সিগারেট, খনিজ তৈল শোধন, কাগজ,** ছোটখাট **যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, প্লাষ্টিকের দ্রব্য** প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানাও আছে।

বোম্বাই, আহমেদাবাদ, সোলাপুর প্রভৃতি প্রধান নগরের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। **সুরাট**—তাপ্তীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন বন্দর। এখানকার রেশমী বস্ত্র প্রসিদ্ধ। **পুণা**—প্রাচীন শহর ও স্বাস্থ্যকর স্থান। **নাসিক**—হিন্দুদের তীর্থস্থান। **বরোদা**—বরোদা জেলার সদর ও একটি সুন্দর শহর। **ঔরঙ্গাবাদ**—প্রাচীন শহর। ইহার অনতিদূরে ভারতীয় ভাস্কর্যের উজ্জ্বল নিদর্শন ইলোরার গুহামন্দিরগুলি অবস্থিত। নিকটে দৌলতাবাদ দুর্গ ও একটি বিখ্যাত শিবমন্দির আছে। এইগুলি দর্শন করিবার জন্য প্রতিবৎসর বহু পর্যটক ঔরঙ্গাবাদ শহরে আগমন করেন। তাই এই শহরে হোটেল-ব্যবসা দ্বারা বহুলোক জীবিকা অর্জন করিতেছে। **রাজকোট**—সৌরাষ্ট্রের প্রধান নগর ও ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্র। **ওখা**—বিখ্যাত বন্দর। এখান হইতে আফ্রিকা উপকূলের সহিত বাণিজ্য চলে। কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ওখা অবস্থিত। উপদ্বীপের দক্ষিণে সমুদ্রতীরে অবস্থিত **ভেরাবল** এই অঞ্চলের বিখ্যাত বন্দর। এখানেই প্রভাসতীর্থ ও সোমনাথের মন্দির অবস্থিত। **দ্বারকা**—ওখার দক্ষিণে অবস্থিত।

ইহা হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। **জুনাগড়**—সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত বিখ্যাত শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার নিকটে গিরনার পাহাড়ে প্রাচীন কারুকার্যমণ্ডিত বহু জৈন ও হিন্দু মন্দির আছে। **পোরবন্দর**—সৌরাষ্ট্রের অন্যতম বন্দর। বোম্বাই রাজ্যের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের অন্যান্য শহরের মধ্যে **নবনগর** ও **ভবনগরই** প্রধান। **নাগপুর**—নবগঠিত বোম্বাই রাজ্যে অবস্থিত তুলা ব্যবসায়ের বিখ্যাত কেন্দ্র ও শিল্পবাণিজ্য স্থান। **অমরাবতী**—অন্যতম প্রধান নগর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র। **ওয়ার্ধা**—তূলা ব্যবসায়ের কেন্দ্র। অন্যান্য শহরের মধ্যে **মহাবালেশ্বর, সাতারা, বেলগাঁও, রত্নগিরি** প্রধান।



১৬৯নং চিত্র

মধ্যপ্রদেশ—রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে এই রাজ্যের আয়তনও অনেক বাড়িয়াছে। এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ১৭১,২০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা

প্রায় ২ কোটি ৬১ লক্ষ। নদী উপত্যকার নিম্নসমভূমি ভিন্ন এই রাজ্যের প্রায় অধিকাংশই মালভূমি। মধ্যে মধ্যে অল্প-উচ্চ পাহাড়ও আছে।

এখানকার জলবায়ু উষ্ণ ও অপেক্ষাকৃত শুষ্ক। এই রাজ্যের মোট আয়তনের প্রায় একতৃতীয়াংশ স্থান অরণ্যভূমি। এখানে শতকরা প্রায় ৭৮ জন লোক কৃষিজীবি। উপত্যকাভূমিই কৃষির পক্ষে অধিক অনুকূল। **ধান** ও **গম** এই রাজ্যের প্রধান ফসল। এছাড়া **ভুট্টা, তুলা, তৈলবীজ, জোয়ার, বাজরা** ইত্যাদিও প্রচুর জন্মে। এই রাজ্যে **কমলালেবু**ও জন্মে। বনভূমি হইতে **শাল, সেগুন** প্রভৃতি কাঠ পাওয়া যায়।

এই রাজ্যে **কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, বক্সাইট** ও **চীনামাটির** খনি আছে।

শিল্পদ্রব্যের মধ্যে **বস্ত্র** ও **সিমেণ্ট**ই প্রধান। এই রাজ্যে অনেকগুলি কাপড়ের কল ও সিমেণ্টের কারখানা আছে। দ্রুগ জেলার **ভিলাই** নামক স্থানে একটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। কারখানা তৈয়ারীর কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

ভুপাল—মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ও অন্যতম প্রধান নগর। **জব্বলপুর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর** অন্যতম প্রধান শহর। ইহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। **পাঁচমারী**—মহাদেব পর্বতে অবস্থিত স্বাস্থ্যকর স্থান। **রায়পুর**—তুলা ব্যবসায়ের কেন্দ্র। অন্যান্য শহরের মধ্যে **ঝান্সী, সাগর** ও **বিলাসপুরের** নাম করা যাইতে পারে।

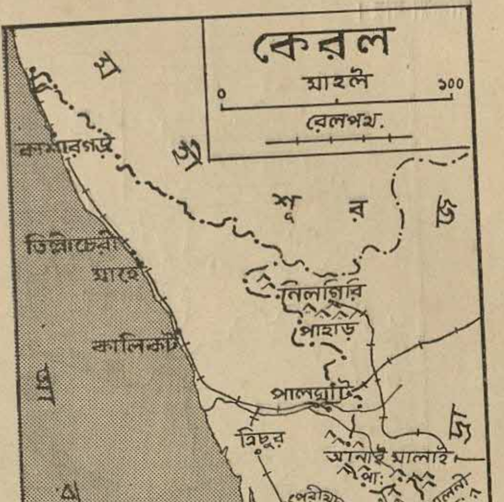
কেরল—প্রাক্তন ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের প্রায় সবটুকু এবং মাদ্রাজ রাজ্যের মালয়ালম্ ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া ইহা গঠিত। ইহা মুখ্যতঃ মালয়ালম্ ভাষাভাষী রাজ্য। এই রাজ্যের আয়তন ১৪,৯৮০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ। এই রাজ্যে লোকবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন। এখানে প্রতি বর্গমাইলে ৯১৫ জন লোক বাস করে। অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতের অনুপাতও ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী (পুরুষ ৬৪%, স্ত্রী ৪৩%)।

কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে **ধান, টেপিওকা, মশলা, ইক্ষু, রবার, চা,**

কফি এবং **তৈলবীজ** প্রধান। তা'ছাড়া উপকূলভূমিতে অনেক **নারিকেল** গাছ আছে।

নারিকেল-ছোবড়া হইতে দড়ি ও অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত করার জন্য এ রাজ্যে প্রায় ২০০টি ছোটবড় কারখানা আছে। ইহাই এই রাজ্যের প্রধান শিল্প। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে **রবার, চা, তৈল, বস্ত্র, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য, চিনি, সিমেন্ট, দিয়াশলাই** প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

ত্রিবান্দ্রাম্—এই রাজ্যের রাজধানী। **কোচিন**—বিখ্যাত বন্দর। **কুইলন** ও **আলেপ্পি** বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র।

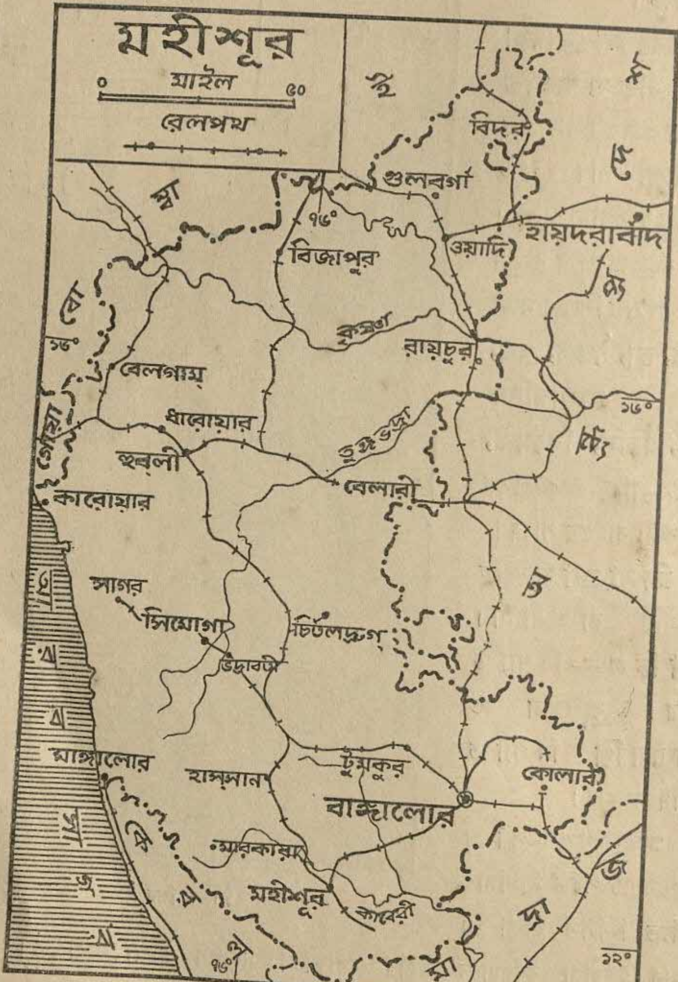


১৭০নং চিত্র

মহীশূর—পূর্ব ও পশ্চিমঘাট পর্বত নীলগিরি পর্বতে মিলিত হইয়া যে কোণ তৈয়ারী করিয়াছে উহার মধ্যভাগে মহীশূর রাজ্য অবস্থিত। ইহার অধিকাংশই মালভূমি (উচ্চতা ২০০০′-৩০০০′)। নবগঠিত মহীশূর রাজ্যের আয়তন ৭২,৭৩০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ।

ধান, ইক্ষু, জোয়ার, বাজরা, তুলা ও **কফি** এই রাজ্যের প্রধান কৃষিজ

উৎপন্ন দ্রব্য। অরণ্যে **আবলুস, সেগুন, চন্দন** প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠ পাওয়া যায়।



১৭১নং চিত্র

খনিজ সম্পদের মধ্যে **স্বর্ণ, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট ও গ্রাফাইট** প্রধান।

রাজধানী **মহীশূর**। **ব্যাঙ্গালোর** মহীশূর রাজ্যের বৃহত্তম নগর। এই দুইটি নগরের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। **কোলার**—স্বর্ণখনির জন্য বিখ্যাত। **বেলারী**—ম্যাঙ্গানিজ খনি ও বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র।

রাজস্থান—রাজপুতানা অঞ্চলের অনেকগুলি ক্ষুদ্রবৃহৎ পূর্বতন দেশীয় রাজ্য লইয়া রাজস্থান গঠিত। আজমীঢ় রাজ্য নবগঠিত রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তা'ছাড়া প্রাক্তন বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের সামান্য অংশও রাজস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহার আয়তন প্রায় ১,৩২,৩০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ।

ইহার পশ্চিমভাগ থর মরুভূমি। অন্যত্রও জলবায়ু মরুভূমির মত শুষ্ক ও চরম। এক কথায় ইহাকে মরুভূমির দেশ বলা যাইতে পারে।

জোয়ার, বাজরা, যব ও **গম**ই এখানকার প্রধান ফসল। খনিজ সম্পদের মধ্যে **কয়লা**ই উল্লেখযোগ্য। এখানে মার্বেল পাথর ও বিভিন্ন রংএর বেলে পাথর পাওয়া যায়। এখানে সম্বর হ্রদের জল শুকাইয়া প্রচুর **লবণ** তৈয়ারী করা হয়।

এই রাজ্যে কুটিরশিল্পের প্রচলনই বেশী। এখানে **কম্বল, পশমী বস্ত্র, তাঁতের কাপড়,** নানা কারুকার্য করা **পিতলের জিনিস, তামা** ও **কাঁসার বাসন** ইত্যাদি তৈয়ারী হয়।

জয়পুর—রাজস্থানের রাজধানী ও বৃহত্তম নগর। **পুষ্কর**—হিন্দু তীর্থস্থান। **সম্বর**—লবণ-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **যোধপুর**—প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **উদয়পুর, চিতোর**—প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। **বিকানীর**—কুটিরশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

জম্মু ও কাশ্মীর—ভারতের উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে এই রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্যের প্রায় সবটুকুই পার্বত্যভূমি। মধ্যভাগে পর্বতবেষ্টিত কাশ্মীর উপত্যকা। এই রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বড়ই মনোরম। এই সৌন্দর্যের আকর্ষণে দেশবিদেশ হইতে বহু পর্যটক কাশ্মীরে আগমন করেন। এই রাজ্যের পশ্চিমাংশ এখনও পাকিস্তানীরা দখল করিয়া আছে। এই নিয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এখনও বিবাদ চলিতেছে। রাশিয়া, চীন ও আফগানিস্তান—এই তিন রাষ্ট্রের সীমা কাশ্মীর রাজ্যে মিলিয়াছে। তাই ইহার

রাজনৈতিক গুরুত্বও অত্যধিক। এই রাজ্যের আয়তন ৮২,০০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ।

কাশ্মীর উপত্যকাতেই কৃষিকার্য অধিক হয়। **ধান, গম, জোয়ার** ও **ভুট্টাই** প্রধান ফসল। এছাড়া **আঙ্গুর, পীচ, আপেল, বেদানা** প্রভৃতি ফলও কাশ্মীরে প্রচুর জন্মে। রেশমের জন্য তুঁতগাছের চাষও এখানে হয়।



১৭২নং চিত্র

কাশ্মীরের কুটিরশিল্প অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এখানে **শাল, আলোয়ান, কার্পেট, জরির কাজ-করা কাপড়,** সূক্ষ্ম কারুকার্য করা **কাঠ** ও **ধাতব জিনিসই** প্রধান। এখানে বহু লোক হোটেলের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে।

রাজধানী **শ্রীনগর**। **লেহ**—উত্তরদিকে অবস্থিত বাণিজ্যস্থান। **জম্মু**—অন্যতম প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **উরি, পুঞ্চ, মীরপুর**—ক্ষুদ্র শহর। কুটিরশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হিমাচল প্রদেশ—দুইটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অঞ্চল লইয়া হিমাচল প্রদেশ গঠিত। এই রাজ্যের বৃহত্তর অংশটি উত্তর প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে এবং ক্ষুদ্রতর অংশটি কাশ্মীর রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত। এই দুই অংশের মধ্যবর্তী অঞ্চল পাঞ্জাব রাজ্যের অন্তর্গত। এই রাজ্য হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে অবস্থিত। ১৯৪৮ সালে চম্বা, মাণ্ডি, শিরপুর প্রভৃতি ২১টি প্রাক্তন দেশীয়রাজ্য একত্রিত করিয়া হিমাচল

প্রদেশ গঠিত হয়। এই রাজ্যের আয়তন ১১,০৫৩ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ ১৭ হাজার।

হিমালয় পর্বতের পাদদেশের পার্বত্য অংশে ইহা অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু শীতপ্রধান। বৃষ্টিপাতও পাঞ্জাবের সমভূমি অপেক্ষা অধিক। এখানে নদী-উপত্যকায় ও পর্বতের ঢালে কিছুকিছু চাষ হয়। এখানে আলু ও নানাজাতীয় ফলের চাষ হইয়া থাকে। তাছাড়া চা, ভুট্টা ও গমও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বনের কাঠ সংগ্রহ ও পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা।

সিমলা—এই রাজ্যের রাজধানী। ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান শৈলনিবাস। **ডালহৌসি**—বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস। **চম্বা** ও **মাণ্ডি**—অন্যান্য প্রধান শহর।

দিল্লী—দিল্লী নগরী ও উহার উপকণ্ঠ লইয়া ১৯১২ সালে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয়। ইহার আয়তন ৫৭৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ ৪৪ হাজার। **দিল্লীই** ইহার রাজধানী। এই নগরীর বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

ত্রিপুরা—বৃটিশ আমলের দেশীয় করদ রাজ্য ত্রিপুরাই স্বাধীনতা লাভের পর একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রায় তিনদিকেই পূর্ব-পাকিস্তান রাষ্ট্র। এই রাজ্যের আয়তন ৪,১১৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬,৪৯,৯৩০। এই রাজ্য পর্বতময় ও অরণ্যসঙ্কুল। এই রাজ্যের জলবায়ু উষ্ণ আর্দ্র মৌসুমী জলবায়ু। ধান, পাট, তূলা এই রাজ্যের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এছাড়া চা ও বিভিন্ন প্রকার ফলও এখানে উৎপন্ন হয়।

আগরতলা—এই রাজ্যের রাজধানী ও সর্বপ্রধান শহর।

মণিপুর—ইহা আসামের পূর্বদিকে আসাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য। মণিপুর রাজ্যের মধ্যভাগে অপেক্ষাকৃত সমতলভূমি আছে। এই সমতলভূমি চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা। এই রাজ্যের আয়তন ৮,৬২৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৫,৭৯,০৫৮। ধানই এই রাজ্যের প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য। কুটিরশিল্পজাত নানাপ্রকার দ্রব্যের জন্য মণিপুরের খ্যাতি আছে।

ইম্ফল—এই রাজ্যের রাজধানী ও সর্বপ্রধান শহর।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ ও নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য

গঠিত। দ্বীপগুলি পর্বতময়, বন্ধুর ও অরণ্যসঙ্কুল। এখানে আজকাল অনেক বাঙ্গালী বাস্তুহারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন। ১৯৫১ সালের লোক-গণনা অনুযায়ী এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ৩০,৯৬৩ জন ছিল। এই হিসাবে আদিবাসীদের ধরা হয় নাই। ধান ও নারিকেল এই রাজ্যের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। আজকাল এখানে অল্পপরিমাণে রবারের চাষ হইতেছে।

পোর্টব্লেয়ার—এই রাজ্যের রাজধানী, প্রধান বন্দর, সর্বপ্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

আমিন দ্বীপ ও লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ—মালাবার উপকূল হইতে প্রায় ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় ১৪টি দ্বীপ লইয়া কেন্দ্রীয় শাসিত এই রাজ্য গঠিত হইয়াছে। এই রাজ্যের অধিবাসী-সংখ্যা ২১,১৯৫। অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। নারিকেলই এই রাজ্যের প্রধান ফসল। এই রাজ্যে কোন উল্লেখযোগ্য শহর নাই।

পূর্ব-হিমালয়ের রাজ্য

পূর্ব-হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে নেপাল, ভুটান ও সিকিম এই তিনটি স্বাধীন রাজ্য আছে।

নেপাল—উত্তর প্রদেশ ও বিহারের উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে নেপাল রাজ্য অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে ইহা ২৬°২৫′ উঃ অক্ষরেখা হইতে ৩০°১৭′ উঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিমে ইহার বিস্তার ৮০°৬′ পূঃ দ্রাঘিমা হইতে ৮৮°১৪′ পূঃ দ্রাঘিমা। উত্তর-দক্ষিণে ইহার সর্বাধিক বিস্তার প্রায় ১৫০ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে সর্বাধিক দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ মাইল হইবে।

ইহার উত্তরে তিব্বত, পূর্বে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমে উত্তর প্রদেশ এবং দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশ।

ভৌগোলিক হিসাবে হিমালয়ের এই রাজ্যগুলিকে ভারতীয় উপমহাদেশের একটি অঞ্চল হিসাবে ধরা যাইতে পারে।

এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ৫৪,০০০ বর্গমাইল এবং ১৯৫৩ সালের সরকারী অনুমান অনুসারে অধিবাসী-সংখ্যা প্রায় ৮৫ লক্ষ ৯৬ হাজার।

নেপালের প্রায় সর্বত্রই ভূমি পার্বত্য। ইহা অবহিমালয়, মধ্যহিমালয় ও উচ্চ হিমালয় পর্বতশ্রেণী লইয়া গঠিত। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেষ্ট এবং অন্যতম উচ্চ শৃঙ্গ ধবলগিরি নেপাল রাজ্যে অবস্থিত। এই রাজ্যের প্রায় মধ্যভাগে নেপাল উপত্যকা, এখানকার ভূমি অপেক্ষাকৃত কম বন্ধুর। গঙ্গা নদীর অনেকগুলি উপনদী নেপালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা নদীতে পড়িয়াছে। এই সকল উপনদীর কোন কোনটির নিম্নাংশের অল্প-পরিসর উপত্যকায় সমতলভূমি দেখা যায়।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া ইহা শীতপ্রধান দেশ। শীতকালে এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে নামিয়া যায়। প্রায় সকল স্থানেই বরফ পড়ে। গ্রীষ্মের তাপমাত্রা বেশ আরামদায়ক, তবে কোন কোন পার্বত্য উপত্যকায় গরম অনেক সময় বেশীও অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বারিপাত হয়।

নেপাল রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে ঘন বন আছে। এই সকল অরণ্যে অনেক মূল্যবান কাষ্ঠ এবং অনেক ভেষজ উদ্ভিদ পাওয়া যায়।

কৃষিকার্য নেপাল উপত্যকা অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী হয়। লোকবসতিও এই অঞ্চলে সবচেয়ে অধিক। নেপালে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, গম ও ধান প্রধান ফসল। নিম্নাংশে বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে পাটের চাষও হয়। ইক্ষুর চাষও এখানে আছে।

নেপাল রাজ্য শিল্পে অনুন্নত ছিল। নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর হইতে এই রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। নেপালে এখন চটকল, চিনির কল, দিয়াশলাই, কাচ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

নেপালের রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য, পাট, কাষ্ঠ, ভেষজ উদ্ভিদ, ঘি এবং চর্মই প্রধান। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র, সিগারেট, কেরোসিন ও পেট্রোল, চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত এবং চা-এর নাম করা যাইতে পারে।

কাঠমণ্ডু (লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৯ হাজার)—ভারত সীমান্ত হইতে ৭৫ মাইল দূরে নেপাল উপত্যকায় অবস্থিত এই রাজ্যের রাজধানী। ইহা নেপালের বৃহত্তম নগর ও সর্বপ্রধান শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **পত্তন** (লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৫ হাজার)—নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **ভাটগাঁও** (৯৩,০০০)—অন্যতম প্রধান নগর।

ভুটান—আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে এই রাজ্য অবস্থিত। পূর্ব-পশ্চিমে ইহার সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ১৯০ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে ইহার সর্বাধিক প্রস্থ প্রায় ৯০ মাইল। এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ১৮ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ।

ভুট্টা, মিলেট, ধান এখানকার প্রধান কৃষিজ ফসল। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে মোম ও লাক্ষার নাম করা যায়। এই রাজ্যে প্রচুর বনজ সম্পদ আছে; কিন্তু পথঘাটের অভাবের জন্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব হইতেছে না।

বুমথাং—এই রাজ্যের রাজধানী। **পুনাখা**—এই রাজ্যের অন্যতম প্রধান সেনানিবাস।

সিকিম—পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে ইহা অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে নেপাল ও পূর্বে ভুটান রাজ্য। এই রাজ্যের আয়তন ২,৭৪৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৩৭,১৫৮। ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বরের সন্ধি অনুযায়ী সিকিম ভারত সরকারের একটি আশ্রিত রাজ্যে (Protectorate) পরিণত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইহা অনেকটা স্বাধীন তবে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র ব্যাপারে ইহা সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীন। **গ্যাংটক**—এই রাজ্যের রাজধানী।

———

পাকিস্তান

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পাকিস্তান দুইটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড লইয়া গঠিত। ইহার এক অংশ ভারতের পশ্চিমদিকে অবস্থিত, ইহাকে **পশ্চিম পাকিস্তান** বলা হয়। অপর অংশ আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অবস্থিত। ইহা **পূর্ব পাকিস্তান** নামে পরিচিত। এই দুই অংশের মধ্যে হাজার মাইলেরও অধিক ব্যবধান। সমগ্র পাকিস্তানের আয়তন প্রায় ৩,৬৫,০০০ বর্গ-মাইল এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ। পাকিস্তানের এই দুই অংশের ভৌগোলিক বিবরণ একত্র দেওয়ার অনেক অসুবিধা আছে। তাই পৃথকভাবে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের বিবরণ দেওয়া হইল।

পশ্চিম পাকিস্তান

সীমা—পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তরে কাশ্মীর ও সোভিয়েট রাশিয়া, পূর্বে (ভাঃ) পাঞ্জাব, রাজস্থান ও কচ্ছ, দক্ষিণে আরব সাগর এবং পশ্চিমে আফগানিস্তান ও পারস্য।

অবস্থান ও আয়তন—ইহা প্রায় ২৪° উঃ অক্ষরেখা হইতে ৩৬½° উঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিমে ইহা প্রায় ৬১° পূঃ দেশান্তর হইতে ৭৫° পূঃ দেশান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার আয়তন প্রায় ৩,১০,০০০ বর্গমাইল।

ভূ-প্রকৃতি—ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

(১) **উত্তর ও পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল**—উত্তরদিকে মধ্য ও নিম্ন হিমালয়ের পার্বত্যভূমি। ইহা প্রায় ১২,০০০ ফুট হইতে ১৬,০০০ ফুট উঁচু। হিমালয় হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সুলেমান, খিরথার প্রভৃতি পর্বত বাহির হইয়া পাক-আফগান সীমান্তের পার্বত্যভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। এই পার্বত্যভূমি প্রায় ৬,০০০ ফুট হইতে ৯,০০০ ফুট উঁচু। সুলেমান পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তখ্‌ৎ-ই সুলেমান ১১,০৭০ ফুট উচ্চ। উত্তর-পশ্চিমের এই পর্বতগুলিতে কয়েকটি গিরিবর্ত্ম আছে। তন্মধ্যে খাইবার, গুমাল ও বোলান গিরিপথই প্রধান।

(২) **উত্তর ও পশ্চিমের উচ্চভূমি**—উত্তরের পার্বত্যভূমির দক্ষিণে ও পশ্চিমের পার্বত্যভূমির পূর্বে পার্বত্যভূমির প্রায় সমগ্র পাদদেশ ব্যাপিয়া এই উচ্চভূমি অবস্থিত। ইহার গড় উচ্চতা ২,০০০ ফুট হইতে ৪,০০০ ফুট। ইহা ক্রমশঃ ঢালু হইয়া সিন্ধুনদের সমভূমিতে মিশিয়াছে।

(৩) **সিন্ধু উপত্যকার সমভূমি**—ইহা ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমিরই অনুরূপ। এই সমভূমি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আরব সাগরের দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। ইহা সিন্ধু ও উহার উপনদীগুলির পলিমাটি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

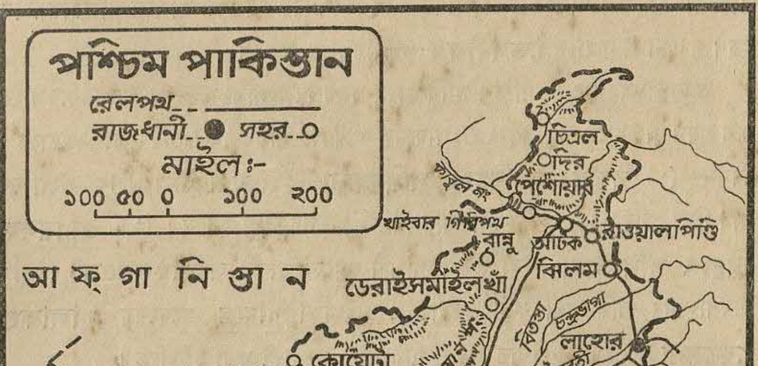
নদ-নদী—**সিন্ধু নদ**ই পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ নদী। ইহা তিব্বতের কৈলাস পর্বতের নিকট উৎপন্ন হইয়া গভীর নদীখাতের মধ্য দিয়া হিমালয় অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম-বাহিনী হইয়া মোহানার নিকট ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া আরব সাগরে পড়িয়াছে। সিন্ধুর বাম তীরের উপনদীগুলির মধ্যে **বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী** ও **শতদ্রু** এই চারিটিই পাকিস্তানের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। দক্ষিণ তীরের উপনদীগুলির মধ্যে **কাবুল, কুরাম** ও **গোমাল** নদীই প্রধান।

জলবায়ু—পশ্চিম পাকিস্তান দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর প্রভাবের বাহিরে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে এখানে প্রচণ্ড গরম পড়ে। তখন পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের কোন কোন স্থানে তাপ ১২৫° ফাঃ পর্যন্ত উঠে। শীতকালে আবার তাপ অনেক কমিয়া যায়। সমভূমি অঞ্চলে তখন তাপ ৫০° ফাঃ-৬৫° ফাঃ থাকে। শীত-গ্রীষ্মের উত্তাপের প্রসর যেমন অধিক তেমনি দৈনিক উত্তাপের প্রসরও খুব বেশী হয়। পার্বত্যভূমিতে শীতকালে বরফ পড়ে। বৃষ্টিপাত এখানে খুব কম হয়। অধিকাংশ স্থানেই বৃষ্টিপাত ১০"র কম। উত্তরদিকে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী। শীতকালেই বৃষ্টিপাত বেশী হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ—পশ্চিম পাকিস্তান শুষ্ক মরুসদৃশ দেশ, তাই এখানে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ও কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়ই স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে মোচাকৃতি বৃক্ষ আছে।

কৃষি—কৃত্রিম জলসেচের সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশই কৃষিকার্যে সর্বাধিক সমৃদ্ধ।

গম—পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্রই গমের চাষ আছে, তবে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে সবচেয়ে বেশী গম উৎপন্ন হয়। দেশের চাহিদা পূরণ করিয়াও রপ্তানীর জন্য অনেক গম উদ্বৃত্ত থাকে। **ভুট্টা**—পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্রই অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয়। সিন্ধু প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার উপত্যকায় **ধান্য** জন্মে।



১৭৩নং চিত্র

ধান্যও এখানে অনেক উদ্বৃত্ত হয়। এই উদ্বৃত্ত শস্য পূর্ব পাকিস্তানে প্রায়ই পাঠান হয়। **ছোলা**—পশ্চিম পাঞ্জাবেই অধিক জন্মে। **ইক্ষু**—পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টগুমারী, লায়ালপুর, শিয়ালকোট ও লাহোর জেলায় প্রচুর ইক্ষুর চাষ হয়। **কার্পাস**—পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে উৎকৃষ্ট

শ্রেণীর আমেরিকান তূলার চাষ হয়। পাঞ্জাবের লাহোর, মুলতান, লায়ালপুর, সেখপুরা প্রভৃতি জেলায় এবং সিন্ধুর থরপারকর, হায়দরাবাদ, নবাবশা প্রভৃতি জেলায়ই কার্পাস অধিক জন্মে। কার্পাস উৎপাদনে পশ্চিম পাঞ্জাবই প্রথম, তারপর সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের স্থান। পাঞ্জাবেই প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ তূলা জন্মে। **বাজরা**—পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সর্বত্রই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমিতে বাজরার চাষ হয়। এছাড়া এখানে **তৈলবীজ**ও অল্পপরিমাণে জন্মে।

জলবিদ্যুৎ—পশ্চিম পাকিস্তানে সম্ভবপর জলবিদ্যুতের পরিমাণ একেবারে কম নয়। বর্তমানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কয়েকটি পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। যেমন—(১) **রসুল জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা**—ইহাতে বিতস্তা নদীর ঊর্ধ্বাংশে বাঁধ দিয়া প্রায় ২০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইবে। (২) **ওয়ারসক বিদ্যুৎ পরিকল্পনা**—ইহাতে কাবুল নদী হইতে প্রায় ১ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এছাড়া সীমান্ত প্রদেশের **মালাকণ্ড কেন্দ্রের** ক্ষমতা বাড়াইবার জন্যও পরিকল্পনা তৈয়ারী করা হইয়াছে।

খনিজ সম্পদ—পশ্চিম পাকিস্তান খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ নয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে **কয়লা, পেট্রোলিয়াম, ক্রোমাইট, জিপসাম, লবণ** ও **গন্ধক** প্রধান।

শিল্প—শিল্পে পাকিস্তান খুব অনুন্নত। পশ্চিম পাকিস্তানে কয়েকটি **কাপড়ের কল, চিনির কল,** এবং **সিমেণ্ট, সাবান, কাচ** ও **দিয়াশলাইয়ের কারখানা** আছে।

লোকবসতি—পশ্চিম পাকিস্তানের লোকসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ। সিন্ধুর উপত্যকায়ই জনবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

পাঞ্জাব ও ভাওয়ালপুর	লোকসংখ্যা	২০,৬৫১,০০০
সীমান্ত প্রদেশ	”	৫,৯০০,০০০
সিন্ধু ও খৈরপুর	”	৪,৯২৮,০০০
বেলুচিস্তান	”	১,১৭৪,০০০
করাচী অঞ্চল (৮১২ বর্গমাইল)	”	১,১২৬,০০০

পরিবহন ব্যবস্থা—রেলপথ—পশ্চিম পাকিস্তানের রেলপথগুলি **উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ে** নামে পরিচিত। এখানে ৫,৩৬২ মাইল রেলপথ আছে। এই রেলওয়ের প্রধান দুইটি পথ আছে। এই পথ লাহোর হইতে করাচী এবং অপরটি লাহোর হইতে রাওয়ালপিণ্ডি হইয়া পেশোয়ার গিয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক ভাল ভাল রাস্তা আছে। প্রায় প্রত্যেকটি শহর ভাল মোটরপথে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। তা'ছাড়া সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে মোটরপথে ইহার যোগাযোগ আছে। বেলুচিস্তানের চামান হইতে কান্দাহার, কোয়েটা হইতে জাহিদান, পেশোয়ার হইতে কাবুল, আটক হইতে কাশগড়, ডেরাইসমাইলখাঁ হইতে কান্দাহার পর্যন্ত রাস্তা আছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের নদীগুলি নৌ-চলাচলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়।

বিমানপথে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল শহরই পরস্পর-সংযুক্ত। তা'ছাড়া করাচী হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিমান চলাচল করে।

বন্দর—করাচীই পশ্চিম পাকিস্তানের সুবৃহৎ একমাত্র বন্দর।

প্রধান প্রধান শহর—লাহোর (৮½ লক্ষ)—পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী, অন্যতম প্রধান নগর ও শিল্পকেন্দ্র। এখানে কাপড় ও চিনির কল এবং চামড়া ও কাচের কারখানা আছে। **লায়ালপুর** (১ লক্ষ ৭৯ হাজার)—কার্পাস ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। **মুলতান** (১ লক্ষ ৯০ হাজার)—প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। **করাচী** (১০ লক্ষ)—সমগ্র পাকিস্তানের রাজধানী, বৃহত্তম নগর, বন্দর ও শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। **রাওয়ালপিণ্ডি** (২ লক্ষ ৩৭ হাজার)—বিখ্যাত সেনানিবাস। অন্যান্য শহরের মধ্যে **পেশোয়ার, গুজরানওয়ালা, হায়দরাবাদ** ও **শিয়ালকোট** প্রধান।

আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্য—পাকিস্তান হইতে কাঁচামালই অধিক রপ্তানী হয়। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে **তুলা, পশম, চামড়া, গম, ধান, জিপসাম, লবণ** এবং **ফলই** প্রধান। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে **বস্ত্র, খনিজ তৈল, যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি** এবং **কাগজই** প্রধান।

পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ববঙ্গ)

পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ভাগ, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ইহার আয়তন ৫৪,৫০১ বর্গমাইল।

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) **পলি-গঠিত সমভূমি**—পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবটাই সমুদ্র-সমতল হইতে অল্পউচ্চ সমভূমি। ইহা ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও উহাদের উপনদীগুলির পলিমাটিতে গঠিত হইয়াছে। (২) **পার্বত্য চট্টগ্রামের উচ্চভূমি**—চট্টগ্রামের পূর্বভাগে কতকগুলি সমান্তরাল অল্পউচ্চ পাহাড় লইয়া এই উচ্চভূমি অঞ্চল গঠিত।

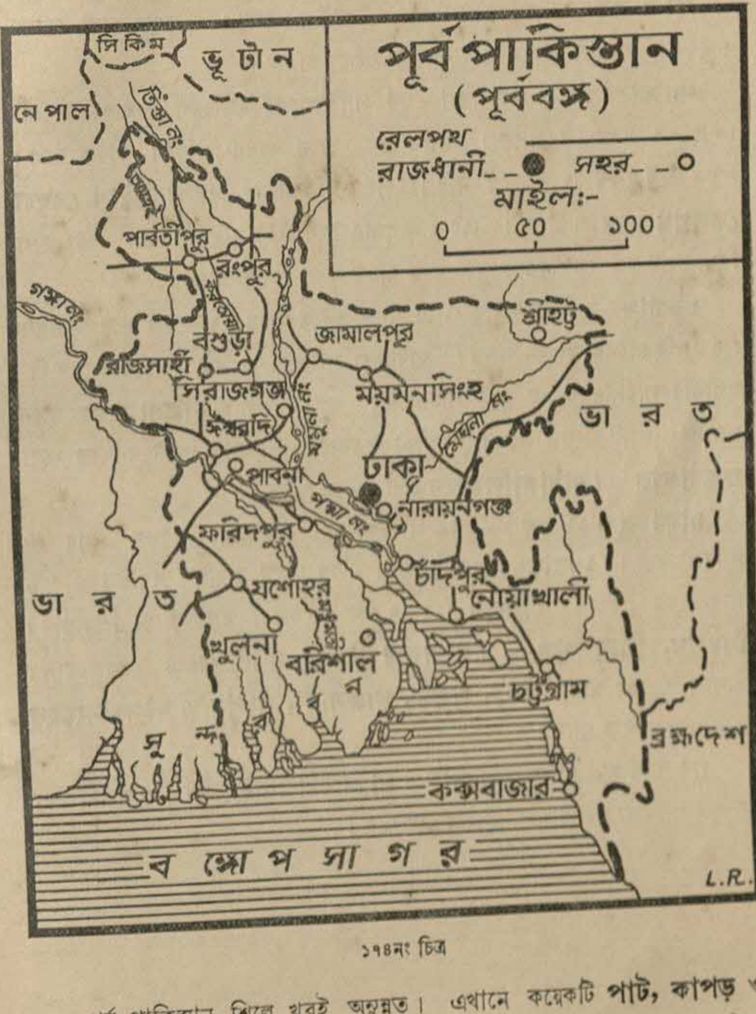
পদ্মা এবং **ব্রহ্মপুত্রের** দক্ষিণাংশই পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নদী। ব্রহ্মপুত্র রংপুর জেলায় পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর দক্ষিণ দিকে কিছুদূর প্রবাহিত হওয়ার পর দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মুন্সীগঞ্জের নিকটে মেঘনায় পড়িয়াছে। অপরটি প্রধান শাখা। ইহা **যমুনা** নামে প্রবাহিত হইয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিশিয়াছে। শ্রীহট্টের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর মিলিত ধারা **মেঘনা** নামে চাঁদপুরের নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া সাগরে পড়িয়াছে। **তিস্তা, আত্রেয়ী** ও **করতোয়া** যমুনার উপনদী। অন্যান্য নদীর মধ্যে **মাথাভাঙ্গা, ইছামতী, মধুমতী, তেঁতুলিয়া** ও **কর্ণফুলী** নদীই প্রধান।

পূর্ববঙ্গের জলবায়ু মৌসুমীপ্রধান। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বারিপাত হয়। ইহার ফলে তাপমাত্রা খুব বেশী হইতে পারে না। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্রই ৬০"র অধিক। শীতকালে সামান্য শীত অনুভূত হয়।

অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের জন্য **চিরহরিৎ বৃক্ষ**ই এখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দক্ষিণ বঙ্গে অরণ্যভূমি আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গলে **জারুল, পোমা, গর্জন, গামার** এবং সুন্দরবনে **গেঁউয়া, গরাণ, সুন্দরী** প্রভৃতি কাঠ পাওয়া যায়। তা'ছাড়া বাঁশ, বেত সর্বত্রই পাওয়া যায়।

কৃষিই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এখানে প্রচুর **ধান** ও **পাট** উৎপন্ন হয়। পাট উৎপাদনে পূর্ববঙ্গের স্থান পৃথিবীতে প্রথম।

এছাড়া **ডাল, তৈলবীজ, পান, তামাক** ও **চা** প্রচুর উৎপন্ন হয়। **ইক্ষুর** চাষও অল্পবিস্তর হয়।



১৭৪নং চিত্র

পূর্ব পাকিস্তান শিল্পে খুবই অনুন্নত। এখানে কয়েকটি **পাট, কাপড়** ও **চিনির কল** আছে। সম্প্রতি একটি **কাগজের কল** স্থাপিত হইয়াছে। কুটির-

শিল্প প্রায় সর্বত্রই আছে। ঢাকার তাঁতের কাপড়, শাঁখা এবং সিলেটের বেতের জিনিস প্রসিদ্ধ।

পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ২১ লক্ষ। ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার তীরবর্তী অঞ্চলেই লোকবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন।

যাতায়াতের ব্যবস্থা—পূর্ব পাকিস্তানের নদীগুলি সারাবছরই নৌ-চলাচলের উপযোগী থাকে। জলপথেই এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য অধিক চলে। সড়ক খুব বেশী এ প্রদেশে নাই। পূর্ব পাকিস্তানের রেলপথ **ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথ** নামে পরিচিত। এই রেলপথের দৈর্ঘ্যও খুব বেশী নয়। আজকাল বিমানপথে বড় বড় শহরকে পরস্পরের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।

চট্টগ্রাম—কর্ণফুলী নদীর তীরে সমুদ্র হইতে প্রায় ২১ মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম বন্দর। স্বাধীনতা লাভের পর এই বন্দরের আমদানী-রপ্তানীর পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। খুলনা জেলার **চালনা** নামক স্থানে সম্প্রতি একটি নূতন বন্দর তৈয়ারী হইয়াছে। অন্যান্য ছোট বন্দরের মধ্যে **কক্সবাজার** ও **নোয়াখালি**র নাম করা যাইতে পারে।

ঢাকা (৪·১১ লক্ষ)—পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী, বৃহত্তম নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **নারায়ণগঞ্জ**—শীতলক্ষা নদীর তীরে অবস্থিত বস্ত্রশিল্প ও পাট ব্যবসায়ের কেন্দ্র। **চট্টগ্রাম** (২·৯৪ লক্ষ)—বন্দর, বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র। **চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ** ও **গোয়ালন্দ** বিখ্যাত নদী-বন্দর ও বাণিজ্যস্থান। অন্যান্য শহরের মধ্যে **শ্রীহট্ট, খুলনা, রাজসাহী, রংপুর** ও **ময়মনসিংহের** নাম করা যাইতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রচুর **পাট** ও **চা** বিদেশে রপ্তানী হয়। আমদানী দ্রব্য পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানী দ্রব্যের অনুরূপ।

চতুর্থ খণ্ড

মানচিত্র পঠন ও অঙ্কন

মানচিত্র পঠন—মানচিত্র ভূগোল পাঠে সাহায্য করে। মানচিত্র ভিন্ন ভূগোলের জ্ঞান কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তোমরা স্কুলে ভূগোল ক্লাশের ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গান বড় বড় মানচিত্র দেখিয়া থাকিবে। ঐগুলিকে দেওয়াল-মানচিত্র (Wall Map) বলা হয়। এই মানচিত্রগুলি তোমরা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছ কি? ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে সব কয়টি মানচিত্র একরূপ নয়। মানচিত্রগুলির কোনটা সাদা, কোনটা নানা রংএ রঞ্জিত। একই মানচিত্রে সকল জিনিস ভাল করিয়া দেখান যায় না। তাই ভিন্ন ভিন্ন জিনিস দেখাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানচিত্র আঁকা হইয়াছে। সেইগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি, যেমন—(১) ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র, (২) রাজনৈতিক মানচিত্র, এবং (৩) অন্যান্য মানচিত্র।

মানচিত্র বলিতে তোমরা কী বুঝ? **কোন সমতল (plane) ক্ষেত্রের উপর ভূ-পৃষ্ঠের সম্পূর্ণ কিম্বা কোন অংশের যে নক্সা আঁকা যায় তাহাই উহার মানচিত্র।** মানচিত্র ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশকে বুঝাইবে উহার সমান করিয়া তাহা আঁকা যায় না। অনেক ছোট করিয়া আঁকা হয়। যে অনুপাতে ছোট করা হয় তাহাই মানচিত্রের স্কেল। মানচিত্রের এক পার্শ্বে উহার স্কেল নির্দেশ করা থাকে।

মনে কর একটি মানচিত্রে স্কেল দেওয়া আছে—"স্কেল ১" = ১০০ মাইল"। ইহার অর্থ এই যে মানচিত্রের উপর ১" পরিমাণ দৈর্ঘ্য ভূ-পৃষ্ঠের উপর ১০০ মাইল দৈর্ঘ্যের সমান হইবে। মানচিত্রের ১ বর্গ-ইঞ্চি পরিমিত স্থান ভূ-পৃষ্ঠে ১০০০০ বর্গ-মাইলের সমান হইবে। আবার কোন কোন মানচিত্রে শুধু একটি অনুপাতের সাহায্যেও স্কেল নির্দেশ করা হয়। যেমন, "স্কেল ১ : ১০০,০০০,০০০" দেওয়া থাকিলে কি বুঝিবে? এই স্কেলের অর্থ এই যে মানচিত্রের ১ একক (unit) দৈর্ঘ্য ভূ-পৃষ্ঠের উপর অনুরূপ ১০০,০০০,০০০ একক দৈর্ঘ্যের সমান; অর্থাৎ মানচিত্রের

১" ভূ-পৃষ্ঠের ১০০,০০০,০০০ ইঞ্চির সমান; মানচিত্রের ১ ফুট ভূ-পৃষ্ঠের ১০০,০০০,০০০ ফুটের সমান হইবে। এই দুই প্রণালী ভিন্ন আর এক ভাবে স্কেল নির্দেশ করা হয়। ইহাতে শুধু একটি সরলরেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাকে কয়েক অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের পৃথক পৃথক মান নির্দেশ করা থাকে।

যেমন ১০০ ০ ১০০ মাইল, এখানে যে পরিমাণ দৈর্ঘ্য
স্কেল
১০০ মাইল বলা হইয়াছে মানচিত্রের উপর সেই পরিমাণ দৈর্ঘ্য ভূ-পৃষ্ঠের ১০০ মাইলের সমান হইবে।

ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র—ইহাতে বিভিন্ন রংএর সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চাবচতা নির্দেশ করা হইয়া থাকে। কোন্ রং কি নির্দেশ করিবে তাহার একটা সাধারণ বিধি আছে। গাঢ় সবুজ রং সব সময়ই সমুদ্র-সমতল হইতে অল্প-উচ্চ সমভূমি বুঝায়, অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চ সমভূমি নির্দেশ করিতে ফিকে সবুজ রং ব্যবহার করা হয়। তারপর যত উচ্চতা বাড়ে তত ফিকে লাল, লাল, ঘন লাল প্রভৃতি রংএর সাহায্যে তাহা দেখান হয়। কোন্ রং কি নির্দেশ করে তাহার একটি সংকেত মানচিত্রে দেওয়া থাকে। তাই মানচিত্র সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকিলে শুধু মানচিত্র দেখিয়াই ভূগোলের অনেকখানি জ্ঞান লাভ করা যায়। মানচিত্রে নদীগুলি মোটা কালো লাইনে দেখান হয়। নদীর নিম্নাংশের দিকে ইহা ক্রমশঃ চওড়া হইতে থাকে। নদীর গতি হইতে তোমরা ভূমির ঢাল কোন্ দিকে তাহা বুঝিতে পারিবে।

রাজনৈতিক মানচিত্র—এই মানচিত্রে ভূমির উচ্চতা নির্দেশ করা হয় না। বিভিন্ন রাজনৈতিক বিভাগ, রাষ্ট্রীয় সীমা, শাসনতান্ত্রিক অঞ্চলগুলিই শুধু দেওয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন রং দেওয়া থাকে। ইহাতে মানচিত্র দেখামাত্রই তোমরা বিভাগগুলি বুঝিতে পারিবে। উহাতে বিভিন্ন শহর ও নগরের অবস্থান দেওয়া থাকে। নগরের গুরুত্ব অনুযায়ী ছোট বড় অক্ষরে উহার নাম লেখা হয়। তাই এইরূপ মানচিত্র হইতে তোমরা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগ ও নগর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

অন্যান্য মানচিত্র—উপরোক্ত দুই প্রকার মানচিত্র ভিন্ন আরও বহু রকমের মানচিত্র আছে। কোন মানচিত্রে কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য দেখান থাকে, কোনটায় হয়ত খনিজ সম্পদ, কোনটায় শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি দেখান থাকে। এছাড়া জলবায়ু নির্দেশক মানচিত্রও আছে। এইভাবে বিভিন্ন ভৌগোলিক তথ্য নির্দেশক মানচিত্র আছে। এইগুলি ভালভাবে দেখিতে জানিলে শুধু বিভিন্ন মানচিত্র দেখিয়াই তোমরা কোন স্থানের ভূগোল সম্বন্ধে অনেকখানি জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।

মানচিত্র অঙ্কন—ভূ-পৃষ্ঠে অক্ষরেখা ও দেশান্তর রেখার সাহায্যে কোন স্থানের অবস্থান নির্দেশ করা হয়। ভূ-গোলকে পরস্পরচ্ছেদী এই রেখাগুলি ভালভাবে দেখিতে পাইবে। মানচিত্র অঙ্কনের পূর্বে এই রেখাগুলি আঁকা চাই। তারপর এইগুলির সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান নির্দেশ করা যাইবে।

মানচিত্রের জন্য অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা অঙ্কনের বিভিন্ন প্রণালী আছে। ইহাকে ইংরাজীতে Map Projection বলে। তোমরা পরে সে সম্বন্ধে জানিতে পারিবে। এই রেখা অঙ্কনের একটি সহজ উপায় † নিম্নে দেওয়া হইল।

যে অঞ্চলের মানচিত্র আঁকিতে হইবে প্রথমে তাহার সর্বাধিক উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃতি জানিতে হইবে। বিষুবরেখার দৈর্ঘ্য ২৫,০০০ মাইল, ইহার কৌণিক পরিমাপ ৩৬০°। মনে কর তোমাকে যে অঞ্চলের ছক কাটিতে হইবে তাহার বিস্তৃতি ৮০° পূঃ হইতে ১২০° পূঃ দ্রাঘিমা রেখা এবং ২০° উঃ হইতে ৬০° উঃ অক্ষরেখা। পূর্ব-পশ্চিমের বিস্তৃতির পরিমাণ ৪০°। ৩৬০° যদি ২৫,০০০ মাইলের সমান হয় তবে ৪০° র সমান কত হইবে বাহির কর। এক্ষণে তোমাকে যে স্কেলে মানচিত্র অঙ্কন করিতে হইবে সেই স্কেল অনুযায়ী ঐ দৈর্ঘ্য কত ইঞ্চির সমান হয় বাহির কর। তারপর তত ইঞ্চি লম্বা একটি সরলরেখা টান। ইহাই মধ্য অক্ষরেখা নির্দেশ করিবে। এইবার যত ডিগ্রী তফাতে রেখাগুলি টানিতে চাও সেই অনুযায়ী উহাকে কতকগুলি সমান সমান অংশে ভাগ কর। প্রত্যেকটি বিভাগের সীমা বিন্দু দিয়া উহার উপর উভয়দিকে বিস্তৃত কতকগুলি লম্বরেখা টান। এই লম্বরেখাগুলি দ্রাঘিমা রেখা নির্দেশ করিবে। এক্ষণে দুই প্রান্তের

† Simple Cylindrical Projection-এ যেভাবে ছক (graticules) আঁকিতে হয় তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।

দুইটি দ্রাঘিমা রেখাতে ও মধ্য অক্ষরেখার উভয়দিকে (অক্ষরেখার বিভাগের সমান) সমান কতকগুলি অংশ ভাগ কর। তারপর ঐসকল বিন্দু দিয়া মধ্য অক্ষরেখার উভয়দিকে উহার সমান্তরাল কতকগুলি রেখা টান। এইগুলিই অন্যান্য অক্ষরেখা নির্দেশ করিবে। এইভাবে সম্পূর্ণ ছক আঁকা হইয়া যাইবে। এক্ষণে কোন্ রেখা কত ডিগ্রী বুঝাইতেছে তাহা লিখিয়া ফেল। এইভাবে ছক তৈয়ারী হইলে এট্‌লাস দেখিয়া ছকের কোন্ কোঠায় সেই অঞ্চলের সীমারেখা কিরূপ গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া আঁকিতে থাক। এইভাবে আঁকিতে থাকিলে ক্রমে সম্পূর্ণ অঞ্চলটির সীমারেখা আঁকা হইয়া যাইবে। তারপর ভিতরের স্থানগুলিও বসাইতে পারিবে। এইভাবে তোমরা ভারতের মানচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করিবে।

প্রশ্নাবলী ও সিলেবাস

প্রশ্নাবলী

প্রথম খণ্ড

১। পৃথিবীকে সমতল বলিয়া মনে হয় কেন? (ঢাঃ বোঃ ১৯৩১)

পৃথিবীর প্রকৃত আকার কিরূপ? পৃথিবী যে গোল তাহার কতকগুলি প্রমাণ দাও। (ঢাঃ বোঃ ১৯৪২; স্কুঃ ফাঃ ১৯৫২)

২। পৃথিবীর আবর্তনের কতকগুলি প্রমাণ দাও। আবর্তনের ফলাফল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। পৃথিবীর পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতি বলিতে কি বুঝ বল। পৃথিবীর বার্ষিক গতির কতকগুলি প্রমাণ দাও।

৪। পৃথিবীর অক্ষ (axis) কক্ষ-সমতলের সহিত কিরূপভাবে অবস্থিত? উহা যদি কক্ষ-সমতলের উপর লম্বভাবে অবস্থান করিত তবে পৃথিবীতে কি কি পরিবর্তন ঘটিত বল।

৫। পৃথিবীতে দিবা ও রাত্রিমানের হ্রাস-বৃদ্ধি কেন ও কিরূপভাবে ঘটিয়া থাকে তাহা চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৬। পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন কি ভাবে ঘটে চিত্র অঙ্কন করিয়া বর্ণনা কর।

৭। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার কি? কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয়ের উপায় সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (কঃ বিঃ ১৯৪০)

৮। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন অক্ষাংশ কি? উচ্চ অক্ষাংশ ও নিম্ন অক্ষাংশ বলিতে কি বুঝ উদাহরণ সহ বল।

৯। উত্তর গোলার্ধে কোন স্থানের ধ্রুব তারার উন্নতি সেই স্থানের অক্ষাংশের সমান তাহা জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ কর। (কঃ বিঃ ১৯৪৬)

১০। স্থানীয় সময় কাহাকে বলে? স্থানীয় সময়ের পার্থক্য হইতে কিভাবে কোন স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায় বল।

১১। আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা কি? ইহা অতিক্রম করার সময় তারিখ পরিবর্তনের বিধি কেন করা হইয়াছে চিত্র অঙ্কন কবিয়া বুঝাইয়া দাও।

১২। সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—দিকচক্ররেখা, উত্তরায়ণান্ত দিবস, কর্কটক্রান্তিবৃত্ত, মহাবিষুব, অক্ষাংশ, আদি দ্রাঘিমা।

১৩। অক্ষাংশ ও অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমা ও দেশান্তররেখার পার্থক্য কি বুঝাইয়া বল।

১৪। কলিকাতার সময় যখন বেলা ১২টা তখন গ্রীনিচ, লেনিনগ্রাড (৩০° পূঃ), নিউ অর্লিয়েন্স (৯০° পঃ) ও মেলবোর্নের (১৪৫° পূঃ) সময় কত হইবে? (কঃ বিঃ ১৯৪৫)

১৫। কোন স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা বলিতে কি বুঝায় বল। গ্রীনিচে যখন বেলা ১২টা তখন নিউইয়র্কের (৭৪° পঃ দ্রাঃ) সময় কত? (কঃ বিঃ ১৯৪২)

১৬। যদি এখন কলিকাতার সময় সকাল ১১টা হয়, তাহা হইলে (ক) কলিকাতার ৩০° পূর্বে অবস্থিত স্থানের, (খ) ৩০° পশ্চিমে অবস্থিত স্থানের, (গ) ৩০° উত্তর এবং (ঘ) ৩০° দক্ষিণে অবস্থিত স্থানের স্থানীয় সময় কত হইবে? সময়ের পার্থক্যের কারণ নির্দেশ কর। (কঃ বিঃ ১৯৪৩)

১৭। দ্রাঘিমা পরিবর্তনের সংগে সংগে স্থানীয় সময়ের পরিবর্তন হয় কেন বুঝাইয়া দাও। নিউইয়র্ক লণ্ডনের ৭৩°৫০′ পশ্চিমে অবস্থিত। নিউইয়র্কে যখন বেলা ১২টা তখন লণ্ডনের সময় কত? (কঃ বিঃ ১৯৪৭)

১৮। বেলা ১২ টার সময় একটি বেতার বার্তা দিল্লী (৭৭°১৬′ পূঃ) হইতে প্রেরণ করা হইল। উহা টোকিও (১৩৯°৪৮′ পূঃ) ও ওয়াশিংটনে (৭৭°২′ পঃ) কখন শোনা যাইবে? (কঃ বিঃ ১৯৪৯)

১৯। ১লা জুলাই তারিখে গ্রীনিচে যখন বেলা ১২টা তখন নিম্নোক্ত স্থানগুলির (ক) বৎসরের ঋতু ও (খ) ঐদিনের স্থানীয় সময় কত স্থির কর—

লেনিনগ্রাড (৩০° পূঃ দ্রাঃ), সিডনি (১৫১° পূঃ দ্রাঃ), কেপটাউন (১৮° পূঃ দ্রাঃ), কলিকাতা (৮৮°৩০′ পূঃ দ্রাঃ)।

উত্তরের কারণ নির্দেশ কর। (কঃ বিঃ ১৯৫১)

২০। মেলবোর্ণ সহরে (১৪৫° পূঃ দ্রাঃ) একটি ক্রিকেটখেলা সন্ধ্যা ৬টায় সমাপ্ত হওয়া মাত্র খেলার ফল তারযোগে লণ্ডনে (০°) প্রেরিত হইল। সংবাদটি সেই দিনই বিকালে ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইল। সংবাদ পৌঁছিতে ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট সময় লাগে। ঠিক কোন্ সময়ে লণ্ডনে খবরটি পৌঁছিয়াছিল? (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫২)

২১। ভূ-ত্বক এবং মহাদেশ ও মহাসাগরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২২। শিলা কয় প্রকার? ইহাদের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে? প্রত্যেক প্রকার শিলার উদাহরণ দাও।

২৩। যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি ভূ-ত্বকের ধীর পরিবর্তন সাধন করে তাহাদের কার্যের অতি সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ দাও।

২৪। 'আবহবিকার' ও 'ক্ষয়ীভবনের' পার্থক্য কি? কি কি প্রকারে আবহবিকার হইতে পারে উদাহরণ সহ লিখ।

২৫। নদী কি ভাবে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধন করে তাহা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।

২৬। বিভিন্ন গতিতে নদীর ক্ষয়, পরিবহন ও অবক্ষেপণ ক্রিয়া কিভাবে হয় তাহা ভারতবর্ষের নদীগুলির উদাহরণ দ্বারা বিশদভাবে বর্ণনা কর।

২৭। হিমবাহের দ্বারা ভূ-ত্বকের কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা বর্ণনা কর। ভারতে কোথায় হিমবাহ দৃষ্ট হয়? তাহার নাম ও অবস্থান লিখ। (কঃ বিঃ ১৯৪৯)

২৮। নদী ও হিমবাহের ক্রিয়ার তুলনা কর। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৫; কঃ বিঃ ১৯৪৭)

২৯। পর্বতগুলিকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? বিভিন্ন শ্রেণীর পর্বতগুলির উৎপত্তির কারণ কি? প্রত্যেক শ্রেণীর পর্বতের উদাহরণ দাও। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫২)

৩০। নদী কিভাবে প্লাবন-ভূমি ও অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি করে তাহা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।

৩১। সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ:—

হিমরেখা, হিমশৈল, রাসায়নিক আবহবিকার, নদীর স্বাভাবিক বাঁধ, বদ্বীপ, শাঙ্কব পলিভূমি, হিমানীসম্প্রপাত, স্তূপপর্বত, ফিয়র্ড, গ্রাবরেখা, গ্রস্ত উপত্যকা।

৩২। উৎপত্তির কারণ হিসাবে সমভূমিগুলিকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় বল। প্রত্যেক শ্রেণীর সমভূমির উদাহরণ দাও।

৩৩। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণ কি? পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি-বলয় সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩৪। ভূমিকম্প কাহাকে বলে? কি কি কারণে ভূমিকম্প হয় বল। পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে অধিক ভূমিকম্প হয়?

৩৫। সমুদ্রজলের লবণতার কারণ কি? সমুদ্রজল সর্বত্র সমান লবণাক্ত নয় কেন?

৩৬। সমুদ্র-স্রোতের উৎপত্তির কারণ কি? আটলান্টিক মহাসাগরীয় সমুদ্র স্রোতের বর্ণনা কর।

৩৭। জোয়ার-ভাঁটা কেন হয়? মরা কোটাল ও ভরা কোটাল কিভাবে হয় চিত্র অঙ্কন করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ—ম্যাগমা চেম্বার, শৈবাল সাগর, পরোক্ষ জোয়ার, বান।

৩৯। পৃথিবীর চাপ বলয়গুলির একটি বর্ণনা দাও। ইহাদের সহিত নিয়তবায়ু প্রবাহের কি সম্বন্ধ চিত্র অঙ্কন করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪০। মৌসুমীবায়ু কাহাকে বলে? ইহার উৎপত্তি কি ভাবে হয়? পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে মৌসুমীবায়ু প্রবাহিত হয় বল।

৪১। সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ—জলবায়ু ও স্থলবায়ু, পশ্চিমাবায়ু, সিরকো, চিনুক, ফন্, সমোষ্ণ রেখা, শিশির।

৪২। বৃষ্টিপাত কি কি প্রকারে হইয়া থাকে তাহা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।

৪৩। আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কি? কি কি অবস্থার উপর কোন স্থানের জলবায়ু নির্ভর করে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও—

(ক) একই দেশান্তর রেখায় অবস্থিত স্থানগুলির স্থানীয় সময় এক হয় কেন?
(খ) নিরক্ষীয় অঞ্চলে অধিক বাষ্পীভবন সত্ত্বেও সমুদ্রজল বেশী লবণাক্ত হয় না কেন?
(গ) ভূ-পৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে উঠা যায় বায়ুমণ্ডলের তাপ তত কমিয়া যায় কেন?
(ঘ) পর্বতের অনুবাত পার্শ্বে বৃষ্টি কম হয় কেন?

দ্বিতীয় খণ্ড

১। প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল বা প্রাকৃতিক বিভাগ কাহাকে বলে? ধরাপৃষ্ঠকে কয়টি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যায় বল। যে কোন একটি বিভাগের জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

২। তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-প্রণালী আলোচনা করিয়া ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের জীবন-প্রণালীকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে তাহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

৩। 'ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল' বলিতে কোন্ কোন্ অঞ্চলকে বুঝায়? এই সকল অঞ্চলের জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জের বৈশিষ্ট্য কি?

৪। বৃটিশ জলবায়ু অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ অধিবাসীদের কর্মতৎপরতাকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। শীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চল বলিতে কোন্ কোন্ অঞ্চলকে বুঝায় ? ঐ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর।

৬। মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের বিস্তার, জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ ও মানুষের জীবন-প্রণালীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

৭। স্তেপ-তৃণভূমি অঞ্চলের একটি ভৌগোলিক বিবরণ দাও।

৮। নিম্নোক্ত ফসল উৎপাদনের জন্য কি কি অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন হয় বল—
ধান, গম, তুলা, ইক্ষু।
কোন্ কোন অঞ্চলে এই সকল ফসল উৎপন্ন হয় ?

৯। পৃথিবীর কয়লা উৎপাদন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১০। পৃথিবীর প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথগুলির নাম কর এবং যে কোন একটি সমুদ্রপথের বিশদ বর্ণনা দাও।

১১। কলিকাতা হইতে বিমানযোগে লণ্ডন হইয়া ওয়াশিংটন যাইতে পথে কি কি বিমান-বন্দর পাওয়া যাইবে বল। বিমানটি কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবে পর পর উহাদের নাম কর।

১২। সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ—
(ক) ক্যানাডা ও সাইবেরিয়া এই দুই সাইবেরীয় জলবায়ুর অঞ্চলের মধ্যে ক্যানাডাই অধিক উন্নত কেন ?
(খ) অষ্ট্রেলিয়া হইতে এত পশম রপ্তানী হয় কেন ?
(গ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লোকবসতি এত ঘন কেন ?
(ঘ) তুন্দ্রাবাসীরা কৃষিকার্য করে না কেন ?

১৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ—
এস্কিমো, চিরহরিৎ বনভূমি, পিগমী, কিরঘিজ, সাভানা অঞ্চল।

তৃতীয় খণ্ড (প্রথম ভাগ)

১। অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু এবং প্রধান নগরাদির বিশেষ উল্লেখসহ চীনদেশের একটি ভৌগোলিক বিবরণ লিখ। (কঃ বিঃ ১৯৩৭)

২। নিম্নলিখিত যে কোন একটি দেশের ভৌগোলিক বিবরণ লিখ—
জাপান, তুরস্ক, ইরাক।

৩। সোভিয়েট এশিয়ার ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির নাম কর এবং যে কোন একটি অঞ্চলের বিশদ বিবরণ দাও।

৪। খাসচীনকে কি কি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায় বল। প্রত্যেক অঞ্চলের এক একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। এশিয়া মহাদেশকে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাদেশ বলা হয় কেন ?

৬। ব্রহ্মদেশের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ লিখ।

৭। পূর্ব-উপদ্বীপের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও।

৮। কি, কোথায় এবং কেন প্রসিদ্ধ বল—

আষ্ট্রাখান, সমরখন্দ, কারাগাণ্ডা, তাসখন্দ, বাকু, কমসোমোলস্ক, ব্লাডিভোষ্টক, আঙ্কারা, ইজমির, তেহেরাণ, সিরাজ, আবাদান, কাবুল, ত্রিপলি, বাগদাদ, মক্কা, পিপিং, চুংকিং, সাংহাই, নানকিং, ক্যাণ্টন, হংকং, টোকিও, কোবে, ওসাকা, নাগাসাকি, রেঙ্গুন, কলম্বো, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর।

তৃতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় ভাগ)

১। ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র পৃথিবী বলা হয় কেন ?

২। ভূ-প্রকৃতি হিসাবে ভারতকে কয়টি বিভাগে ভাগ করা যায় ? যে কোন একটি বিভাগের ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা কর। (কঃ বিঃ ১৯৪৫)

৩। উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান নদী ও উহাদের উপনদীগুলির নাম কর। প্রধান প্রধান নদীগুলির বৈশিষ্ট্য কি বর্ণনা কর। (কঃ বিঃ ১৯২৭)

৪। দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদীগুলির নাম কর ও ইহাদের সংগে উত্তর ভারতের নদীগুলির পার্থক্য কি বল।

৫। উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও প্রভেদ দেখাও। (কঃ বিঃ ১৯৩৯, ১৯৪৭ ; স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৫)

৬। দক্ষিণ ভারতের ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা কর। (কঃ বিঃ ১৯৪২)

৭। ভারতের জলবায়ুর উপর মৌসুমীবায়ুর প্রভাব কতটুকু তাহা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৮। বৎসরের কোন্ সময়ে ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয় এবং কেন ? সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাতবহুল দুইটি অঞ্চলের নাম কর। (কঃ বিঃ ১৯৪৭)

৯। ভারতের প্রধান প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১০। ভারতের বিভিন্ন প্রকার জলসেচ-প্রণালী বর্ণনা কর। কোন্ অঞ্চলে কি প্রকার জলসেচ-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহার বর্ণনা কর।

(কঃ বিঃ ১৯৩০, '৩৩, '৩৫, '৪৭, ৪৯, '৫১ ; স্কুঃ ফাঃ ১৯৪৬)

এই সঙ্গে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা সম্বন্ধেও যাহা জান লিখ। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৬)

১১। ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের নাম কর এবং কোথায় উহা জন্মিয়া থাকে বল। (কঃ বিঃ ১৯৫০)

১২। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কি কি অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ দরকার ? দক্ষিণ ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সম্বন্ধে যাহা জান বল।

১৩। ভারতের প্রধান প্রধান খনিজদ্রব্যের নাম কর। ঐগুলি কোথায় পাওয়া যায় বল।

১৪। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ভৌগোলিক ব্যাখ্যা লিখ—

(১) বোম্বাই নগরীতে অধিক সংখ্যক কাপড়ের কল থাকার কারণ কি ?

(২) জামসেদপুরে লৌহ ও ইস্পাতের শিল্প গড়িয়া উঠার কারণ কি ?

(৩) কলিকাতা ও হুগলী নদীর তীরে এত অধিক পাটকল কেন গড়িয়া উঠিয়াছে ?

(৪) শর্করা শিল্পের জন্য উত্তর প্রদেশ বিখ্যাত কেন ?

১৫। ভারতের লোকবসতির উপর ভূ-প্রকৃতির ও জলবায়ুর প্রভাব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১৬। ভারতের রেলপথগুলির আঞ্চলিক বিন্যাস সম্বন্ধে যাহা জান বর্ণনা কর।

১৭। ভারতের প্রধান প্রধান চারিটি বন্দরের নাম কর। উহাদের অবস্থান, পশ্চাৎভূমি এবং আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৮। নিম্নলিখিত শহরগুলি কোথায় অবস্থিত এবং কেন প্রসিদ্ধ বল—

দিল্লী, কানপুর, কাশী, বাঙ্গালোর, মাদুরৈ, জামসেদপুর, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ।

১৯। রাজ্যপুনর্গঠনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে বল। বর্তমান ভারতের রাজ্যগুলির নাম ও রাজধানীর নাম উল্লেখ কর।

২০। নিম্নলিখিত যে কোন একটি রাজ্যের বিশদ ভৌগোলিক বিবরণ লিখ—

পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ।

২১। পূর্ববঙ্গের (পূর্ব-পাকিস্তানের) ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, কৃষি, শিল্প ও নগরসমূহ সম্বলিত একটি ভৌগোলিক বিবরণ লিখ। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৬)

২২। জলসেচনের প্রয়োজনীয়তা পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে বেশী কেন? পশ্চিম পাকিস্তানে কি কি প্রণালীতে কোথায় কোথায় জলসেচ করা হয় বর্ণনা কর। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৩)

চতুর্থ খণ্ড

১। মানচিত্র কাহাকে বলে? মানচিত্র কয়প্রকার এবং কি কি?

২। ভারতের একখানা মানচিত্র অঙ্কন করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিতগুলি বসাও—

(১) অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত দুইটি অঞ্চল (সেড্ কর); (২) আরাবল্লী ও বিন্ধ্য পর্বত; (৩) তুলা উৎপাদনের দুইটি বৃহৎ অঞ্চল (সেড্ কর); (৪) মধ্যপ্রদেশের রাজধানী (৫) কান্দলা বন্দর; (৬) পেট্রোলিয়াম খনি অঞ্চল; (৭) রেলইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্র; (৮) বিমানপোত নির্মাণ কেন্দ্র।

Syllabus For School Final Examination, 1959, On Geography

A. The size and shape of the earth. Rotation and revolution of the earth and their effects. Determination of latitude and longitude. Longitude and time. International Date line. Crust of the earth—rock types.

Weathering, Erosion and Deposition—their causes and effects on topography.

Detailed study of Rivers and Glaciers, and their work. Mountains—their types, structure and distribution. Volcanoes. Earthquakes—their origin and distribution. Types of Plains.

Oceans—their extent ; characteristics of oceanic waters such as salinity ; temperature and density. Ocean currents. Tides and their causes.

Atmosphere. Temperature and Pressure and their Variations. Pressure belts and planetary winds. Periodic and Variable winds. Rainfall—types and their causes.

Weather and climate. Factors determining climate.

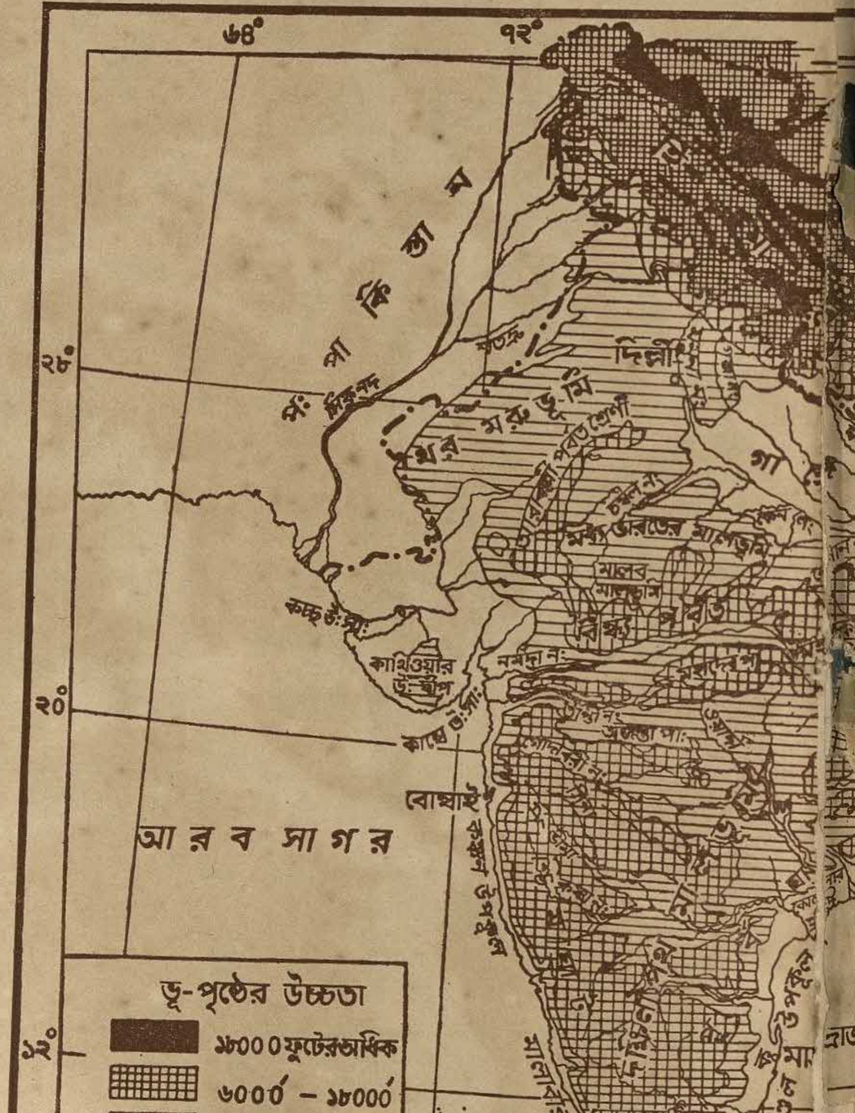
B. Natural Regions as determined by climatic and natural vegetation—their characteristics and world distribution. Life and activities of Man in different natural regions. World distribution of Rice, Wheat, Sugar, Cotton, Coal, Iron ores, Wool, Jute and Tea.

Major International Routes—airways, waterways.

C. Regional study of Asia and a detailed treatment of India and Pakistan under the following heads :—Location and size. Physiographic Divisions. River Systems. Climates and Natural Vegetation. Irrigation and Agriculture, Waterpower, Minerals, Industries. Distribution of Population. Transport Systems : Roads, Railways, Waterways, Airways. Ports and Harbours. Chief towns and their functions. Imports and Exports.

A brief Geographical account of each of Part A and Part B States of Indian Union, and of East Bengal (East Pakistan) is to be read.

D. Map reading and map drawing. Tracing and drawing of outline maps of India and the world and insertion thereon of the important physical features, types of vegetation, crops, towns and industries.



৬৪°
৭২°
২৮°
২০°
১২°
৮০°
পা কি স্তা ন
সিন্ধুনদ
দিল্লী
মরুভূমি
চম্বল নঃ
মধ্য ভারতের মালভূমি
মালব
বিন্ধ্য পর্বত
কচ্ছ উঃ সাঃ
কাথিওয়ার উঃ দ্বীপ
নর্মদা নঃ
কাম্বে উঃ সাঃ
বোম্বাই
আরব সাগর
অজন্তা পাঃ
কঙ্কণ উপকূল
মালাবার উপকূল
লাক্ষা দ্বীঃ পুঃ
নীলগিরি
কাবেরী
মান্নার উঃ সাঃ
মালদ্বীঃ পুঃ
কুমারিকা অঃ
ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা
১৮০০০ ফুটের অধিক
৬০০০´ – ১৮০০০´
১৫০০´ – ৬০০০´
৬০০´ – ১৫০০´
০´ – ৬০০´



ভারত
(প্রাকৃতিক)
০ ১০০ ৩০০ ৫০০ মাইল
৮৮°
৯৬°
১০৪°
২৮°
২০°
১২°
ব্রহ্মপুত্র বা সানপো নদ
স ম ভু মি
গঙ্গা নঃ
পূঃ পাকিস্তান
কলিকাতা
গঙ্গানদীর মোহানা
মহানদীর
মোহানা
চিল্কা হ্রদ
গোদাবরীর
মোহানা
ব্র হ্ম দে শ
ব ঙ্গো প সা গ র
আন্দামান দ্বীঃ পুঃ
নিকোবর দ্বীঃ পুঃ
শ্যাম
উঃ সাঃ
L.R.

শ্রীপ্রমথনাথ হোড়

মধ্যশিক্ষা ভূগোল

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ